লিডারশিপ লেসন্স

ফ্রম দ্য লাইফ অব রাসূলুল্লাহ 🚸



CamScanner

মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থসুত্ব ইসলামি শারী 'আহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি সুতঃ সিন্ধ বিষয়। ইসলাম প্র-ত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থসুত্ব আইন লঙ্খন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী 'আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

< কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারো জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। » [সহীহ আল-জামি' আস-সগীর, হাদীস : ৭৬৬২]

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ থেকে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ স্ক বলেন—

তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।

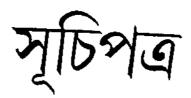
[সূরা বাকারা, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী'আতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী'আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷺ বলেন—

...তোমরা সীমালজ্ঞ্বন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালজ্ঞ্বনকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা মায়েদা, ৫:৮৭]



.



অবতরণিকা	
শুরুর কথা	
অসাধারণ হওয়ার উপায়	
অসাধারণ বিশ্বাস কী?	
এক্সট্রা অর্ডিনারি লক্ষ্য	
এক্সট্রা অর্ডিনারি সংকল্প	
এক্সট্রা অর্ডিনারি দল	
এক্সট্রা অর্ডিনারি গুণাবলি	
আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে পূর্ণ আস্থা	
আপসহীনতা	৯৭
নিজেকেও সারিতে রাখা	202
কথা ও কাজের মিল	222
খুঁকি গ্রহণ	১২১
বৃহৎ উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ	529
মহানুভবতা ও ক্ষমাপরায়ণতা	282
ব্যন্তি-পরিচালনা থেকে প্রক্রিয়া-পরিচালনায় স্থানান্তর	289
চুন্তি	১৫৭
উত্তরাধিকার পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব তৈরি	
শেষ কথা	
পেখক পরিচিতি	



অবতরণিকা

লিডারশিপ বা নেতৃত্ব মানুষের কাছে এমনই এক আগ্রহের বিষয় যে, প্রভাবনালাঁ, অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় মানুষ তো বটেই, সাধারণ মানুষের মনমস্তিক্ব পর্যন্ত এর দ্বারা গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আজকাল থিওরির পর থিওরি উদ্ভাবন হচ্ছে। এক থিওরি আরেক থিওরিকে রিফিউট করছে। শত শত বই প্রকাশিত হচ্ছে, বইয়ের দোকানের তাকগুলো ভরে উঠছে 'করো' আর 'করবে না' লেখা সুল্পবুন্ধির পরামর্শে ঠাসা বই দিয়ে। সমস্যার দ্রুত সমাধানসম্বলিত বই, ভালো নেতা হওয়ার উপায় ইত্যাদি নিয়েও বইয়ের অন্ত নেই। এসব বিষয় স্পন্টতই সাক্ষ্য দেয় যেই লিডারশিপ বিষয়টি অতীতেও যেমন রহস্যময়; কিন্তু আগ্রহের বিষয় ছিল, বর্তমানেও তেমনটাই আছে। এসব প্রকাশনার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বাস্তবতা হলো জীবনের ক্ষুদ্রতা ও সীমাবন্ধতার মধ্যে সত্যিকার নেতৃত্ব কীভাবে গড়ে উঠবে, সে সম্পর্কে সুপ্পন্ট কোনো বয়ান এগুলো হাজির করতে পারেনি।

অন্যদিকে মুসলিমদের কাছে রয়েছে আল্লাহর রাসূলের জীবন থেকে নেওয়া নেতৃত্বের জীবস্ত ও অনবদ্য এক বাস্তব নমুনা, যার বহুমুখী ও অনিরুম্ব নেতৃত্ব একটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম প্রজন্মে পরিণত করেছে। তিনি শুধু নেতৃত্ব দেনইনি; বরং একই সঙ্গো নেতৃত্ব দেওয়ার মতো অসংখ্য যোগ্য মানুষ তৈরি করেছেন। তিনি নির্যাতন সইতে সইতে ভেঙে পড়া, হতোদ্যম দাসদের মধ্যেও নেতৃত্বের বীজ অঙ্কুরিত করতে পারতেন। তাদেরকেও গড়ে তুলতে পারতেন ক্যারিশম্যাটিক নেতা হিসেবে। তিনি রাবি বিন আমরকে এমন করে গড়ে তুলেছেন যে, তিনি পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শক্তিশালী বীর পালোয়ান রুস্তমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন বস্তব্য দিয়েছেন, যা রুস্তমের অস্তরকে ধারালো বল্পমের আঘাতের চেয়েও বেশি ভেদ করেছে। 'উমার বিন খাত্তাব---যার নিজের বর্ণনামতে---যিনি এক পাল ভেড়াকেও ঠিকমতো সামলাতে পারতেন না, তিনি বিশাল মুসলিম জাহানের সামরিক ও রাজনৈতিক সর্বাধিনায়কে পরিণত হলেন।

মুসলিমরা যদি তাদের হারানো গৌরবময় ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চায়, তাহলে তাদেরকে এমন এক নেতৃত্বের ছায়াতলে আসতে হবে, যার নেতৃত্ব মানুষকে বিশ্বজ্ঞাহানের স্রন্টার সঙ্গো সম্পৃত্ত করবে এবং বস্তুর সংকীর্ণতা ডেদ কয়ে তাদেরকে আধ্যাত্মিকতার সুবিশাল প্রান্তরে নিয়ে যাবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন এমন এক নেতা, যিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন খোদ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যিনি গত চৌদ্দশত বছর ধরে তাঁর সৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করে আসছেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে, যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল স্ফটিকস্বচ্ছ, যার গন্তব্য ছিল সুপ্পট। যারা আল্লাহর রাসূলের জীবন থেকে নেতৃত্বের শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তাদের জন্য শাইখ ইয়াওয়ার বেইগ এই বইয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব-উপাত্ত তুলে ধরেছেন, অনেক তথ্য উপস্থাপন করেছেন, খুবই নিপুণতার সঞ্জো।

শাইখ যখন আমাকে বইটি দেখান আমি সত্যিই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছি। আমার পরিচিত মানুষদের মধ্যে এই বিষয়ে লেখার জন্য আমার প্রিয় শাইখের চেয়ে যোগ্য মানুষ আমি কাউকে দেখিনি। আমি নিজে শাইখের তত্ত্বাবধানে পাঁচ দিন ব্যাপী লিডারশিপ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছি। এই কোর্সের অভিজ্ঞতা থেকে আমি চমৎকারভাবে উপকৃত হয়েছি। শাইখের ব্যাপারে আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে, তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে বইটির আলোচ্য বিষয়ের প্রতি পূর্ণ ন্যায়বিচার করার সক্ষমতা রাখেন। আমরা মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, যেন তিনি বইটিকে হিদায়াতের উৎস ও উদ্মাহর আগামী পুনর্জাগরণের মাধ্যম বানান। আল্লাহ যেন শাইখের কাজটিকে কবুল করেন, তার ও তার পরিবারের ওপর রহমবারি বর্ষণ করেন।

জহির মাহমুদ

ডিরেক্টর, আস-সুফফাহ ফাউন্ডেশন, বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।



শুরুর কথা

If greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the three criteria of human genius then who could dare to compare any great man in history with Muhammad? Lamartine, French historian and educator.

২০০৮ সালে হাজ্জের তিন দিন পরের ঘটনা। সৌদি আরবের হাজ্জ মন্ত্রণালয় আর্ব্রোল্লিত বার্ষিক হাজ্জ কনফারেন্সে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। কনফারেন্স এবং হাল্ফের শেষে আমি এবং আমার স্ত্রী মার্কা থেকে মাদীনা ঘুরেছি। মাদীনাতুর্ রাসূল, রাসূলুল্লাহ্র শহর। যখন তিনি এখানে থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন, তিনি এর নাম দিয়েছিলেন মুনাওয়ারাহ বা আলোকিত। খুবই অন্যরকম একটি স্থান, যা আপনার মন কখনো ছেড়ে যেতে চাইবে না। আমি খুব অবাক হয়ে ভাবি, তিনি যখন জীবিত ছিলেন এবং এখানে ছিলেন, তখন কেমন ছিল এখানকার পরিবেশ-প্রতিবেশ। এমনকি এখনো, যখন তিনি কবরে শায়িত, তাঁর মহিমা ও উপস্থিতি যেন মিশে আছে এই শহর জুড়ে, মিশে আছে এর প্রতিটি ধূলিকণায়। প্রতিটি অলিগলিতে যেন তাঁর কদম মুবারকের ছাপ অধ্যিকত। সবকিছু মিলে এই শহর ও তার লোকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আমি যত শহরে ঘুরেছি, যেসব থেকে এই শহরকে তা সুতন্ত্র করে তুলেছে। একজন মুসলমানের জন্য মাদীনায় আসা মানে নিজের ঘরে আসা। এমন ঘর যা তার জন্মস্থানের চেয়েও প্রিয়। এ ঘরেই সে মৃত্যুবরণ করতে চায়, এখানকার মাটিতেই শায়িত হতে চায়। কোনো মুসলমানের কাছে মাদীনা নিছক সৌদি আরব নয়। এটা ইসলাম, এটা তার হুদয় এবং এমন একটি জায়গা, যেখানে যেতে সে ব্যাকুল, যেখানে প্রিয়নবি মুহাম্মাদ 🜿-এর বাড়ি। মাদীনার জন্য এই আকুলতা নিয়ে কত কবি যে কবিতা লিখেছে, তার ইয়ত্তা নেই!

ভোর থেকেই তাঁকে ভালোবেসে, তাঁর কবর জিয়ারত করতে লাখ লাখ লোকের উপস্থিতি শুরু হয়। আমি তার অনেক আগেই তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সালাম পৌঁছালাম। কেমন ছিল সেসময়, যখন লোকেরা তাঁর কাছে আসত, তিনি সশরীরে উপস্থিত থেকে তাদের সালামের জ্ববাব দিতেন এবং স্লিগ্ধ হাসি উপহার দিতেন, যে হাসিটুকু ছিল তাদের কাছে জীবনের চেয়েও বেশি দামি। যারা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছে, যার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে, তাঁর মুখ থেকেই কুরআন শুনেছে তারা কতই না ভাগ্যবান!





এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে এক্সট্রা অর্ডিনারি বা অসাধারণ করে তোলে।

৫। অজ্ঞীকার

৪। টিমওয়ার্ক

৩। কোয়ালিটি

২। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

১। বিশ্বাস

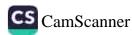
এ গুণগুলো হলো:

আমি রাসূলুল্লাহর পাঁচটি অসাধারণ গুণ উল্লেখ করব, যা তিনি তাঁর জীবনে ধারণ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সেগুলো সফলভাবে বন্ধমূল করে দিয়েছেন। আর এর মধ্য দিয়ে তা তাদেরকে এমন একটি সুসমন্বিত দলে পরিণত করেছিল, যা পৃথিবী আগে কখনো দেখেনি। অথচ তারা ছিলেন সম্পূর্ণ বিসদৃশ কিছু উপজাতি, যারা খুব তুচ্ছ কারণে নিজেদের মধ্যে মারাত্মক যুম্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি তাদেরকে ঐক্যবন্ধ করেছিলেন এবং তারা পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছেন সর্বোৎকৃষ্ট আচরণ এবং পথপ্রদর্শকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

১৪৩৫ বছর পরে, বর্তমান সময়ে আমরাও—যারা তাঁকে দেখিনি এবং তাঁর সুমধর কণ্ঠসুরও শুনতে পাইনি—তাঁকে অন্য যে কেউ বা যে কোনোকিছুর তুলনায় অনেক বিশি ভালোবাসি। আমি যখন আল্লাহর কাছে তাঁর প্রতি রাহমাত বর্ষণের জন্য এবং আমাদের ইসলামের দিকে পথ দেখানোর জন্য তাঁকে সর্বোচ্চ পুরস্কার দেওয়ার দু´আ করছিলাম, আমার দুচোখ ভেসে যাচ্ছিল। আমাদের কাছে মাদীনা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ। আরবরা একে বলে মাদীনাতুর্ রাসূল বা রাসূলের শহর। এখানে যারা বসবাস করে, তারা অনেক গর্বিত। অন্য অনেক জায়গার চেয়ে অনেক কম আয় করার পরও বহু লোক এই শহরকে বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছে; শুধু এ কারণে যে তারা মাদীনা ছেড়ে যেতে চান না। তিনি যে আলো জ্বালিয়েছিলেন, বহু বছর, প্রজন্ম, শতাব্দী ধরে তা আজও জ্বলছে, পৃথিবীর আনাচেকানাচে সে আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

501





অসাধারণ হওয়ার উপায়

কেন অসাধারণ হতে হবে? কারণ 'যথেষ্ট ভালো' হওয়া কখনোই যথেষ্ট নয়। শুরুতেই ব্যাখ্যা করি, এক্সট্রা অর্ডিনারি বা অসাধারণ বলতে কী বোঝাচ্ছি! এর ওপর ভিত্তি করেই আমরা বাকি আলোচনা বুঝব। বিখ্যাত ফরাসি শিক্ষাবিদ আলফনস ডি ল্যামারটিন-এর একটি উক্তি আছে;

যদি উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব, উপকরণের ক্ষুদ্রতা এবং স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো ফলাফল মানবিক অসাধারণত্বের তিনটি শর্ত হয়, তাহলে ইতিহাসে মুহাম্মাদের সঙ্গে তুলনা করার মতো আর কে আছে? দার্শনিক, ধর্মপ্রচারক, আইনপ্রণেতা, যোদ্ধা, চিন্তক, যৌন্তিক বিশ্বাসের পুনঃস্থাপনকারী, বিশটি স্থলজ এবং একটি আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্থপতি—তিনিই মুহাম্মাদ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মানবিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপক যেকোনো সূচকের বিবেচনায় আমরা জিজ্ঞেস করি, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কে আছে? [Historie de le Turquie, Paris 1854, Vol:11, Pages 276-77]

অন্যরা যা চিন্তা করে, তার চেয়ে বেশি কিছু করা জ্ঞানের পরিচায়ক, যুক্তিসংগত ও যৌক্তিক; কিন্তু অসাধারণ হতে হলে যেকোনো উপায়ে অস্বাভাবিক রকম সেরা হতে হবে। মনের গহিনে এমন ডাক শুনতে পারা, যা অন্যরা বড়জোর চিন্তা করতে পারে; সেই তালে পথ চলা, যা অন্যরা শুনতে না পেলেও পিছু পিছু কদম বাড়ানোর উৎসাহ পায়। এ ধরনের লোক তারাই, যারা অসাধারণ, যারা অনুপ্রেরণার বাতিঘর। তারা শুধু নিশ্বাস নেওয়ার জন্য বেঁচে থাকে না।

তাই কেউ যদি নেতৃত্ব দিতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই টিকে থাকার চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে। এমন কিছু করতে হবে, যা অন্য কেউ করেনি। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়; বরং অন্যরা যেন বুঝতে পারে তাদের পক্ষেও এমন কাজ করা সম্ভব। নিজেকে বাস্তবতার চেয়ে ছোট করে দেখানোর চেয়ে মহৎ কিছু নেই। নেতা হতে হলে প্রথাগত ধ্যানধারণা এবং নিজের তৈরি সীমারেখা নিজেকেই বারবার পেরিয়ে যেতে হয়। কারণ, কেউ শীর্ষে পৌঁছার ক্ষেত্রে শত্রু নয়, সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার নিজের মন।

নেতা হতে চাইলে মানুষের মন এবং আধ্যাত্মিক দুনিয়ার এমন গহিনে যাওয়ার সাহস অবশ্যই থাকতে হবে, যেখানে কেউ অভিযান চালানোর সাহস করে না। সব সময় সঠিক বলে বিবেচনা করা হয়েছে—এমন বিষয়কেও প্রশ্ন করতে হবে। প্রজ্ঞল্মের পর



প্রজন্ম ধরে যে ধারণাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। যত মূল্যই দিতে হোক না কেন, তাকে অবশ্যই সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। অতি অবশ্যই নির্যাতিত, দুর্বল এবং বঞ্চিতদের পক্ষে এবং প্রবল বিক্রমশালী অত্যাচারীর বিপক্ষেও দাঁড়িয়ে লড়তে হবে। এ সকল বিষয় একজন নেতাকে সর্বসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে সহযোগিতা করে। বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। একজন নেতাকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বস্ত হলেই চলে না, জনগণের মনে এই বিশ্বাস থিতু হয়ে যেতে হবে যে, তাকে অনুসরণ করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে।

সংজ্ঞানুযায়ী, নেতৃত্ব সামনে থেকেই দিতে হয়। তাই নেতৃত্ব দেওয়া বিশাল সাহসের ব্যাপার। প্রত্যাশা সামান্য হলে মানুষ জেগে ওঠে না, তারা তখনই জাগে, যখন প্রত্যাশা অনেক বেশি হয়। তাদের এমন নেতা প্রয়োজন, যে এগিয়ে নিতে পারে, পিছিয়ে দিতে নয়।

নেতাকে একই সজ্ঞো অবশ্যই লক্ষ্য এবং কৌশল সম্পর্কে পরিম্কার ধারণা রাখতে হবে। কেবল বড় বড় সুপ্ন দেখা ও দেখানোই যথেন্ট নয়, যদি সেগুলো কীভাবে অর্জন করা হবে সে ব্যাপারে কোনো ধারণা না থাকে। একজন নেতাকে সুপ্ন দেখার মতো যোগ্য হতে হবে এবং তার অনুসারীদেরকে এমন এক পথ ধরে নিয়ে যেতে হবে, যে পথ শেষ পর্যন্ত সেই সুপ্নকে বাস্তবায়ন করে তার সুফল ছড়িয়ে দিতে পারবে। অসাধারণ হতে হলে একই সজ্ঞা সুপ্ন দেখার মতো ক্ষণস্থায়ী কাজ এবং সেই সুপ্নকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের মতো দীর্ঘস্থায়ী কাজও করার যোগ্য হতে হবে। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের লোক প্রয়োজন হয়। এ ধরনের লোক খুঁজে বের করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ, একজন নেতার পক্ষে একাই সবকিছু সামলানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য খুবই যোগ্য এবং অনুগত একদল লোক তৈরি করা না হলে সবচেয়ে উত্তম স্বপ্নটিও আকাজ্ঞ্চার রাজ্যে নির্বাসিত হয়ে যায়। যোগ্য অনুসারী জোগাড় করা, তাদেরকে সর্বোচ্চ ত্যাগে অনুপ্রাণিত করা, কার্যকরী প্রশিক্ষণ ও দক্ষ হাতে পরিচালনা করা একজন নেতার মৌলিক কাজ। সব সময় তাদের পাশে থাকা প্রয়োজন। কাজগুলো ঠিকমতো করছে কিনা, করতে পারছে কি না—তা তদারকি করা প্রয়োজন। এসব কর্তব্য আঞ্জাম দেওয়ার মধ্য দিয়েই একজন মানুষ সাধারণ থেকে অসাধারণ নেতা হয়ে ওঠেন।

একজন অসাধারণ নেতাকে অবশ্যই এমন একটি ব্যবস্থা-পম্থতি তৈরি করে যেতে হবে, যা তার দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কোনো অসাধারণ প্রতিভাকে যদি দারুণ একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে রূপান্তর করা না যায়, তাহলে নেতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুও কার্যকর হয়ে যায়। নস্টালজিয়া হিসেবে হয়তো মাঝে মাঝে ম্মরণ করা হবে; কিন্তু নেতার পরবর্তী প্রজন্ম তার প্রতিভা থেকে কোনোভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ আর থাকবে না। কোনো মহৎ সংগঠনকে সফল হতে হলে নেতাকে ব্যক্তি-পরিচালনাধীন (person driven) থেকে নিয়মতান্ত্রিকতার অধীন (process driven) রূপান্তর করতেই হবে। তা না হলে নেতার কাজ প্রজন্ম পরিবতর্ন করার মতো উন্নত লক্ষ্য সাধন হবে না। রাস্ললল্লাত ক্ষা এক্ষে জার্নি লেডারশিপের





প্রজন্ম ধরে যে ধারণাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। যত মূল্যই দিতে হোক না কেন, তাকে অবশ্যই সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। অতি অবশ্যই নির্যাতিত, দুর্বল এবং বঞ্ছিতদের পক্ষে এবং প্রবল বিক্রমশালী অত্যাচারীর বিপক্ষেও দাঁড়িয়ে লড়তে হবে। এ সকল বিষয় একজন নেতাকে সর্বসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে সহযোগিতা করে। বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। একজন নেতাকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বস্ত হলেই চলে না, জনগণের মনে এই বিশ্বাস থিতু হয়ে যেতে হবে যে, তাকে অনুসরণ করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে।

সংজ্ঞানুযায়ী, নেতৃত্ব সামনে থেকেই দিতে হয়। তাই নেতৃত্ব দেওয়া বিশাল সাহসের ব্যাপার। প্রত্যাশা সামান্য হলে মানুষ জেগে ওঠে না, তারা তখনই জাগে, যখন প্রত্যাশা অনেক বেশি হয়। তাদের এমন নেতা প্রয়োজন, যে এগিয়ে নিতে পারে, পিছিয়ে দিতে নয়।

নেতাকে একই সজ্জো অবশ্যই লক্ষ্য এবং কৌশল সম্পর্কে পরিম্কার ধারণা রাখতে হবে। কেবল বড় বড় স্বপ্ন দেখা ও দেখানোই যথেষ্ট নয়, যদি সেগুলো কীভাবে অর্জন করা হবে সে ব্যাপারে কোনো ধারণা না থাকে। একজন নেতাকে সুপ্ন দেখার মতো যোগ্য হতে হবে এবং তার অনুসারীদেরকে এমন এক পথ ধরে নিয়ে যেতে হবে, যে পথ শেষ পর্যন্ত সেই সুপ্নকে বাস্তবায়ন করে তার সুফল ছড়িয়ে দিতে পারবে। অসাধারণ হতে হলে একই সঞ্জো সুগ্ন দেখার মতো ক্ষণস্থায়ী কাজ এবং সেই সুগ্নকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের মতো দীর্ঘস্থায়ী কাজও করার যোগ্য হতে হবে। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের লোক প্রয়োজন হয়। এ ধরনের লোক খুঁজে বের করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ, একজন নেতার পক্ষে একাই সবকিছু সামলানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য খুবই যোগ্য এবং অনুগত একদল লোক তৈরি করা না হলে সবচেয়ে উত্তম সুপ্লটিও আকাজ্জ্চার রাজ্যে নির্বাসিত হয়ে যায়। যোগ্য অনুসারী জোগাড় করা, তাদেরকে সর্বোচ্চ ত্যাগে অনুপ্রাণিত করা, কার্যকরী প্রশিক্ষণ ও দক্ষ হাতে পরিচালনা করা একজন নেতার মৌলিক কাজ। সব সময় তাদের পাশে থাকা প্রয়োজন। কাজগুলো ঠিকমতো করছে কিনা, করতে পারছে কি না—তা তদারকি করা প্রয়োজন। এসব কর্তব্য আঞ্জাম দেওয়ার মধ্য দিয়েই একজন মানুষ সাধারণ থেকে অসাধারণ নেতা হয়ে ওঠেন।

একজন অসাধারণ নেতাকে অবশ্যই এমন একটি ব্যবস্থা-পদ্ধতি তৈরি করে যেতে হবে, যা তার দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কোনো অসাধারণ প্রতিভাকে যদি দারুণ একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে রূপান্তর করা না যায়, তাহলে নেতার মৃত্যুর সঞ্জো সঙ্গো তার মৃত্যুও কার্যকর হয়ে যায়। নস্টালজিয়া হিসেবে হয়তো মাঝে মাঝে স্মরণ করা হবে; কিন্তু নেতার পরবর্তী প্রজন্ম তার প্রতিভা থেকে কোনোভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ আর থাকবে না। কোনো মহৎ সংগঠনকে সফল হতে হলে নেতাকে ব্যক্তি-পরিচালনাধীন (person driven) থেকে নিয়মতান্ত্রিকতার অধীন (process driven) রূপান্তর করতেই হবে। তা না হলে নেতার কাজ প্রজন্ম পরিবর্তন করার মতো উন্নত লক্ষ্য সাধন হবে সংগ্রহাল বাবে সাবে লাগের কাজ প্রজন্ম পরিবর্তন





অসাধারণ হওয়ার উপায়

মানদণ্ড এত প্রাণবস্ত ও স্পন্টভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, সবচেয়ে খারাপ শত্রুও তাঁর পক্ষে কথা বলতে বাধ্য হয়। এর অনেক প্রামাণ্য ঘটনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠি পাওয়ার পর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের কথোপকথনের ঘটনাটা আমরা উদাহরণ হিসেবে মনে করতে পারি।

অসাধারণ হওয়া নেতার ঐচ্ছিক বিষয় নয়; এটা অত্যাবশ্যকীয় অনুষজ্ঞা। এমন সব দিকে অসাধারণ হতে হবে, যা লোকদের অনুপ্রেরণা দেবে, শক্তিমান করবে, তাদের মধ্যে সামর্থ্য সঞ্চার করবে এবং তাদের ক্ষমতায়ন করবে। সাহসীরাই অন্যদের সাহস দিতে পারে। মানবজাতির ইতিহাসে এমন কেউ নেই, যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো জীবনের সবক্ষেত্রে অসাধারণ নেতৃত্বের উদাহরণ দেখিয়েছেন। এ কারণেই তাঁর সাথিরা তাঁর প্রতি আনুগত্যের এক উদাহরণীয় ভিন্ন মাত্রা প্রদর্শন করেছিলেন। তারা তাঁকে ভালোবেসেছিলেন এবং তিনিও তাদেরকে।



অসাধারণ বিশ্বাস কী?

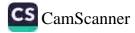
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে যে অসাধারণ গুণাবলির সন্নিবেশ ঘটেছিল, সেগুলোর প্রথমটি হলো বিশ্বাস। বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বারবারা উইন্টার্সের ভাষায় বলি, কোনো বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ভরসা করার যোগ্যতা থাকা।

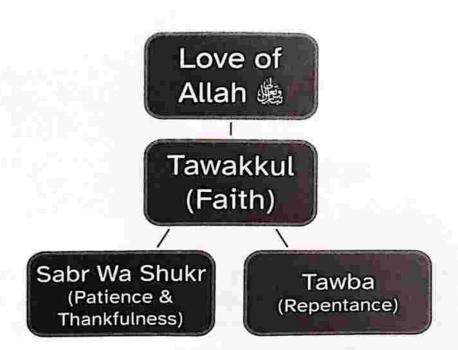
"When you come to the end of the light of all that you know and are about to step off into the darkness of the unknown, faith is knowing that one of two things will happen. There will be something firm to stand on or you will be taught how to fly." ~Barbara Winters

'যখন তুমি আলোর একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে এবং অজ্ঞানা অন্ধকারের দিকে পা বাড়াবে, তখনও তুমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, সামনে নিশ্চয় এমন শক্ত কিছু পাবে যেখানে পা রাখা যাবে, অথবা তুমি উড়তে শিখে যাবে।এ দুটি জিনিসের যেকোনো একটি অবশ্যই ঘটবে, এমন শক্তপোক্ত ধারণা করাটাই বিশ্বাস।'

শব্দগুলোর ব্যবহার খেয়াল করুন। তিনি কিন্তু বলেননি, Faith is believing. তবে বলেছেন, Faith is knowing এবং এই দুইয়ের মধ্যে বিশাল ফারাক রয়েছে। To know বা জানা হলো সকল সন্দেহের উধ্বে উঠে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত বিশ্বাস করা। বিশ্বাসের এ গুণটাই যে কাউকে ঝুঁকি নিতে সাহায্য করে। শেষ প্রান্তে পৌঁছে পা বাড়ানোর সময় বিশ্বাস করা যে, আপনি ধ্বংস হবেন না; বরং আপনার জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে এবং আল্লাহর সজ্ঞা যোগাযোগের এমন স্তরে পা রাখবেন—যা কখনো ভাবতেও পারেননি।

বিশ্বাস খুবই জন্নুরি। কারণ, এটা ছাড়া মানুষের হৃদয় ও ভাবাবেগ পরিবর্তন করার মতো কঠিনতম কাজ অসম্ভবই থেকে যায়। বিশ্বাস শব্দটি ক্ষুদ্র; কিন্তু এর অর্থ বিশাল। একেক মানুষের কাছে এর অর্থ একেক রকম। তাই আমি 'ফেইথ' বলতে কী বোঝাচ্ছি, তা বরং ব্যাখ্যা করি।





আমার মতে ফেইথ একটি ডায়নামিক প্রসেস, যেখানে তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটে। এগুলো হলো:

১. কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করা।

আল্লাহর নিয়ামাতের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া।

৩. আমাদের পাপ ও ভুলগুলোর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা। একই সঙ্গো বিনীত আর্জির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য কামনা করা। কারণ একটাই, আমরা তাঁকে ভালোবাসি।

বারবারা উইন্টার্স যেভাবে বলেছেন, ঈমান হলো এমনভাবে জানা, যখন বস্তুগতভাবে সঠিক হওয়ার তোয়াক্বা না করেও বিশ্বাসকে অটল রাখা যায়। ঈমান নিছক বাস্তববাদী দুনিয়ার বস্তুব্যের মতো অন্ধভাবে বিশ্বাস করা নয়। ঈমান হলো বস্তুকে অতিক্রম করে এমন কিছু দেখতে পারা, যা সাদা চোখে দেখা যায় না বা বর্ণনা করা যায় না; কিন্থু হুদয়ের চোখ দিয়ে পুরোপুরি অনুভব করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেন্টা করি।

জার্মানদের সঞ্জো তীব্র যুন্ধের পর একজন সৈনিক তার অফিসারের কাছে নো ম্যান'স ল্যান্ড এলাকায় গিয়ে সহযোদ্ধার দেহ নিয়ে আসার অনুমতি চাইল। অফিসার তাকে বোঝানোর চেন্টা করলেন। বললেন, দেখো সে মরে গেছে। এখন তোমার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার দেহ নিয়ে আসার দরকার কী? কিন্তু সৈনিক তার অবস্থানে অনড, ফলে একপর্যায়ে অফিসার তাকে অনুমতি দিলেন এবং কোম্পানিকে নির্দেশ দিলেন সৈন্যটি সহযোদ্ধার দেহ নিয়ে ফেরত আসা পর্যন্ত তাকে কাভার দিতে। কয়েক মিনিট পর সৈন্যটি অক্ষত অবস্থায় ফিরে এল, তার কাঁধে সেই সহযোদ্ধার লাশ। অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, নিজের জীবনের ঝুঁকি নেওয়ায় কী লাভ হলো? বাঁচাতে তো আর পারলে না!



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অসাধারণ বিশ্বাস কী?

সৈন্যটি বলল, স্যার, আমি যখন তার কাছে পৌঁছলাম, দেখি সে তখনো বেঁচে আছে। আমাকে দেখে বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং আমার কাঁধেই মারা গিয়েছে। লাভ এটুকুই।

বিশ্বাস অন্ধ নয়; এটি এমন কিছু দেখতে পায়—যা অবিশ্বাসীর সৌভাগ্যে জোটে না। ভালোবাসা, নিষ্ঠা, বিনাস্বার্থে করা সহযোগিতার লেন্স দিয়ে এটি দেখতে পায়। ভালোবাসার মানুষের সজ্জো থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই বিশ্বাস। বিশ্বাস তীব্র প্রচেন্টায় হতাশার অন্ধকার রাস্তাকে আলোয় বিকরিত করে। কারণ, এটি জানে এই পথে সফলতা ও ব্যর্থতা মাইলের হিসাবে মাপা হয় না; বরং যিনি অন্তরের খোঁজ রাখেন, তাকে সন্তুন্ট করার অভিপ্রায়ে উঠে দাঁড়ানো ও প্রচেন্টা চালানোর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে এর আদ্যোপান্ত। যখন সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখনও যে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তার মুখের হাসিই পরম বিশ্বাস। কারণ, সে এমন কিছু শুনতে পেয়েছে যা অন্যরা পায়নি।

সে যখন হাঁটে, অন্যরা থেমে গিয়ে তাকে দেখে এবং বিস্মিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে তারাও ঘুরে দাঁড়ায়, দলে দলে তার সঙ্গো যোগ দিতে থাকে এবং এটি একটি কাফেলায় রূপ নেয়। তারা তাকে অনুসরণ করে। কারণ, এর মধ্যেই তারা জ্রীবনের অর্থ এবং নিজেদের পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়।

ইসলামের ভাষায় বিশ্বাস হলো 'তাওয়াক্কুল' বা নির্ভরতা। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

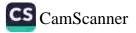
যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিম্কৃতির পথ করে দেবেন। তাকে তার ধারণাতীত উপায়ে রিয্ক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেস্ট। [সূরা তালাক ৬৫: ২-৩]

তাওয়াকুল-বিশ্বাস ওপরে বর্ণিত তিনটি কাজের ফলাফল।

তাওবা (ক্ষমা প্রার্থনা)

আল্লাহ তা আলা আমাদের অপরাধের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার আদেশ করেছেন। তাওবা হলো পথনির্দেশনা পাওয়ার প্রথম শর্ড; কারণ তাওবা কোনোকিছু পরিবর্তনের আগ্রহ নির্দেশ করে। মানুষ যদি কোনো পরিবর্তনের ব্যাপারে সচেতন না হয় বা প্রয়োজন অনুভব না করে, তাহলে সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন সম্ভব নয়। তাই আমরা যখন তাওবা করি, তার মানে হলো আমরা আমাদের মনোভাব এবং পথ পরিবর্তনের ব্যাপারে সচেতন হয়েছি।

আলাহ তা'আলা হজরত আদম ও হাওয়াকে দুনিয়ায় প্রেরণের পর প্রথমে তাওবা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইবলিস, আদম, হাওয়া---প্রত্যেকেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধে ভুল করেছিল; কিন্তু পার্থক্য তৈরি হলো তাদের মনোভাবে---যখন তারা তাদের ভুল সম্পর্কে সচেতন হলো। আদম ও হাওয়া সজো সজো অনুতপ্ত হলেন এবং বললেন,



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft লিডারশিপ লেমন্স

হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অতি অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। [সূরা আ'রাফ ৭: ২৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দেন, সঠিক পথের দিশা দেন _{এবং} পরবর্তীদের পথ নির্দেশনার উৎস বানিয়ে দেন। অন্যদিকে ইবলিস অনুতপ্ত ছিল না; বরং সে আল্লাহর কাছে সময় চেয়ে বলল,

| আমাকে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। [সূরা আ'রাফ ৭: ১৪]

আজ্র আমাদের যদি খারাপ কাজ ছেড়ে দিতে বলা হয়, আমরা সময় চেয়ে নিই। আমাদের ভেবে দেখা উচিত, আমরা কার মনোভাবের পুনরাবৃত্তি করছি? আদম-হাওয়ার নাকি ইবলিসের? অন্যায়ের ওপর অটল থাকা খারাপ পরিণতির কারণ।

আরবিতে বলা হয়, 'লা কাবিরা মা'আল ইসতিগফার ওয়া লা সগীরা মা'আল ইসরার' অর্থাৎ পাপ যত বড়ই হোক না কেন, তাওবা করলে তা বড় থাকে না; আর পাপ যত ছোটই হোক, অবিরাম করতে থাকলে তা আর ছোট তাকে না। পাপের ওপর অটল থাকার ফলে হিদায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় এবং আমাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়। যারা নিজেদের সংশোধন প্রত্যাখ্যান করে পাপের ওপর গোঁ ধরে থাকে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

তারা যখন তাদের দেওয়া উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি তাদের সামনে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি যখন তাদেরকে প্রদন্ত বিষয়াদির জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদের পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। [সূরা আন'আম ৬: ৪৪]

আল্লাহ তা'আলা হলেন 'গায়ূর' (গর্বিত, সম্মানিত) এবং আমাদের নিজেদেরকে সংশোধনের একাধিক সুযোগ দেওয়ার পরও যখন আমরা তাঁর বিরোধিতা করে থাকি, তখন তিনি হিদায়াতের দরজা বন্ধ করে দেন। পরিবর্তে তার জন্য বিরুম্বাচরণের স^ব দরজা খুলে দেন, যেন সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়। তারপর যখন হঠাৎ মৃত্যু তার সামনে উপস্থিত হয়, তখন তার কাছে তাওবা করার কোনো সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ আমাদের এমন করুণ পরিণতি থেকে হিফাজাত করন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সব রকমের অবাধ্যতা ও পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। কোনো পাপকেই ছোট বা ক্ষুদ্র জ্ঞান করা উচিত নয়; কারণ যেকোনো পাপই আল্লাহর অবাধ্যতার নিদর্শন এবং এ ধরনের মনোভাব খুবই ভয়ানক। তাই কেবল নির্দিষ্ট কোনো কাজ নয়; বরং আমাদের মনোভাব বা দৃষ্টিভজ্জিার ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত। কারণ, পাপ-প্রবণ মানসিকতাই মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

সকল পাপের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো শিরক করা এবং কেউ যদি এর ^{ওপর} মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আল্লাহ তার সকল পাপ ক্ষমা করলেও এটা ক্ষমা করবেন না।





Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অসাধারণ বিশ্বাস কী?

দীনের যে সকল বিষয় আমাদের ভালো লাগে, সেগুলো পালন করা এবং যেগুলো ভালো লাগে না, সেগুলো ত্যাগ করার দৃষ্টিভজ্জি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। এটা অহংকারের চূড়ান্ত রূপ এবং আল্লাহর ক্রোধের কারণ। বর্তমান সময়ে এমন অনেক মুসলমান আছে, যারা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে এমন অনেক কিছুকে বৈধ করে নিয়েছে, আবার তারা নামাজও পড়ে। আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ যারা ত্যাগ করে না, তারা কীভাবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন' (আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই)। এ ধরনের উদ্ধত্য, নিজেদের ইচ্ছামতো বিধান বেছে নেওয়া, সেচ্ছাচারী জীবনযাপন দুনিয়া এবং আখিরাত দুদিকেই শাস্তি অবধারিত করে তোলে।

তাই আল্লাহর অবাধ্যতা এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহের বিপরীত সবকিছু আমাদের অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে; যথাসম্ভব দ্রুত তাওবা ও ইসতিগফার করে দীন পালনে মনোযোগী হতে হবে। কতদিন ধরে এই কাজ করা উচিত? যতদিন আমরা বেঁচে থাকি, ততদিন।

তাওবা মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকে ফিরে আসা এবং ইসতিগফার হলো আল্লাহর কাছে অতীত পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে ফিরে আসার উপায়। তাওবা এবং ইসতিগফার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একটি আরেকটিকে অনুসরণ করে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওযি এ বিষয়ে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমি এখানে উল্লেখ করছি:

তাওবা ও ইসতিগফারের অর্থ

বিদ্বানরা তাওবা (ক্ষমাপ্রার্থনা) বলতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বুঝিয়েছেন:

- ১) পাপ পরিত্যাগ করা
- ২) পাপের পথে পুনরায় ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা করা
- ৩) কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা করা
- 8) যদি পাপটি অন্য কোনো মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার সজ্জো সম্পৃক্ত হয়, তবে

তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

এগুলো তাওবার শর্ত হিসেবে বিবেচিত; তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বর্ণিত তাওবার অর্থ আরও ব্যাপক। উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও ধৈর্য সহকারে আল্লাহর সকল নির্দেশ মেনে চলাও এর অন্তর্ভুক্ত। যারা তাওবা করতে অনাগ্রহী, তাদের অপছন্দ করা, তাদের সঞ্চা পরিত্যাগ করা, সুযোগ বুঝে তাদের তাওবার জন্য উদবুন্ধ করা এবং ক্ষমা চাওয়ার অভ্যাসকে উপেক্ষা না করার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়াও তাওবার অন্তর্ভুক্ত। সোজা কথায় তাওবা হলো পাপ সংগঠনের বিপরীত কাজ। শুধু পাপ ত্যাগ করা এবং এর জন্য অনুশোচনা করাই তাওবার সবটুকু নয়। তাওবার সামগ্রিক সারমর্ম হলো আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, তিনি যা পছন্দ করেন তা পালন করা এবং যা অপছন্দ করেন তা পরিত্যাগ করা। তাওবা হলো আল্লাহর অপছন্দনীয় থেকে পছন্দনীয় কাজের দিকে, অবাধ্যতা থেকে বাধ্যতার দিকে, ক্রোধ থেকে দয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft লিডারশিপ লেমনম

ইসতিগফার এবং তাওবা

ইসতিগফার মানে ক্ষমা চাওয়া এবং তাওবা মানে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। যখন কেউ তার ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহর বাধ্যগত হয়ে যায় এবং তার কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তখন সেটা হয় তার ভেতর ইসতিগফার ও তাওবার পারস্পরিক সক্রিয়তার যোগফল। আল্লাহর সঙ্গো সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী যে কারোর জন্য দুটোই করণীয়। তাকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে তার ভূল, পাপ এবং খারাপ কাজ স্থীকার করতে হবে এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। একই সঙ্গো তাকে অবশ্যই শর্তহীনভাবে খারাপ কাজগুলো ত্যাগ করতে হবে এবং আল্লাহর অনুগত হতে হবে। যেমন: কেউ যদি নামাজ না পড়ে, তাহলে সে সবচেয়ে খারাপ কাজগুলোর একটি করার দোষে দুন্ট। যখন সে তার কৃতকর্মের লোকসান সম্পর্কে উপলবম্বি করতে সক্ষম হবে, দেরি না করে সে আল্লাহর দরবারে ইসতিগফারের মাধ্যমে ক্ষমা চাইবে এবং তাওবা করে পাপ থেকে ফিরে আসবে। পেছনের না পড়া নামাজ কাযা করে নেবে এবং এখন থেকে নিয়মিত প্রতি ওয়ান্ত নামাজের পাবন্দি করবে। নিয়মিত নামাজ পড়াই হলো তার তাওবা বা প্রত্যাবর্তন; যা ছাড়া ইসতিগফারের

কুরআনে ইসতিগফার—যার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা—শব্দটি দুভাবে বর্ণিত হয়েছে। হয় শুধু ইসতিগফার, অথবা তাওবার সঙ্গো মিলে। শুধু একক ইসতিগফারের ব্যবহার পাওয়া যাবে নিচের আয়াতে, যেখানে হজরত সালেহ স্কুদ্রা তার জাতির উদ্দেশে বলছেন,

হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ কামনা করছ কেন? তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছ না কেন? হয়তো তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে। [সূরা নাম্ল ২৭: ৪৬]

আল্লাহ আরও বলেন, আর আল্লাহর কাছেই মাগফিরাত কামনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়। [সূরা মুয্যাম্মিল ৭৩: ২০]

I তিনি আরও বলেন, ক্ষমাপ্রার্থনা মানুষকে ক্রোধ থেকে রক্ষা করে:

অথচ আল্লাহ কখনোই তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না, যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তা ছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবে, আল্লাহ কখনও তাদের ওপর আযাব দেবেন না। [সূরা আনফাল ৮: ৩৩]

তাওবার সঙ্গো মিলে ইসতিগফারের ব্যবহার নিচের আয়াতগুলোতে পাওয়া যায়:

আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, তারপর তাঁরই দিকে ফিরে এসো। তাহলে তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশি দেবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের ওপর এক মহাদিবসে আযাবের আশজ্জা করছি। [স্রা হুদ ১১: ০৩]



Compressed with PDF Compressor by DI M Infosoft অসাধারণ বিশ্বাস কী?

আর হে আমার কওম, তোমাদের রবের কাছে তোমরা মাফ চাও, তারপর তাঁরই দিকে ফিরে এসো। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বারিধারা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির ওপর শস্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মতো বিমুখ হয়ো না। [সূরা হুদ ১১: ৫২]

আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি, তিনি বললেন—হে আমার জাতি, আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তিনিই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাতেই তোমাদের বসতি দান করেছেন। অতএব, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চলো; আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, নিশ্চয় তিনি ডাকে সাড়া দেন। [সূরা হুদ ১১: ৬১]

কেউ যদি পাপ করতেই থাকে, আর তাওবার শর্ত পূরণ না করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়; তবে এটি সত্যিকারের ইসতিগফার নয় এবং এটা তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না। ইসতিগফারের মধ্যে তাওবা অন্তর্ভুক্ত এবং তাওবার মধ্যে ইসতিগফার: প্রত্যেকটি অন্যটির মধ্যে উহ্য আছে।

ইসতিগফার শব্দের তাৎপর্য ব্যাপক। এর মধ্যে বর্ম বা আড়ালের জন্য ক্ষমা চাওয়ার অর্থও অন্তর্ভুক্ত—আমাদের মানবিক ব্রুটিবিচ্যুতি এবং যাবতীয় ধ্বংসাত্মক ভুল থেকে আড়াল বা রক্ষা করা। মানুষের সবচেয়ে ক্ষতিকর বিচ্যুতি হলো অজ্ঞতা এবং পাপ। এ দুটি ব্রুটির কারণে মানুষ এমন পর্যায়ে নেমে যায়, যা তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এই দুই ধরনের ব্রুটি থেকে রক্ষা করার বর্ম হলো নিজের ভুল সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিজের মধ্যে স্রন্টাপ্রদন্ত জ্ঞান, সুবিচার, ধার্মিকতা স্পন্ট করা। আল্লাহ মানুষের মধ্যে রুহ ফুঁকে দেওয়ার মাধ্যমে যে মর্যাদা দান করেছেন, মানুষ যতই তা ভুলে যাবে, ততই তার পাপ ও অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে এবং সে নিজেকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনবে।

যখন তাওবা ও ইসতিগফার শব্দ দুটো একত্রে ব্যবহৃত হয় (ইসতিগফার এর পরে তাওবা), তখন একটির (ইসতিগফার) অর্থ হলো যা ঘটে গেছে তার মন্দ ও ক্ষতি থেকে প্রতিরক্ষা চাওয়া। দ্বিতীয়টির (তাওবা) অর্থ হলো আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতের মন্দ থেকে সুরক্ষা প্রার্থনা করা। এখানে দুটি বিষয় দেখা যাচ্ছে, একটি হলো সেই পাপ, যা ইতোমধ্যেই সংগঠিত হয়ে গেছে, ইসতিগফারের মাধ্যমে তার ক্ষতি থেকে সুরক্ষা প্রার্থনা করা হচ্ছে। আবার অন্যটি হলো, আগামীতে একই পাপের পুনরাবৃত্তি; যার ভয় আমরা করছি, তা আর না করার দৃঢ় সংকল্লের নাম তাওবা। আল্লাহর দিকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইসতিগফার ও তাওবা দুটোই সমানভাবে আবশ্যক। যখন একত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন দুটোই আলাদাভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার গুরুত্ব প্রকাশ করে। আবার যখন একাকী ব্যবহৃত হয়, তখন প্রত্যেকটি অন্যটিকেও বুঝিয়ে থাকে।

তাওবার সবচেয়ে বড় উপকার হলো এটি নিজেই আমাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত করে, নিজ্ঞেই আমাদের জ্রীবনের প্রতি আমাদের মনযোগ নির্দিষ্ট করে। কারণ, তাওবা

CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft লিডারশিশ লেসন্স

করার সময় আমরা আমাদের জীবনে কৃতকর্মের হিসাব করে নিই। তাওবা আমাদের মধ্যে নম্রতা প্রতিষ্ঠিত করে এবং সেই সত্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, একদিন আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যাব।

তবে কোনোভাবেই আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। তিনি বলেছেন,

বলুন, (আল্লাহ বলেছেন) হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তারা আল্লাহর রাহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা যুমার, ৩৯: ৫৩]

আমাদের বিশ্বাস—যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ নিষ্ঠার সঙ্গো ক্ষমা চায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তাই আমরা কখনোই আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হই না। যখন আমরা অনুশোচনা করতে অস্বীকার করি এবং মাত্রাতিরিস্ত পাপে জড়িয়ে পড়ি, তখন হিদায়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং এ ধরনের কাজ আমাদের কুফরের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

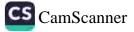
যারা কাফের হয়েছে, আপনি তাদের ভয় প্রদর্শন করুন বা না করুন—উভয়টাই তাদের জন্য সমান। তারা ঈমান আনবে না, আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ এবং কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। [সূরা বাকারা ২: ৬-৭]

তাওবা কবুল হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে

>. যিনি তাওবা করছেন, তাকে প্রকৃতভাবেই অনুশোচনাকারী ও অনুতপ্ত হতে হবে এবং যে কাজের জন্য তাওবা করছেন, সেটা ঘৃণা করতে হবে। আদম এবং হাওয়া সেই পরিম্থিতিতে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হন এবং তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তারা তাদের কাজকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করার কোনো চেন্টা করেননি। বুঝতে পারার পর দেরি করেননি কিংবা সময় চাননি। তারা আল্লাহকে অমান্য করার ভয়াবহতা অনুভব করেছিলেন। কারণ, তারা আল্লাহর মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো পাপেই 'ক্ষুদ্র' নয়। কারণ, সকল পাপই আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তিনি কোনো 'ক্ষুদ্র' সন্তা নন।

২. যিনি তাওবা করছেন, তাকে একই কাজের পুনরাবৃত্তি না হওয়া নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেন্টা চালাতে হবে। আদম এবং হাওয়া কতবার আল্লাহকে অমান্য করেছিলেন? একবার। তারা তাদের দীর্ঘ জীবনে সেই একবারের পর আর কখনো পাপ করেননি। পাপের পুনরাবৃত্তি না করাই ক্ষমা চাওয়ায় আন্তরিকতার চিহ্ন।

৩. যিনি তাওবা করছেন, তার কৃত পাপের কারণে কারও ক্ষতি হলে তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। যেমন: তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া, তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া বা ক্ষতিপূরণ করা ইত্যাদি। কখনো কখনো পাপের প্রকৃতি এমন হয় যে, তা অন্যের বস্তুগত, ব্যক্তিগত অথবা অন্য যেকোনোভাবে ক্ষতি সাধন করে। এ ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। উক্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে এবং তার



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অসাধারণ বিশ্বাস কী?

কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এ কাজ ছাড়া আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। কারণ, সে যার প্রতি অন্যায় করেছে, সে আল্লাহ নয়, অন্য কেউ।^[5] যখন মানুষের অধিকার খর্ব করা হয়, তখন যার অধিকার খর্ব করা হয়েছে, সে প্রথমে ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। উলটো শেষ বিচারের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অধিকার খর্বকারীর ভালো কাজগুলো নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তকে দিয়ে দেবেন। আবার ক্ষতিগ্রস্তের খারাপ কাজগুলো চাপিয়ে দেবেন অধিকার খর্বকারীর ওপর। শেষমেশ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

যারা তাওবা করেন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুহাবানাহু ওয়া তা'আলার দয়ার দৃষ্টান্ত এ রকম:

যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রাহমাত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত; অতএব, যারা তাওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদের ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদের দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপদাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় এবং আপনি তাদের অমর্জাল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমর্জাল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। [স্রা মু'মিনুন, ৪০: ৭-৯]

যারা তাওবাকে গুরুত্বের সঞ্চো গ্রহণ করবে, মহান রাব্বল আলামীন তাকে কেবল মাফ করে দেওয়াই নয়; বরং তার পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা ফুরকান ২৫: ৭০]

রাব্বল আলামীন আমাদের তাওবা করার এবং প্রতিনিয়ত তার ক্ষমাপ্রার্থনার তাওফিক দিন। তিনি আমাদের ইসতিগফার কবুল করুন এবং এমন জীবনযাপনে সাহায্য করুন, যেন তাঁর সামনে অপমানিত অবস্থায় উপস্থিত হতে না হয়। তাঁর দয়া যেন তাঁর ক্রোধ থেকে সুরক্ষাকারী হয়।

No I

১. হক দুই প্রকার। ১. হকুল্লাহ বা আল্লাহর হক ২. হকুল ইবাদ বা বান্দার হক। আল্লাহর হক নন্ট করা, যেমন: ইবাদাত ছেড়ে দেওয়া, শিরকে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। হকুল ইবাদ মানে বান্দার হক। যেমন: কারও অর্থ-সম্পদ মেরে দেওয়া, জমি দখল করা ইত্যাদি। হকুল্লাহ নন্টকারী তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। শিরক ছাড়া আর সব পাপই তিনি ক্ষমা করে দেবেন; কিন্তু বান্দার হক কখনোই আল্লাহ নিদ্ধ উদ্যোগে ক্ষমা করবেন না। এর ক্ষমা চাইতে হলে আগো সংশ্লিন্ট ব্যক্তি থেকে দাবি তুলিয়ে নিতে হবে। তারপর তাওবা কবুল হবে। বান্দার হক সরাসরি আল্লাহ ক্ষমা করেন না। - সম্পাদক

Commence of with DDE Commence or by DLM inforest

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সকল আধ্যাত্মিক উন্নতি শুরু হয় আল্লাহর দিকে ফেরার মাধ্যমে এবং এ কারণে আমি এই প্রসজ্ঞাটা প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপন করলাম।

সবর এবং শোকর (ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা)

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। মানুষ কেবল তখনই সন্তুষ্টি এবং অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে, যখন সে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতের জন্য কৃতজ্ঞ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

। যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেবো এবং যদি

বিষ্ণৃতজ্ঞ ২ও, তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে কঠোর। [সূরা ইবরাহীম ১৪: ৭] তাওবা করার তাওফিক এবং সুযোগ দেওয়ার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা তাওবার পথ খোলা না রাখতেন, তাহলে আমাদের কী হতো? একজন মানুষ আল্লাহপ্রদন্ত নিয়ামাতের জন্য যত বেশি শোকরগুজার হবে, তত বেশি সে এই নিয়ামাত সম্পর্কে জানবে এবং আল্লাহকে তালোবাসবে। কৃতজ্ঞতা আল্লাহর বিশালতা ও গরিমা বিষয়ে বান্দাকে আরও সুচারু করে। এই পৃথিবীর স্রুষ্টা ও মালিক যে মানুষের প্রতি দয়াবান, সেই সম্বন্ধে সমৃন্ধ করে। কৃতজ্ঞতার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো মানুষ যে কারণে কৃতজ্ঞ, তা আরও উপভোগ্য হয়। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞতার প্রথম শাস্তি হিসেবে তার আনন্দ কেড়ে নেওয়া হয়। ফলে মানুষ তার যা আছে, তা নিয়ে সুখী হতে পারে না এবং স্ব-নির্যাতনের যন্ত্রণায় ভূগতে থাকে।

শোকর বা কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্লেউভাবে বলেছেন, আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, এটা তাঁর অধিকার। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে নিয়ামাত আরও বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি আমাদের পুরস্কৃত করবেন। পবিত্র কুরআনে বিসমিল্লাহর পর একদম প্রথম আয়াতটিই শোকরের আয়াত: 'আলহামণু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' (সকল প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর প্রতি)। আল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তাঁর উপকার ও পুরস্কারের কথা যেমন বলেছেন, কৃতন্ন ব্যক্তিকে এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্কও করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি 'কুফর' (অস্বীকার করা) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারপর শাস্তির কথা ^{বেলে} 'শাদীদ' বিশেষণ এনে আল্লাহর সাজা অনেক কঠিন বলে ধমকে দিয়েছেন।

যারা সবর (ধৈর্য) করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করার এবং পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে শোকর। বান্দা সর্বাবস্থা^{য়} আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। এ কারণে সবর ও শোকর পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত।

। হে মুমিনরা, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঞ্জো আছেন। [সূরা বাকারা ২: ১৫৩]

10

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, এবং তোমাদের ক্ষমতা-সক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সজ্যে রয়েছেন। [সূরা আনফাল ৮: ৪৬]



Compressed with PDF Compressor by DL M Infosoft অসাধারণ বিশ্বাস কী?

সবর আর শোকর অঞ্চাঞ্চিভাবে জড়িত। ইসলামে সবর বা ধৈর্যের ধারণাটি অদ্বিতীয়। সাধারণভাবে ধৈর্য বলতে বোঝায় কঠিন সময়কে নীরবে সহ্য করা, সবর তা বোঝায় না। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামে ধৈর্য বা সবর অর্থ হলো, যা ঘটছে তাকে আল্লাহর নির্ধারণকৃত তাকদীর হিসেবে মেনে নেওয়া। এর মানে হলো, নিজের সর্বশস্তি এবং সামর্থ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং ফলাফলের জন্য তার ওপর নির্ভর করে থাকা। আল্লাহ তা 'আলা অনেক জায়গায় 'মুজাহিদূন' বোঝানোর জন্য 'সাবির্ন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একজন মুজাহিদ শুধু আল্লাহর সাহায্যের জন্য বসে থাকে না। সে তার কাছে যা আছে, তাই নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় প্রচেষ্টা চালায় এবং আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু 'আ করতে থাকে। যে যুন্ধ করছে, সে কখনো বসে থেকে কন্ট সহ্য করে না। সর্বদা জাগ্রত থাকে, বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে, চিন্তা ও পরিকল্পনা করে। যুদ্ধে জয়ের জন্য তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়। সমস্ত কাজের নাযরানায়, প্রচেষ্টার শেবে সে তার রবের দরবারে সাহায্য্যের জন্য প্রার্থনা করে। সে জানে, আল্লাহর সাহায্য্য ছাড়া তার পক্ষে কোনোকিছু অর্জন করা সম্ভব নয়।

সবর মানে কাজ করা; সর্বোচ্চ প্রচেন্টা চালানো এবং তারপর আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। সবরের এই ধারণাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে বদরযুদ্ধের সময় দেখা যায়। যখন তিনি সামান্য উপকরণ নিয়ে যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁর বিখ্যাত দু 'আটি করেন। সাহায্যের আবেদন নিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে বিনীত হয়ে বলেন—হে আল্লাহ, আত্মাভিমানী এবং উম্বত কুরাইশরা তোমার প্রতি অহংকার দেখিয়ে এবং তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এখানে উপস্থিত হয়েছে। হে আল্লাহ, তুমি যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, আমি তার প্রতীক্ষায় আছি। আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, আল্লাহ তুমি তাদের পরাজিত করো। হে আল্লাহ, আজ যদি মুসলমানদের এই দল পরাজিত হয়, তা হলে দুনিয়ায় আপনার ইবাদাত করার জন্য আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

তিনি কিবলার দিকে মুখ করে দুই হাত ছড়িয়ে অনবরত তাঁর রবকে ডাকতে লাগলেন। কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর সে আহাজারি থামেনি। আবু বাক্র للله এসে চাদরটি তুলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁধে চড়িয়ে দিয়ে বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আপনার রবের নিকট যথেষ্ট কান্নাকাটি করেছেন। তিনি অবশ্যই তাঁর প্রতিপ্রুতি পূর্ণ করবেন।

অবিলম্বে আল্লাহর সহায়তা নেমে এল। তিনি তাঁর রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাথিদের সহায়তা করার জন্য আসমান থেকে ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহ বলেন,

স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের কাছে ওয়াহি পাঠিয়েছিলেন— আমি তোমাদের সঞ্জোই আছি—সুতরাং মুমিনদের অবিচল রেখো। অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরসমূহে ভয় ঢুকিয়ে দেবো তাই তাদের ঘাড়সমূহে আঘাত করো এবং আঘাত করো তাদের জ্বোড়ায় জ্বোড়ায়। [সূরা আনফাল ৮: ১২]



স্মরণ করো, যখন তোমরা নিজ রবের কাছে সাহায্য চেয়েছিলে, তিনি তখন তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরি দান করলেন যে, আমি তোমাদের সাহায্য করব ধারাবহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। [সূরা আনফাল ৮: ০৯]

আয়াত নাযিলের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দিয়ে কিছুটা তন্দ্রাবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি মাথা তুললেন। তাঁর চোখে আনন্দের অশ্রু, বললেন: হে আবু বাক্র, তোমাকে অভিনন্দন। আল্লাহর বিজয় সন্নিকটে। বালুঝড়ের মধ্যে আমি ঘোড়ায় বসা জিবরাইলকে দেখতে পাচ্ছি। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

। এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। [সূরা কামার ৫৪: ৪৫]

জিবরাইল ২৬ এন নির্দেশনা অনুযায়ী রাসূল ﷺ একমুঠো নুড়ি বালি তুলে নিলেন, শত্রুদের দিকে ছুড়ে মেরে বললেন, বিভ্রান্তি তাদেরকে পাকড়াও করুক। তার ধূলি নিক্ষেপ করা মাত্র এক ভয়ানক বালুঝড় বিস্ফোরিত অগ্নিকণার ন্যায় শত্রুদের চোখে ছিটিয়ে পড়তে লাগল।

এ প্রসজ্জো আল্লাহ বলেন,

। আর তুমি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে; বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং। [সূরা আনফাল ৮: ১৭]

হাদীসের বর্ণনা থেকে সুম্পউভাবে জানা যায়, সেদিন আক্ষরিক অর্থেই ফেরেশতারা এসেছিলেন এবং মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। ইবনে আব্বাস ఉ বলেন সেদিন যখন মুসলমানরা একেকজন কাফিরকে তাড়া করছিল, তখন তার ওপর চাবুকের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল এবং একজন ঘোড়সওয়ার বলছিল, আঘাত হানো হাইজুম। তিনি দেখলেন, শত্রুসৈন্য মস্তকছির হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। একজন আনসার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি সত্য বলেছ। এটা ছিল তৃতীয় আসমান থেকে আসা সাহায্য। বদরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদাপদের মুখোমুখি হলে সালাত এবং সবরের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার কুরআনিক নির্দেশনার একটি বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তারপরই তিনি তাঁর রবকে ডেকে ছিলেন।

আল্লাহর ভালোবাসা

যখন কেউ তাওবা ও ইসতিগফার করে এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহর অনুগ্রহের শোকর করে, এটা স্বাভাবিক যে সে আল্লাহকে ভালোবাসতে শুরু করবে। তবে আল্লাহর ভালোবাসার সজ্জো অন্যান্য ভালোবাসাকে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। স্রন্টার প্রতি ভালোবাসা হলো ইবাদাত এবং এটা কেবল স্রন্টার নির্ধারিত উপায়েই প্রকাশ করতে হবে। আমরা যে রকম চাই, সে রকমভাবে প্রকাশ বা স্বীকার করার মতো কিছু নয়। যে সকল মানুষ আল্লাহকে ভালোবাসে, তারা সর্বদা তাঁর অনুগত এবং কখনোই তাঁর প্রদত্ত নিয়ামাত অবাধ্য পথে ব্যবহার করে না। আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন আমাদের জ্রীবন, সময়, সামর্থ্য, সম্পদ, শিক্ষা, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর অবাধ্যতায় ব্যবহার করা





অসাধারণ বিশ্বাস কী?

অকৃতজ্ঞতার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ। একারণেই আল্লাহর নৈকট্যের উপায় হলো কাসরাতুস সুজুদ, অর্থাৎ বেশি বেশি সিজদা করা। সিজদা হলো মুসলমানদের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সে কোনো প্রকার সংকোচ এবং শর্ত ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। ঠিক এ কারণেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা হারাম। মুসলমানের জন্য তার স্রফী ব্যতীত অন্য কারও নিকট নিজেকে অসহায়ভাবে সমর্পণ করার অনুমতি নেই। এটা মানুষের অস্তিত্বের জন্য অপমান। কেবল আল্লাহ-ই যে এমন আনুগত্যের যোগ্য, সেই সত্যকে এর দ্বারা অস্বীকার করা হয়। সকল ইবাদাত কেবল আল্লাহরই জন্য, তিনি ছাড়া অন্য কেউ বা কিছুই ইবাদাতের যোগ্য নয়।

প্রশ্ন হলো, কীভাবে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব? এর জবাব আল্লাহ তা´আলা নিজেই দিয়েছেন। তিনি তাঁর রাসূলকে বলেন:

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩১] উচ্চ প্রতি আসাদের আলোহায় প্রকার্বের উপ্লাম কলো আঁর মহাণ্ডক ক্রেয়া এবং চে

স্রন্টার প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশের উপায় হলো তাঁর অনুগত হওয়া এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণ করা। আমরা যখন তা করব, আল্লাহ আমাদের ভালোবাসবেন। আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের এটাই চাবিকাঠি।

আবার আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া এবং তাঁর সজো সংযোগ স্থাপনের উপায়ও একই; তাঁর প্রতি অনুগত হওয়া এবং তাঁর রাসৃলের সুন্নাহ অনুসরণ করা। এ ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যদি কেউ মনে করে যে সে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কিংবা তাঁর রাসূলের সুন্নাহ উপেক্ষা করে বা সুন্নাতের বিপক্ষে গিয়েও তা'আল্লুক মা'আল্লাহ (আল্লাহর সঞ্জো সংযোগ) বজায় রাখতে সক্ষম হবে, তাহলে সে নিজেকে বোকা বানাল। আল্লাহ বলেন, সবকিছুকে অতিক্রম করে তাঁকে ভালোবাসাই ঈমানের পরিচায়ক। একজন ঈমানদার যেকোনো সাধারণ ব্যক্তি-বস্তু ও অর্জনের চেয়েও আল্লাহকে বেশি ভালোবাসেন এবং আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকেন। আল্লাহ বলেন,

আর কোনো লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে; কিন্তু ঈমানদাররা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। যদি যালিমরা ভাবত যে, তাদের অবস্থা কেমন হবে—যখন তারা আযাব দেখবে আর উপলম্বি করবে যে যাবতীয় ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। [সূরা বাকারা ২: ১৬৫]

আল্লাহর কোনো নির্দেশ শুনলে ঈমানদারদের অবস্থা কেমন হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন,

তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। আমরা আপনার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। [সূরা বাকারা ২: ২৮৫]



লিডারশিপ লেডারাডা

আল্লাহ তাদের সম্বন্ধেও জানিয়ে দিয়েছেন, যারা আল্লাহর নির্দেশের তুলনায় নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলে,

আপনি কি তাকে দেখেন না যে, তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মতো; বরং আরও পথভ্রান্ত।

[সূরা ফুরকান ২৫: 88]

দুই দলের মধ্যবর্তী রেখা স্পষ্ট। আমরা কোন দিকে যেতে চাই, সেটা আমাদেরকেই বেছে নিতে হবে।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কাদের নিকটবর্তী, তা বলে দিয়েছেন,

নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গো আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে।

[সূরা নাহল ১৬: ১২৮]

যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং তাঁর সঙ্গো সংযোগ স্থাপন করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভালো কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তা-ও। ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান অনেক দূরের হতো! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। [সূরা আলে ইমরান ৩: ৩১]

আল্লাহ এমন একটি সম্পর্কযুক্ত দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, যেখানে আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে দুই ধরনের পরিণতি রয়েছে: দুনিয়াতে উপকার অথবা ক্ষতি এবং আখিরাতে পুরস্^{কার} অথবা শাস্তি। প্রত্যেকটি কাজই দুই ধরনের ফলাফল তৈরি করে। একটি এই দুনি^{য়ায়} জোটে এবং অন্যটি আখিরাতে পাওয়া যাবে।

মনে রাখা উচিত, আল্লাহ যখন বান্দাকে ভালোবাসেন, তাঁর ভালোবাসা এই পৃথিবী এবং তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অন্যদিকে যখন আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে অপছন্দ করেন, তার প্রতি ঘৃণা এই দুনিয়া এবং এর সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মানুষ আমাদের ভালোবাসবে, সম্মান ও প্রন্ধা করবে, নাকি ঘৃণা, অপমান ও অসম্মান—তা নির্ধারিত হয় আল্লাহ আমাদের পছন্দ করেন না অপছন্দ— তার ওপর।

যারা মানুষকে নেতৃত্ব দিতে এবং প্রভাবান্বিত করতে আগ্রহী, তাদের অবশ্যই উপলঞ্চি করা উচিত যে, আল্লাহর সঞ্জো সংযোগ স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি অনুগত হওয়া ব্যতীত মানুষের ভালোবাসা আশা করা উচিত নয়। হজরত আবু হুরায়রা 🖑 থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন: যদি আলাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কোনো বান্দাকে প্রচল করে নি বান্দাকে পছন্দ করেন, তিনি জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ভালোবাসি, তাই তমিও তাকে ভালে জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ভালোবাসি, তাই তুমিও তাকে ভালোবাসো। জিবরাইল তখন তাকে ভালোসতে শুরু করেন। তারপর





অসাধারণ বিশ্বাস কী?

জিবরাইল আকাশে ডাক দিয়ে বলেন, আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসবে। এভাবে আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন এবং পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহ যদি কাউকে ঘৃণা করেন, তিনি জিবরাইলকে ডেকে বলেন— আমি অমুককে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা করবে। অতএব, জিবরাইল তাকে ঘৃণা করা শুরু করেন। তারপর জিবরাইল আসমানে ঘোষণা দিয়ে দেন যে, আল্লাহ অমুককে ঘৃণা করেন; অতএব, তোমরাও তাকে ঘৃণা করবে। এভাবে জমিনের বাসিন্দারা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং তাঁর প্রতি ঘৃণা জমিনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। [সহীহ মুসলিম, বুখারি, মুয়ান্তা মালিক ও তিরমিযি]

হাদীসে কুদসিতে আছে, আবু হুরায়রা 🚓 থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ রূ বলেছেন—আল্লাহ তা 'আলা বলেছেন, যে আমার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যস্তির সঞ্জো শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার সজো যুম্বে অবতীর্ণ হব। আমার বান্দা আমার নৈকট্য সবচেয়ে বেশি লাভ করতে পারে ফরজ হুকুম পালনের মধ্য দিয়ে। এরপর সে নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে এবং আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। এভাবে যখন আমি তাকে ভালোবাসি, এক পর্যায়ে তার কান আমার কান হয়ে যায়, তার চোখ আমার চোখ হয়ে যায়, তার হাত আমার হাত হয়ে যায়, তার পা আমার পা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে আমার কাছে কিছু চাইলে অবশ্যই আমি তাকে তা দিয়ে দিই; সে আমার আশ্রয় আইলে আমি তাকে আশ্রয় দিই। তার প্রাণ হরণে আমি যতটা ইতস্তত করি তেমনটা আর কিছুতে অরি না। সে (ইবাদাত বন্দ হয়ে যাওয়ার কারণে) মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি তাকে কন্ট দিতে অপছন্দ করি। [সহীহ বুখারি]

এই তিনটি পদক্ষেপ হলো আমাদের অস্তরে তাওয়াক্কুল প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উপায়।

রাসূলের সীরাতে তাওয়াক্কুলের সবচেয়ে বড় উদাহরণ তার নবিত্বের শুরুর দিকে যখন তিনি সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকলেন—'ওয়া সুবাহা'!

হজরত ইবনু আব্বাস 45 বলেন, যখন 'হে নবি, আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সাবধান করুন' আয়াতটি নাযিল হয়, নবি কারীম ﷺ তখন সাফা পাহাড়ে উঠলেন। হে বনু ফিহর, হে বনু 'আদি, বলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে ডাক দিলেন। রাসূলের আহ্বানে তারা দলে দলে সমবেত হলো। উপস্থিতিদের উদ্দেশ্য করে নবিজি বললেন, বলো তো, আমি যদি এখন তোমাদের বলি—এই পাহাড়ের অপর প্রান্তে একটি অশ্বারোহী বাহিনী তোমাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সকলে বলল, হাাঁ বিশ্বাস করব। কারণ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সামনে একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করছি। এই কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তোমার বিনাশ হোক। তুমি





কি এজন্যই আমাদের একত্র করেছ? তখন সূরা লাহাব নাযিল হলো। অর্থ, আবু াক এজন্যর আন্যতের ব্যায় সম, আর্ লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং তার বিনাশ ঘটুক। [বুখারি, মুসলিম]

খেয়াল করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন উপায়ে তার সমাজের কাছে ইসলামকে উপস্থাপন খেয়াল বন্ধুন, সান্নুলান ক্লে গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ব দাবি করতে পারতেন। তিনি করতে পারতেন। নিজের গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ব দাল্লর্মাত পারতেন। তিনি করতে সামতের নাগের আভিজাত কুরাইশ গোত্রের অন্তর্গত বনু হাশিম কবিলার অভিজাত গোত্রদের মধ্যে অভিজাত কুরাইশ গোত্রের অন্তর্গত বনু হাশিম কবিলার আভজাত নোলকায় নাই সদস্য ছিলেন। তাই তিনি নিজেকে প্রথমে একজন গোত্রপ্রধান হিসেবে ভূমিকা টানতে পারতেন এবং তারপর ইসলামের দাওয়াত দিতে পারতেন।

বিকল্পভাবে তিনি সমাজ সংস্কারকের পথ অবলম্বন করতে পারতেন। তৎকালীন মাক্বাকে সামাজিক অবক্ষয়ের আধিক্য, নিপীড়ন এবং পাপের স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মুহাম্মাদ ﷺ প্রথমে এসবের বিরুদ্ধে বলতে পারতেন, নিজের পক্ষে অনেক লোক জমায়েত করে তারপর তার সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের মতবাদ হিসেবে ইসলামের পরিচয় দিতে পারতেন।

সবশেষে তিনি ইসলামকে একটি বিকল্প ধর্ম, নতুন দৃষ্টিভজ্জি, ক্ল্যাসিক্যাল থিওরি, সত্যে পৌঁছানোর নতুন উপায়, রোমে যাওয়ার আরেকটি পথ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারতেন। জান্নাতে পৌঁছানোর একমাত্র পথ, মুক্তির একমাত্র উপায়, একমাত্র সত্য ধর্ম, যা ছাড়া আর কিছুই শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না—এমনভারে উপস্থাপন না করলেও পারতেন। তিনি ইসলামকে বর্তমান সময়ের আরও অনেক নতুন নতুন বৈপ্লবিক তত্ত্বের ন্যায় একটি বুম্ধিবৃত্তিক মতবাদ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারতেন, যা বহুত্বাদী যেকোনো সমাজ সহজেই গ্রহণ করে নেওয়ার বেশ নজির আছে। তিনি এ ধরনের কিছুই করেননি। তার কাছে যত রকম বিকল্প উপায় ছিল, তার কোনোর্টিই তিনি প্রয়োগ করেননি; বরং সবকিছু থেকে সুম্পন্ট অবস্থানে থেকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, মূর্তিপূজা ত্যাগ করো। কোনো শরীক না করে কেবল তাঁরই ইবাদাত করো; অথবা আল্লাহর শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

এভাবে আহ্বানের ফলে তিনি একদিকে মাক্বার সবাইকে তার শত্রুভাবাপন্ন করে তুললেন। কারণ, আদর্শের দিক থেকে তিনি তাদের ধর্মকে আঘাত করেছেন এবং তার অলীক রূপটা তুলে ধরেছেন। আল্লাহর কাছে জ্বাবদিহিতার ধারণা উপস্থাপন করেছেন—^{যার} কাছে কোনো কিছুই গোপনীয় নয়। যারা নিজেদের ক্ষমতা এবং সম্পদের জোরে তাদের ইচ্ছানুযায়ী যা খুশি করতে অভ্যস্ত ছিল, তাদের জন্য এটা খুব সুখকর ধারণা ছিল না। কোনো যুগের ধনী এবং ক্ষমতাশালীরাই একদিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ও কৃতকর্মের জ্বাব দেওয়ার ধারণাকে ভালোভাবে নেয়নি। এ বিষয়গুলো মার্কার সাধারণ লোকদের কাছে, বিশেষত কুরাইশদের কাছে এতটাই অনাকাজ্জ্মিত ছিল যে, তারা তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ করে বসে। আরবে কুরাইশরা ছিল যাজক শ্রেণির, কা'বা ঘরের জিম্মাদার। যেখানে তারা ৩৫০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল; এদের উপাসনা তাদের কাছে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল; বিশেষ করে হাজ্জের সময় তাদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল এগুলো। মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাণী কেবল তাদের বিশ্বাসকেই বিপন্ন করেনি, তাদের চোখে তারচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাদের অর্থনীতির জন্যও হুমকিস্বরূপ ছিল,



অসাধারণ বিশ্বাস কী?

তারা এটা সহ্য করতে পারেনি। ফলে সর্বশস্তি দিয়ে বিরোধিতা করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন ইসলাম প্রচারের জন্য ঠিক এ পম্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, বোঝার একমাত্র উপায় কুরআন অধ্যয়ন এবং দেখা যে, আল্লাহর অন্য নবিরা কী করেছিলেন। তারা সকলেই একই কাজ করেছিলেন। তারা কোনো প্রকার যুরপথে না গিয়ে বা প্রচ্ছন্নতার আশ্রয় না নিয়ে সুস্পটভাবে এবং সরাসরি তাদের বার্তা উপস্থাপন করেছিলেন।

তারা মানুষের কাছ থেকে কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক পুরস্কার চাননি। তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করেছিলেন কেবল আল্লাহকে ভয় করে এবং শুধু তাঁর কাছ থেকেই পুরস্কারের আশায়। কোনোরকম পার্থিব পুরস্কারের আশা ব্যতিরেকে ইসলামের প্রচার ছিল সকল নবিদের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। যুগ যুগ ধরে নবিরা মানবজাতির পথপ্রদর্শনে যা করে এসেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ কেবল তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত নবির উত্তরাধিকারীগণ—জ্ঞানী ব্যক্তিরা, যারা আল্লাহর বাণী মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন—একই পম্বতি অনুসরণ করেছেন। স্পন্ট এবং সরাসরি বলেছেন। মানুষের কাছ থেকে কোনোরকম পুরস্কারের আশা ছাড়াই এ কাজ করে গেছেন। যে কেউ এই পম্বতির পরিবর্তন আনবে, সে নিজেকে নবিদের মহিমান্বিত ঐতিহ্য এবং এর সঙ্গো যুক্ত আল্লাহর সাহায্য থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।

আমি যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শক্তিশালী, গভীর, ধৈর্যসমৃদ্ধ এবং অবিচল ঈমানের কথা চিন্তা করি, তাঁর ইসলাম প্রচারে শুরুর এ ঘটনা আমার ভাবনায় চলে আসে। কারণ, এটি সফলতার জন্য আল্লাহর ওপর তাঁর পূর্ণ নির্ভরতার চিত্র অঙ্জ্বন করে; যেখানে তিনি অন্য কিছু, এমনকি নিজস্ব ফায়সালাকেও হস্তক্ষেপ করার সুযোগ না দিয়ে তাঁর প্রতি যে আদেশ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা তাঁকে মানুষদের সতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তা-ই করেছেন। নিজস্ব বিবেচনাবোধ ব্যবহার করে ভালোমন্দ নির্ধারণ করেননি। যার ওপর ওয়াহি নাযিল হয়, তার জন্য বিনাপ্রশ্নে অনুসরণ করা ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই। একই যুক্তি বর্তমানে যে মুসলিমরা সেই বাণীকে বহন করে চলেছেন, আসমানি বাণী এবং এর শাশ্বত সত্যতার ওপর বিশ্বাস করেন, তাদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। আমরা বাণীর মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধন না করে আমাদের যা করতে বলা হয়েছে, তা বিনা প্রশ্বে পালন করি। এটি আমাদের নিজেদের সততাকেই প্রমাণ করবে।

এ বৈশিষ্ট্য ইয়াহুদি ও নাসারাদের থেকে মুসলমানদের পার্থক্য করে। কারণ, তারা তাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবে এমন পরিবর্তন করেছিলেন যে, সেটার ঐশ্বরিক গুণাবলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহর কথা মানুষের কথায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। গত দেড় হাজার বছরে মুসলমানদের কখনোই এই অপবাদের মুখোমুখি হতে হয়নি।

মাক্কায় তের বছর নববি সময়কাল পুরোটাই ছিল ক্রমাগত নির্যাতন, অপবাদ আর আশাহত ঘটনায় বিপর্যস্ত। কেউ যদি বাহ্যিক সফলতার দৃশ্যমান চিহ্ন খোঁজে, তাহলে খুব বেশি কিছু পাবে না। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে এই লম্বা সময়জুড়ে তাঁর মিশন চালিয়ে গেলেন! তার প্রত্যয় এবং উদ্যম অফুরন্ত। রাতে দাঁড়াতেন রবের সঙ্গো সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য। দিনে মানুযের কাছে দাওয়াত পোঁছাতেন। তা সে গ্রহণ করুক বা না করুক।

লিডারশিপ লেজনস

তারা যেরকম প্রতিক্রিয়াই দেখাক, অথবা যত বিরূপ আচরণই করুক, তিনি কখনোই ধৈর্য হারাতেন না, রাগতেন না। তাদের বাজে আচরণের প্রতিক্রিয়া দেখাতেন না। ধৈর্য ধরে কাজ চালিয়ে গেছেন। কখনোই তাঁর মিশন থেকে সরে আসেননি কিংবা প্রচারে সামান্য দুর্বলতার আশ্রয়ও নেননি। তাঁর এবং তাঁর মিশনের জন্য কোনো সাণ্ডাহিক ছুটি, বার্ষিক বিরতি ছিল না। তিনি অবিরাম উদ্যমে দিনরাত কাজ করে গেছেন। সম্পূর্ণ এবং সর্বাত্মক ঈমান ছাড়া আর কী এমন প্রচেন্টার কারণ হতে পারে? আল্লাহের রাস্ল ছাড়া আর কার এই উচ্চতার শ্রেষ্ঠতু থাকতে পারে? আমাদের জীবনে শেখার মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্যতম হলো দাওয়াহর ময়দানে সাফল্য ধরা দিতে দেরির হতাশা এবং আপাতব্যর্থতার মুখে টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করা। যে স্বচেয়ে দ্রুতগতির, সে নয়, দৌড়ে সে-ই জিতে, যে স্বচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল। আমরা সহসাই হাল ছেড়ে দিই, দ্রুত নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ি এবং দৃশ্যমান ফলাফলের প্রতি অতিরিস্ত ফোকাস দিই। আমরা ভুলে যাই, ইসলাম হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং এই প্রবেশের বেশিরভাগ অংশই অদৃশ্য। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ঞ্র্রুত্ব প্রজাশ্যে আসতে কিছু সময় লেগে যায়।

আল্লাহ রাবুবল আলামীন কখন 'উমারের অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দেন, তার একটি ঘটনা রয়েছে। ঘটনাটি তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি মদ পান করতেন এবং তার মদ পানের সজ্জীসমেত আসর ছিল। এক গভীর রাতে তার মদ পানের ইচ্ছা হলো; কিন্তু তিনি এজন্য কোনো সজ্জী পেলেন না। যেহেতু তার কিছু করার ছিল না, তিনি ঠিক করলেন কা'বা তাওয়াফ করবেন। গভীর রাত। তিনি যখন কা'বায় উপস্থিত হলেন, দেখলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন। 'উমার কা'বার পেছন দিকে চলে গেলেন এবং এর কিসওয়ার (পর্দা) আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। তারপর গোপনে একদম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে সূরা আল-হাক্বাহ তিলাওয়াত করছিলেন। 'উমার গোপনে ওত পেতে আল্লাহর রাসূলের তিলাওয়াত শুনছিলেন।

'উমার মনে মনে ভাবলেন, এটা নিশ্চয় কোনো কবির বয়ান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনই তিলাওয়াত করলেন:

। এটা কোনো কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর! [আল-হাক্বাহ ৬৯:৪১]

'উমার খুব অবাক হলেন, ভাবলনে, এটা অবশ্যই কোনো কাহিনের (ভবিয্যতবস্তা) বয়ান।

রাসূলুল্লাহ 🏂 তখন তিলাওয়াত করলেন:

। এবং এটা কোনো অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। [আল-। হাক্কাহ ৬৯:৪২]

'উমার 🚓 বিশ্বিত হলেন এবং স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এই ঘটনারও কয়েক বছর পর তিনি সত্যি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের বিখ্যাত ঘটনাটি আমরা সবাই-ই জানি। যারা জানেন না, তাদের জন্য আমি আরেকবার বর্ণনা করতে চাই।



03



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft অসাধারণ বিশ্বাস কী?

কারণ, হৃদয়কে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য কুরআনের আয়াতের যে ক্ষমতা, তা এখানেও প্রকাশ পায়। আমি বহুবার বলেছি, কুরআন কথ্যভাষা হিসেবে নাযিল হয়েছে এবং এর সর্বোচ্চ শস্তি প্রকাশ পায় যখন এটি শোনা হয়। এর ছন্দ, ঢং, নির্দেশনার মহিমা এবং যোগাযোগের স্পউতার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা প্রকৃত সত্যসন্ধানীর হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আমি এজন্যও ঘটনাটি উল্লেখ করতে চাই, কারণ এটি রাসূল ﷺ-এর সীরাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, যার মাধ্যমে তাঁর ঈমান কীভাবে চরম শত্রুকেও প্রভাবান্বিত করেছিল, সেই পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিবৃত করার উপায় নিয়ে আলোচনা চলছিল কুরাইশ এবং তার মিত্রদের মাঝে। তারা জানতে চাইল, কে মুহাম্মাদকে হত্যা করতে আগ্রহী? 'উমার এগিয়ে এলেন, আমি করব। তিনি তার তলোয়ার নিয়ে দারুল আরকামের দিকে রওয়ানা হলেন। পথে সা'দ বিন আবি ওয়াক্বাসের সঙ্গো দেখা। সা'দ 🚓 জানতে চাইলেন, কোথায় যাচ্ছ 'উমার? 'উমার বললেন, যে লোকটা আমাদের বিভক্ত করেছে এবং আমাদের দেবতাদের অভিশাপ দিয়েছে তাকে হত্যা করতে যাচ্ছি।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস 👑 তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি মনে কর বনু 'আবদ মানাফ গোত্রের লোককে হত্যা করলে তারা তোমাকে এই পৃথিবীর বুকে হাঁটতে দেবে? এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল এবং 'উমার তাকে বললেন, আমার ধারণা তুমিও মুসলিম হয়ে গিয়েছ। যদি তা-ই হয়, তা হলে মুহাম্মাদকে হত্যার আগে আমি তোমাকে হত্যা করব।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্বাস বললেন, মুহাম্মাদকে হত্যা করার আগে নিজের ঘর সামলাও না কেন?

কী বলতে চাও?, 'উমার জানতে চাইলেন।

সাহাবি বললেন, তোমার বোন এবং তার স্বামী মুসলিম হয়ে গেছে।

'উমার 45 - এর বোন ফাতিমা বিনতু আল খাত্তাব এবং তার স্বামী সাঈদ বিন যাইদ 45 ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সাঈদ বিন যাইদ ছিলেন 'উমারের চাচাতো ভাই এবং সেই জানাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান দশজনের একজন। তাদেরকে খাব্বাব বিন আল-আরাত 45 কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। 'উমার যখন রেগে আগুন অবস্থায় তাদের বাসায় উপস্থিত হলেন, তিনি শুনতে পেলেন তারা কুরআন তিলাওয়াত করছে।

তিনি দরজায় করাঘাত করলেন। যখন তারা দেখলেন, দরজায় 'উমার দাঁড়িয়ে আছে, খাব্বাব ఉ লুকিয়ে পড়লেন। কীসের শব্দ পেলাম?, জানতে চাইলেন 'উমার। ফাতেমা বললেন-কিছু না, আমরা কথা বলছিলাম। 'উমার ক্রুম্থ হয়ে বললেন, মিথ্যা বলো না। তোমরা কি মুসলিম হয়ে গিয়েছ? সাঈদ ఉ বললেন, যদি ইসলাম তোমার ধর্ম থেকে ভালো হয়, তা হলে? 'উমার তাকে আক্রমণ করলেন, মাটিতে ফেলে দিয়ে তার ওপর বসে পড়লেন। ফাতিমা স্বামীকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন; কিন্তু 'উমার তার মুখে আঘাত করলেন এবং তার মুখ রক্তান্ত হয়ে গেল। যদিও 'উমার ক্রুম্ধ; কিন্তু ফাতিমা ভয় পেলেন না। দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর শত্রু, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি



লিডারশিপ লেজনজ

বলে আমাকে মেরেছ? তাহলে শুনে নাও, আল্লাহ রাব্বল আলামীন ছাড়া আর কেউ বলে আনাবে বেবাগ্য নয় এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল। এখন তুমি যা খুশি করভে পার। উপাসনার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল। এখন তুমি যা খুশি করভে পার। তার দৃঢ়তায় 'উমার হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং তার রক্তান্ত মুখ দেখে তিনি নিজ কৃতকর্মের জন্য হঠাৎ লজ্জায় পড়ে গেলেন। সাঈদকে ছেড়ে দিয়ে বসলেন, বললেন, হে বললেন ফলকগুলো দাও। ফাতিমা দিতে অস্বীকার করলে 'উমার 🐗 বললেন, তোমার কথা আমাকে প্রভাবিত করেছে। কথা দিচ্ছি, তোমার কাগজগুলো অক্ষত ফেরত দেবো। ফাতেমা বললেন, তুমি মুশরিক এবং অপবিত্র। আগে গোসল করে এসো। 'উমার 🚓 গোসল করে এলে তিনি কাগজগুলো দিলেন। 'উমার 🚓 কাগজে লেখা আয়াত তিলাওয়াত শুরু করলেন।

১. তো-হা। ২. আপনাকে ক্রেশ দেওয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। ৩. কেবল তাদেরই উপদেশের জন্য, যারা ভয় করে। ৪. এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি যমিন ও সমুচ্চ আসমান সৃষ্টি করেছেন।৫. তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। ৬. আসমান ও যমিনে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিন্তু ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। ৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও সে উপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। ৮. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমন্ডিত নাম তাঁরই। [সূরা তো-হা 20:2-6]

'উমার 🚓 আয়াতগুলো পড়ে বললেন, কুরাইশরা কি এরই বিরোধিতা করে? সত্যিই এসব যিনি বলেছেন, তিনিই উপাসনার যোগ্য। মুহাম্মাদ 🏂 কোথায় আছে, আমাকে বলো। 'উমার 🚓 যখন আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে আপ্লুত হয়ে রাসূলুল্লাহ 🎉 এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন, খাব্বাব বিন আল আরাত 🐇 আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, হে 'উমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আ কবুল করেছেন। তিনি দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ, আমর বিন হিশাম অ^{থবা} 'উমার ইবনুল খাত্তাব, এ দুজনের যেকোনো একজনকে—যাকে তোমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ—তার মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত (শক্তিশালী) করো।

তারা 'উমারকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থান বললেন এবং তিনি সরাসরি সেখানে হাজির হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। সাহাবিরা তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং সবাই বসে রইলেন। হামজা 🚓 তাদের দেখে বললেন, কী ব্যাপার?

তারা বললেন, দরজায় 'উমার।

তো কী হয়েছে? যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে আসে, তাহলে ভালো; কিন্তু যদি খারাপ উদ্দেশ্যে আসে, তাহলে আমি তার তলোয়ার দিয়েই তাকে হত্যা করব। দরজা খুলে দাও। 'উমার ঘরে ঢুকলে হামজা এবং অন্যরা তাকে ধরে ফেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন কাছে নিয়ে গেলেন।

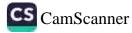
রাস্ল ﷺ বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। তারা ছেড়ে দিলেন। রাস্ল ﷺ 'উমারের ঘা^{ড়ে} ধরে বললেন, হে ইরনল খালেন ধরে বললেন, হে ইবনুল খান্তাব, কেন এসেছ এখানে? আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস না

07



অসাধারণ বিশ্বাস কী?

করা পর্যন্ত কি তুমি ইসলামের সঙ্গো লড়াই করতে থাকবে? 'উমার বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিতে এসেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয় এবং আপনি তাঁর রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর দিলেন, তাঁর সঙ্গো উপস্থিত সকলের তাকবীরে জায়গাটি মুখরিত হয়ে গেল। তারা এত উচ্চেঃস্বরে তাকবীর দিয়েছিলেন যে, তার পরপরই সবার নজর এড়াতে তারা দ্রুত আলাদা হয়ে গেলেন।



এক্সট্রা অর্ডিনারি লক্ষ্য

সীরাতে রাসূল থেকে এক্সট্রা অর্ডিনারি লক্ষ্য সম্পর্কিত সবচেয়ে সুন্দর যে ঘটনাটি আমি মনে করতে পারি, সেটি ইসলামের প্রথম যুগে মাক্বায় ঘটেছিল। যখন তাঁর পক্ষে তেমন কোনো সহযোগিতা ছিল না। বলা যায় সেসময় তিনি একাই ইসলামের বাণী প্রচার করছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হাজ্জ সম্পন্ন করার পর আমি মিনার একটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সমতল অংশ হাজ্জ করতে আসা মুসাফিরদের তাঁবুতে ঢেকে গিয়েছিল। সেটা ছিল গ্রীমের মধ্য দুপুর, তীব্র গরম এবং শুক্ষ। আমি দেখলাম, এই গরমের মধ্যে একজন ব্যক্তি তাঁবু থেকে তাঁবুতে গিয়ে মানুষকে কেবল আল্লাহর উপাসনা করতে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং মূর্তিপূজার ব্যাপারে সতর্ক করছেন। কেউ তার কথা শুনে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। কেউ ধমক দিচ্ছে। বাকিরা তো তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। কাউকে তার বাণী গ্রহণ করতে দেখিনি। সেই তীব্র গরমের মধ্যে আমি লোকটাকে দেখলাম নিজ তাঁবুর সামনে একটি পাথরের ওপর বিশ্রামের জন্য বসলেন। তাঁবু থেকে তার মেয়ে পানি হাতে বের হয়ে এসে বাবার মুখ ধুইয়ে দিলো এবং পানি খেতে দিলো। বাবার দুরবস্থা দেখে সে খুব কন্ট পোল, বলল—ওরা আপনার এ কী অবস্থা করেছে বাবা!

মানুষটি উত্তর দিলেন, দুঃখ পেয়ো না প্রিয় কন্যা। এমন একদিন আসবে, যখন এই বাণী পৃথিবীর বুকে সকল কাঁচাপাকা ঘরে পৌঁছে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিশন যে আসমানি, এর অন্য কোনো প্রমাণ না থাকলেও এই একটি ঘটনাই তা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। সম্পূর্ণ একটি মিশন চালিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কার এই রকম সাহস, সহিয়ুতা এবং ধৈর্য থাকবে, যেখানে এর সফলতার দৃশ্যমান কোনো চিহ্ন নেই? আর কে একের পর এক ব্যর্থতা আর হতাশার পরও তার মিশনের সাফল্য সম্পর্কে এতটাই আস্থাশীল যে, তা এগিয়ে নেওয়ার শস্তি পায়? একজন নবি ছাড়া আর কে একের পর এক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বেদনা গ্রহণ করতে পারেন! যারা তাঁর কথা শুনতে মোটেও আগ্রহী নয়, তাদের কাছে তাঁর বার্তা নিয়ে বারবার যেতে বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হন না।

রাসূল ﷺ-এর বন্তুব্যে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, তার প্রকৃতি বিশ্বয়কর মনে হতে পারে। তিনি বলেছিলেন, দুঃখ পেয়ো না মা আমার! এমন একদিন আসবে, যখন এই বার্তা পৃথিবীর বুকে সকল কাঁচাপাকা ঘরে পোঁছে যাবে। এখানে যে মানুর্যটি বলছেন যে তাঁর বার্তা একদিন পৃথিবীর সকল ঘরে পৌঁছে যাবে, তিনি তখন পর্যন্ত নিজের

~ I

ঘরের বাইরে কারও ঘরেই তাঁর বার্তা পৌঁছাতে পারেননি। এমন একজন মানুষ পৃথিবীর মানুষের মুক্তির কথা বলছেন, যিনি কিনা নিজের মুক্তির নিশ্চয়তাও দিতে পারেন না। যেই অপরিচিত মানুষগুলো বারবার তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, তাদের চিরন্তন কল্যাণের জন্যই কিনা ভাবছে মানুষটি!

অন্যদিকে, এক্সট্রা অর্ডিনারি লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্যই হলো এক্সট্রা অর্ডিনারি প্রচেষ্টা চালানের জন্য উদ্বুম্থ করা। ক্ষুদ্র আশায় মানুষ জেগে ওঠে না, বড় আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে জাগিয়ে তোলে। মাউন্ট এভারেস্টের বেজ ক্যাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো অভিযাত্রীর মোটিভেশনাল লেকচারের দরকার হয় না। পাহাড়ই তাকে অনুপ্রাণিত করে। পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে তার যে আনন্দ হবে, তার ভাবনাই তাকে বেজ ক্যাম্পে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রতি মুহুর্তে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করতে থাকে। পাহাড়ে চূড়ার প্রতিকূলতাই তাদের প্রেরণা। নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আপনার বাসা থেকে এগারো কিলোমিটার হেঁটে যেতে আগ্রহ পান কিনা? পাহাড়ে চড়াও নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বুকেই হাঁটা; কিন্তু দুর্গমতা এর রোমাঞ্চ বাড়িয়ে দেয়। একটি লক্ষ্য অর্জনের সঞ্চো যুক্ত তৃস্তি ও রোমাঞ্চের পরিমাণ এর প্রতিকূলতার সমানুপাতিক।

বৈপ্লবিক পরিবর্তন কোনো সাধারণ পরিবর্তন নয়; বরং অনেক বেশি ধাতুগত এবং সহজাত বিশ্বাসের পরিবর্তন সম্পর্কে কথা বলার মতো কঠিন আর কী হতে পারে! এর চ্যালেঞ্জটা বোঝা খুবই জরুরি। কারণ, সব কাজই মূলত বিশ্বাসের ফলাফল। মানুষ তার নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে, সচেতনভাবে হোক বা অবচেতনে। যেমন: মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস। ধর্মবিশ্বাসের কারণেই মানুষ অনেক রীতিনীতি পালন করে; আবার তারা তাদের নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো কাজকে লাভজনক মনে করে তাতে বিনিয়োগ করতে পারে। আবার মানুষ ঘুম থেকে উঠে কাজে যোগ দেয়, কারণ, অবচেতনভাবে সে বিশ্বাস করে যে, ওইদিন এবং পরের দিনগুলোতে সে বেঁচে থাকবে এবং পৃথিবীও ধ্বংস হবে না। সুতরাং বিশ্বাস আমাদের সকল চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি গড়ে দেয়। এই বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে সেটাকে সম্পূর্ণ ভুল সাব্যস্ত করা এবং এর জন্য চিরন্তন শাস্তি পেতে হবে বলাটা সহজ কাজ নয়। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ তাঁর বার্তার সত্যতায় এত গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, কোনো কিছুই তাঁকে অন্যের কাছে বার্তা নিয়ে যেতে বিরত করতে পারেনি। বর্ণিত আছে, তিনি একসময় তাঁর চরম শত্রুদের অন্যতম আবু জাহলের বাড়িতে শতবারেরও বেশি গিয়েছেন এই আশায় যে, সে ইসলামের দাওয়াত কবুল করবে। নবি ছাড়া আর কে এমন একজনকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে, যে কিনা তাঁর ক্ষতি করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে?

এক্সট্রা অর্ডিনারি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আরেকটি ব্যাপার হলো এখানে কর্মই প্রশিক্ষণ। আরব প্রবাদ বলে, যদি কোনো কিছু তোমার কোমর ভাঙতে না পারে, তবে তা তোমাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। এক্সট্রা অর্ডিনারি লক্ষ্যের জন্য কাজ করাও তেমনই, কেবল শক্তি বৃধ্বি করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং প্রথম যুগের মুসলমানদের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটেছে। সকল প্রকার বিরোধিতা, নির্যাতন এবং শাস্তি তাদের ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করেছে এবং আল্লাহর সঞ্চো তাদের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালীই করেছে। তাদেরকে আরও স্থিতিশীল করে তুলেছে।





এক্সট্রা অর্ডিনারি লক্ষ্য

এক্সট্রা অর্ডিনারি লক্ষ্য জোর প্রচেন্টা চালানোকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। If it is worth doing, then it is worth the effort. সমগ্র মানবজাতিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা এবং জান্নাতে নেওয়ার চেন্টার চেয়ে মূল্যবান প্রচেন্টা ও আত্মত্যাগ আর কী হতে পারে? আমরা যেটাকে ত্যাগ বলছি, রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা সেটাকে আল্লাহর সন্থুন্টি অর্জনের জন্য বিনিয়োগ হিসেবে দেখেছিলেন। এ কারণে তাদের পক্ষে কোনো দ্বিধা ছাড়াই এটা করা সন্তব হয়েছিল।



এক্সট্রা অর্ডিনারি সংকল্প

মানুষ যখন কোনো বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে, একমাত্র তখনই সে তা থেকে ফল লাভ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য এটা কখনোই সামান্য সন্দেহের বিষয়ও ছিল না। তাঁর বড় সফলতা হলো, তিনি এমন একটা প্রজন্ম তিনি তৈরি করেছেন, যারা তাঁর সংকল্পের অংশীদার হয়েছেন এবং এর জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার সর্বোচ্চ প্রমাণ রেখেছেন। ইসলামের বার্তার প্রতি তাঁর সংকল্প নিয়ে কারও মনে যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না থাকে, সেজন্য তিনি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি নিজে পালন করেছেন এবং সকলের কাছে প্রচার করেছেন। কেবল রাস্ল ﷺ নন, সাহাবিরাও—যারা তাঁর কাছ থেকে ভালোভাবে শিখে নিয়েছেন, তাদের জীবনে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। তাদের এই সংকল্পের প্রমাণ সীরাতের অনেক ঘটনায় পাওয়া যায়।

বদরযুদ্ধের সময় সাহাবিরা সামান্য সরঞ্জামাদি নিয়ে বদর কৃপের দিকে চলছিলেন। তারা বড় কোনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত ছিলেন না; বরং শাম থেকে ফেরা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা দখলে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল। সাহাবিদের দলে মাত্র দুটি ঘোড়া এবং সত্তরটি উট ছিল। এক উটে তিনজন সওয়ারি পালাব্রুমে আরোহণ করতেন। রাসূল * -এর সহযোগী ছিলেন আলি ইবনু আবি তালিব এবং আবু লুবাবা টেটি দিতে চাইলে তিনি বললেন, তোমরা আমার চেয়ে শক্তিশালী নও এবং আমিও তোমাদের মতো বেশি পুরস্কার আশা করি। তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সব সময় সাথিদের কাছ থেকে যেরকম সংকল্প আশা করেন, তার চেয়ে অধিক দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করেছেন।

খন্দক যুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিকল্পনার জন্য রাসূল ﷺ একটি শূরা গঠন করেন। পারস্য থেকে আগত সালমান ফারসি 🦛 বললেন, আমাদের ওখানে কোনো সৈন্যবাহিনী থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করলে আমরা পরিখা খনন করি। আমরা কেন এখানে একটি পরিখা খনন করছি না? আল্লাহর রাসূল ﷺ একমত হলেন এবং মাদীনার উত্তর দিক অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত হওয়ায় সেখানে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। পূর্ব এবং পশ্চিমে আল-হাররা (একটি আগ্নেয়গিরি উপত্যকা) দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং দক্ষিণে ছিল দুর্ভেদ্য খেজুরবাগান। প্রতি দশজনকে চল্লিশ ফুট পরিখা খনন করতে দেওয়া হলো। মুসলমানগণ ছিলেন দরিদ্র, ক্ষুধার্ত এবং দুর্বল। আনাস ইবনু মালিক বলেন, এক শীতের

...



রাতে রাসূল 💥 তাদের নিকট গেলেন এবং তাদের দুরবস্থা দেখে দু'আ করলেন,

হে আল্লাহ, নিশ্চয় এসব আখিরাতের জন্য। হে আল্লাহ, মুহাজির এবং আনসারদের ক্ষমা করুন।

সাহাবিদের জানা ছিল যে, যখন তারা তীব্র ঠান্ডায় খোলা আকাশের নিচে ঘুমাচ্ছিলেন, তাদের নেতা তখন তাঁবুর উন্নতায় ঘুমাচ্ছিলেন না; বরং তিনি তাদের মাঝে হেঁটে হেঁটে সবার খোঁজ নিচ্ছিলেন এবং তাদের জন্য দু'আ করছিলেন। মানুষ আরেকজন মানুযের প্রতি বিশ্বস্ত হয়, নিছক কোনো পদবি বা র্যাংকের প্রতি নয়।

বারা আ الله বলেন, পরিখা খনন চলাকালীন এক দিন আমি রাসূল ﷺ-কে মাটি বহন করতে দেখলাম। তাঁর শরীরে এত মাটি লেগেছিল যে, গায়ের চামড়া দেখা যাচ্ছিল না। এটা তাঁর সংকল্পের একটা উদাহরণ। এমন কোনো কাজ ছিল না, যেটা তিনি নিজের জন্য অমর্যাদাকর গণ্য করেছেন। এমন কিছু ছিল না, যা তিনি নিজে করেননি; কিন্থু অন্যকে করার আদেশ করেছেন। নেতৃত্ব সব সময় সামনে থেকেই দিতে হয়। মানুষ নেতাকে অনুসরণ করে, কারণ নেতা তাদের সামনে পথ চলে। মাঝে মাঝে আমরা এটা ভুলে যাই।

এ সময় রাসূল ﷺ নিজে এত বেশি ক্ষুধার্ত ছিলেন যে, তিনি পেটের সঞ্জো দুটো পাথর বেঁধে রাখতেন। জাবির ইবনু আবদিল্লাহ অন্যদের সঞ্জো মিলে পরিখা খনন করছিলেন, তিনি রাসূল ﷺ কে এই অবস্থায় দেখেন; সবার পেটে যখন একটি পাথর বাঁধা, রাসূলের পেটে তখন দুটি পাথর বাঁধা। তিনি স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবর্ণনীয় অবস্থায় দেখে এসেছি। তোমার কাছে কোনো খাবার আছে? স্ত্রী জ্বাব দিলেন, আমার কাছে আছে বলতে কিছু জব এবং একটি ছোট খাসি। জাবির বিন আবদুল্লাহ খাসিটিকে জ্বাই করলেন এবং তার স্ত্রীকে কিছু রুটির খামিরা তৈরি করতে বললেন। এদিকে গোশত রান্না হতে লাগল এবং তার স্ত্রী রুটি বানাতে লাগলেন, জাবির বিন আবদুল্লাহ রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি, আপনি অনুগ্রহ করে আপনার একজন বা দুইজন সাথিসহ আমার সঙ্গো আসুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে চাইলেন তার কাছে কত্যটুকু খাবার আছে। জাবির 🕸 রাসূলকে গোশত আর রুটির পরিমাণ বললেন। রাসূল বললেন—তাই যথেফ, তুমি তোমার স্ত্রীকে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত যেন গোশতের ঢাকনা না উঠায়।

তারপর রাস্লুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকলেন—হে মুহাজির ও আনসার সাহাবিরা, জাবির তোমাদেরকে তার বাড়িতে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। জাবির খুব বিশ্বিত হলেন, কারণ তিনি আশা করেছিলেন রাস্ল ﷺ এক বা দুইজন সাথি নিয়ে আসবেন; কিন্তু তিনি তো এখন পুরো ক্যাম্পকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন! খানিকটা বিব্রত হয়ে দৌড়ে বাসায় গেলেন এবং যা ঘটেছে স্ত্রীকে খুলে বললেন। স্ত্রী জানতে চাইলেন, তিনি কি জানতে চেয়েছেন আমাদের কাছে কী পরিমাণ খাবার রয়েছে?

জাবির বললেন, হাাঁ।

আপনি কি ওনাকে বলেছেন—জিজ্ঞেস করলেন তার স্ত্রী।



এক্সট্রা অর্ডিনারি সংকল্প

হ্যাঁ, তিনি উত্তর দিলেন। স্ত্রী বললেন, তাহলে দুশ্চিস্তা করবেন না, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ভালো জানেন। জাবির বলেন, এই কথাগুলো আমাকে আশ্বস্ত করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জাবিরের বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং খাদ্য বন্টনের দায়িত গ্রহণ করলেন। তিনি রুটি ছিড়ে এবং গোশত ও ঝোল পরিবেশন করলেন। সাহাবিদের দশজন দশজন করে আসতে বললেন। রাসূল ﷺ—এর পরিবেশিত খাবার তারা পেটপুরে খেয়ে চলে গেলে দশজনের আরেকটি দল আসত এবং সে দলের সদস্যরাও পেটভরে খেয়ে পরবর্তীদের জন্য জায়গা ছেড়ে উঠে পড়তেন। এভাবে সর্বমোট ৮০০ জন সাহাবি খেলেন। রাসূল ﷺ যখন পাত্রের কাছে ফিরে গেলেন, তখনও সেটা পূর্ণ ছিল এবং রুটি তৈরি হচ্ছিল। তিনি জাবির ়ঞ্জ-এর স্ত্রীকে প্রতিবেশীদের খাওয়াতে বললেন। আলাহ ও রাসূলের প্রতি সাহাবিদের আস্থা এত বেশি ছিল যে, এটা তাদের কাছে কোনো বিশ্বয়কর ঘটনা ছিল না। একজন নেতা; যিনি আপনার সকল কন্টের অংশীদার, তার থেকে আপনি আর কী আশা করেন?

অলৌকিক ঘটনা: ভবিষ্যদ্বাণী

একটা পাথর পরিখা খননকারীদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাঙা যাচ্ছিল না। সাহাবিরা রাসূল ﷺ-এর নিকট এলেন। তিনি তাদের সঙ্গো গেলেন এবং কুড়াল তুলে পাথরের গায়ে আঘাত করলেন। আগুনের ফুলকি ছুটল, তিনি বললেন—আল্লাহু আকবার। তারপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন, আগুনের ফুলকি ছুটল এবং তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার। তারপর তৃতীয়বার আঘাত করলেন এবং পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধূলায় পরিণত হলো। সালমান ফারসি জিজ্ঞেস করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, আগুনের ফুলকি কী ছিল এবং আপনি আল্লাহু আকবার বললেন কেন? তিনি জ্ববাব দিলেন, প্রথমবার আমি যখন আঘাত করলাম, আমাকে রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হলো এবং আমি এখান থেকেই শামের লাল প্রাসাদ দেখতে পোলাম। দ্বিতীয়বার আমাকে পারস্য জয়ের সুসংবাদ দেওয়া হলো এবং আমি সাদা প্রাসাদ 'কিসরা' দেখতে পোলাম। তৃতীয়বার আমাকে ইয়েমেন জয়ের সুসংবাদ দেওয়া হলো এবং আমি সান'আর দরজা দেখতে পোলাম। তাই প্রতিবারে আমি 'আল্লাহু আকবার' বললাম।

সাহাবিদের সংকল্পের কথা বলতে গেলে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে হয়। রাস্লুল্লাহ ﷺ কোনো এক অভিযানে আম্মার বিন ইয়াসির এবং আব্বাদ বিন বিশ্রকে পাহারার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। তারা দুজনে ঠিক করে নিলেন, প্রথমে একজন ঘুমোবেন অন্যজন জেগে থাকবেন, পরে একজন ঘুমাবেন আরেকজন জাগবেন। প্রথমে আব্বাদ বিন বিশ্রের ভাগে জেগে থাকার দায়িত্ব পড়ল। তিনি ভাবলেন, পাহারার সময়ে নামাজ আদায় করবেন। শত্রুদলের একজন গোপনে আব্বাদের পেছনে উপস্থিত হয়ে তির ছুড়ল। তিরটি তার শরীরের পাশ দিয়ে বিন্ধ হলো। আব্বাদ দাঁড়িয়ে থেকে নামাজ অব্যাহত রাখলেন। শত্রুসেন্যটি আরও একটি তির ছুড়ল, এই তিরটিও তার শরীরে লাগল। তা সত্ত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে থাকলেন। শত্রুর ছোড়া তৃতীয় তিরটি



লিডারশিপ লেসন্স

আব্বাদকে আঘাত করলে তিনি আম্মারকে জাগিয়ে তুললেন। আব্বাদের সজ্ঞীকে দেখে শত্রুসৈন্যটি পালিয়ে গেল। আম্মার বিন ইয়াসির দেখলেন, রক্তক্ষরণে আব্বাদ মারা শাচ্ছেন। তিনি তাকে বললেন—সুবহানাল্লাহ, তুমি আমাকে জাগিয়ে দিলে না কেন? আব্বাদ বললেন, যদি সে অনবরত তির ছুড়তে না থাকত; যদি আমার আশঙ্কা না অব্বাদ বললেন, যদি সে অনবরত তির ছুড়তে না থাকত; যদি আমার আশঙ্কা না হতো যে, এভাবে মারা গেলে তো আল্লাহর রাস্লের অর্পিত দায়িত্ব অবহেলা করা হবে তাহলে আমি তিলাওয়াত শেষ না করে তোমাকে কিছুতেই জাগাতাম না।

সাহাবিরা ছিলেন ইসলামের জীবন্ত উদাহরণ। এই ঘটনা সাহাবিদের ঈমানের স্তর সম্পর্কে ধারণা দেয়। আব্বাদ বিন বিশ্র الله শরীরে তিনটি তির বিদ্ধ হওয়ার পরও নামাজে খুশু বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা ইসলামের প্রতি তাদের দায়িত্বশীলতারও উদাহরণ। আব্বাদ একটি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন, যার মানে হলো 'দরজার সুরক্ষা', অর্থাৎ আমি যে দরজার সুরক্ষা প্রদান করছি, সেখান দিয়ে শত্রুর প্রবেশ বাধাগ্রুত করা। এটা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। শত্রু শয়তান অথবা এমন কেউ, যে ইসলাম বা মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায়। সকল মুসলমানের উচিত যেকোনো মূল্যে ইসলাম অথবা মুসলমানদের ক্ষতি প্রতিরোধ করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে যেকোনো উপায়ে সহযোগিতা করা। আমাদেরকে 'কী হয়েছিল' জিজ্ঞাসা করা হবে না; বরং জানতে চাওয়া হবে, 'তুমি কী করেছিলে?'



এক্সট্রা অর্ডিনারি দল

আল্লাহ রাবুবল আলামীন তাঁর নবির তত্ত্বাবধানে এমন এক প্রজন্ম তৈরি করেছেন, যারা নিজেরাই একটি উজ্জ্বল আদর্শ। আগেই বলেছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত নবিদের মধ্যে সর্বশেষ হবেন, এটা আল্লাহর ইচ্ছা এবং এ কারণে উত্তরসূরি তৈরি করা আবশ্যক ছিল, যারা এই বাণীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই উজ্জ্বল আদর্শের উত্তরসূরি হলেন রাসূল ﷺ-এর সাহাবিরা, যাদেরকে বলা হয় দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। এরপর উত্তম হলো এর পরবর্তী সময়ে আগমনকারী লোকেরা। তারপর উত্তম তাদের পরবর্তীতে আসবে, তারা। অতঃপর এমন এক কওমের আগমন ঘটবে, যাদের কারও সাক্ষ্য কসমের আগেই হয়ে যাবে, আবার কসম সাক্ষ্যের আগেই হয়ে যাবে। [সহিহ বুখারি]

এ বিষয়ে সেরা বইগুলোর অন্যতম একটি বই, খালিদ মুহাম্মদ খালিদ রচিত Men Around the Messenger থেকে উদ্ধৃত করছি।

মহান সাহাবি প্রজন্মের ব্যাপারে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত, তা কোনো বানোয়াট গল্প বা ভিত্তিহিন গুজব নয়। কারণ, যে সততা, নিষ্ঠা ও চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামি ইতিহাস ও এর মহান ব্যক্তিদের জীবনী সংরক্ষিত হয়েছে, সেরকম মান অন্য কোনো ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যাপারে মানবজাতি দেখেনি। এক অনবদ্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এর প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে। পরবর্তী প্রজন্মের মেধাবী মনীষীরা এমন কোনো বিষয় নেই, যার তথ্য ও তত্ত্ব-উপাত্তের আদ্যোপান্ত যাচাই করে দেখেননি।

তাদের অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক সময় তাদেরকে কাল্পনিক রূপকথার চরিত্র মনে হতে পারে। ইতিহাসের পাতায় তাদের যেসব অসাধারণ কৃতিত্ব, অকল্পনীয় সততা, অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিকতার বর্ণনা আমরা খুঁজে পাই—তার কোনোটি কাল্পনিক নয়। এটা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সজ্জীদের সত্যিকার যাপিত জ্বীবনের প্রতিচ্ছবি। কোনো লেখকের অতিরঞ্জন, কিংবা চিত্রশিল্পির অতি অঙ্কনের কারণে তদের চরিত্রগুলো এমন হয়ে ওঠেনি; বরং তারা বাস্তবে যে জ্বীবন যাপন করেছেন তার মধ্য দিয়েই তারা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন। তারা নিজেদের জ্বীবনকে উন্নত করার জন্য যে আন্তরিক ও অব্যাহত প্রচেন্টা করেছেন তার মধ্য দিয়েই তারা এই গুণে গুণান্বিত হয়ে উঠেছেন।



আল্লাহর রাসূলের একটি কাজ অন্য সকল নবির কাজের তুলনায় ভিন্নতর এবং অধিকতর জটিল ছিল। তাঁর পূর্বের সকল নবির কাজ ছিল কেবল মানুষের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌছানো। এ কারণে তাদের অনুসারীরা ছিল কেবল হুকুমবরদার। ইবাদাত ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব তাদের ছিল না; কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবি হওয়ায় এবং তার মধ্য দিয়ে নবুওয়াতি ধারার সমাপ্তি ঘটায়—তাঁর কাজ কেবল বার্তা পৌঁছানোই ছিল না; বরং এমন প্রজন্ম তৈরি করাও জরুরি ছিল, যারা তাঁর বার্তা পৃথিবীর সকল প্রান্তে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কিয়ামাত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে। এটা নবিত্বের সিলমোহরের বারকাহ যে, দাওয়াহর মহিমান্বিত কাজ তাঁর উম্মাতকে দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে—অন্যান্য নবিগণ অনুসারী তৈরি করেছিলেন, আর মুহাম্মাদ ﷺ তৈরি করেছিলেন নেতা।

এদের প্রথম ছিলেন তাঁর খলিফাগণ—খালিফাতু রাসূলিল্লাহ—আবু বাক্র আস-সিদ্দিক अ। তিনি কত উত্তম পশ্থায় নেতৃত্বের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর তার প্রথম কাজে। দুটো কারণে আমি কিছুটা বিস্তৃত আকারে ঘটনাটা বলব। প্রথমত, এই ঘটনা আমাদের বারবার স্মরণ করা উচিত এবং দ্বিতীয়ত, এই ঘটনা থেকে স্পন্ট যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ সুস্পন্টভাবে সাহাবিদেরকে ইঞ্জাত দিয়েছেন কে হবে তাঁর উত্তরসূরি। তিনি এমনভাবে কাজটি করেছিলেন যে, তারা কোনো সন্দেহ ছাড়াই স্পন্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাকে বেছে নিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে যারা সন্দেহ পোষণ করে এবং কুৎসা রটনা করতে চায়, তারা হয় রাসূল ﷺ-এর জীবন এবং সময় সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, অথবা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে।

শেষের দিনগুলো



আল্লাহর রাসূল 🏨 বলেছেন—

। তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিপদকে আর কিছুই মনে হবে না।

মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃখের সংবাদ ছিল রাসূল ﷺ-এর ওফাত; শুধু এ কারণে নয় যে, তারা তাঁর সঙ্গা পাওয়ার বারাকাহ থেকে বঞ্চিত হলো! কারণগুলোর মধ্যে আরও ছিল—রাসূলের ওফাতের সঙ্গো সঙ্গো ওয়াহি আসা বন্ধ হয়ে গেল এবং আল্লাহর সঙ্গো সরাসরি সংযোগের সমাপ্তি ঘটল।

সফর মাসের শেষ দিকের কথা। রাসূল ﷺ অনেক আয়াত এবং ইঞ্জিতের মাধ্যমে বুঝতে পারলেন, তাঁকেও পূর্বের নবিদের মতো চলে যেতে হবে। তিনি এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা বলেন,

। নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। [সূরা ঝুমার ৩৯: ৩০]



Compressed with PDF Compressor by Dasignation

আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং আপনার মৃত্যু হলেও তারা কি চিরঞ্জীব? প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [সূরা আম্বিয়া ২১: ৩৪-৩৫]

আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতিসাধণ করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাওয়াব দান করবেন। আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না, সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুত যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো। [সূরা আলে ইমরান ৩: ১৪৪-১৪৫]

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীন প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। [সূরা নাসর ১১০: ১-৩]

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [সূরা মায়েদা ০৫: ০৩]

আল্লাহর সুন্নাত হলো, মিশন সম্পূর্ণ হলে তিনি তাঁর নবিকে আবার তাঁর কাছে ডেকে নেন। তিনি অনেকবার ইঞ্জিতে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না। আল্লাহ তা 'আলা আরও জানিয়েছেন, নবিত্বের কাজ মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঞ্জোই শেষ হয়ে যাবে না; বরং তাঁর উম্মাহকে এই দায়িত্ব প্রদান করা হবে এবং তারা যতদিন এই কাজ চালিয়ে যাবে, তাদের জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসতে থাকবে।

রাসূল 🍇-এর ওফাত-নির্দেশক হাদীস

হাজ্জেরর খুতবার শুরুতে তিনি বলেন, আমার কাছ থেকে হাজ্জের নিয়মাবলি শিখে নাও। আমি হয়তো এই বছরের পর আর হাজ্জ করতে পারব না।

মু'আজ বিন জাবালকে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় তিনি বললেন, ফেরার সময় হয়তো তোমাকে আমার কবর এবং মসজিদের পাশ দিয়ে ফিরতে হবে। রাসূলের এই কথায় মু'আজ চোখ মুছলেন।

রাসূল ﷺ বলেন, জিবরাইল 🕮 বছরে একবার আমার সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এবছর তিনি দুবার করেছেন এবং এর শুম্বতা নিশ্চিত করেছেন।



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ଜିୟାୟମ୍ପିମ ଜିୟାନ୍ୟ

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন শেষ রাতে উঠে তাঁর দাস আবু মুওয়াইহিবাকে ডেকে বললেন-হে আবু মুওয়াইহিবা, আমাকে বাকিতে শায়িত লোকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। তুমি আমার সঞ্জো আসো। তারা দুজন বাকি কবরস্থানে গেলেন। রাসূল ﷺ বললেন—আসসালামু আলাইকুম হে কবরবাসীরা, তোমাদের অভিনন্দন! তোমাদের সেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে না, যার মধ্য দিয়ে এখানকার (জীবিত) লোকদের যেতে হচ্ছে। রাতের আধারতম অংশের মতো ফিতনা একের পর এক ধেয়ে আসছে। প্রথমটার চেয়ে শেষেরটা আরও ভয়াবহ। তারপর তিনি (আবু মুওয়াইহিবার দিকে ফিরে) বললেন, আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে দুটোর একটা বেছে নেওয়ার। দুনিয়ার সকল ধনভান্ডারের চাবি এবং দুনিয়া যতদিন থাকবে ততদিন বেঁচে থাকা, তারপর জানাত লাভ অথবা এখনই আল্লাহর সাক্ষাৎ ও জানাত লাভ। আবু মুওয়াইহিবা বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি প্রথমটাই বেছে নিন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর সঙ্গো সাক্ষাতকেই বেছে নিয়েছি। তারপর তিনি বাকিতে শায়িত মৃতদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন এবং ফিরে আসেন। এরপর তিনি ঘরে ফিরে আসার পরই তাঁর অস্তিম অসুস্থতা শুরু হয়।

একদিন (মাথাব্যথা হলে) আয়িশা বলতে থাকেন—আহ, আমার মাথা গেলা আমার মাথা গেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—আমারও অনেক মাথাব্যথা। এরপর আয়িশা মাথাব্যথা নিয়ে বারবার বলতে থাকলে তিনি তার সঙ্গো হালকা মজা করে বলেন, আরে তুমি (আমার আগে) মারা গেলে তো খারাপ কিছু না; তাহলে আমি তোমার গোসল করাব, জানাযা দেবো। আয়িশা বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই সৌভাগ্য অন্য কারও হোক। আমি মরলে তো আপনার যত্ন নেওয়ার জন্য আপনার অন্যান্য স্ত্রীরা রয়েছে!

এরপর রাসূল ﷺ-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল। তাঁর মাথাব্যথা বেড়ে গেল এবং তীব্র জ্বর এলো। এমনকি একজন সাহাবি রাসূল ﷺ-এর কপালে হাত রেখে সরিয়ে নিয়ে বললেন, আমি আপনার শরীরে হাত রেখে সহ্য করতে পারছি না। আপনার জ্বর খুবই তীব্র। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন—হ্যাঁ, আমরা নবিরা সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ যাতনা ভোগ করি।

তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের ঘরে গেলেন। যখন উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা-এর ঘরে ছিলেন, সে সময় তাঁর আরেকবার তীব্র ব্যথার উদ্রেক হলো। এরপর তিনি আবার আয়িশা-এর ঘরে গেলেন এবং সকলকে সেখানে তাঁর সঞ্চো সাক্ষাৎ করতে বললেন। তাঁর স্ত্রীগণ সেখানে তাঁর শুশ্রুযা করতে লেগে গেলেন। একটি কাপড় দিয়ে শক্ত করে তাঁর মাথা বেঁধে দেওয়া হলো। তিনি একপাশে আলি 45 এবং অন্যপাশে আব্বাস 45-এর ওপর হেলান দিয়ে ছিলেন। সেখানে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মাসজিদে গিয়ে লোকদের সঙ্গো কথা বলতে এবং তাদের নাসীহাহ করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি মাদীনার সাতটি ভিন্ন ভিন্ন কৃপ থেকে পানি এনে জ্বর কমানোর জন্য ঢালতে বললেন। তারপর তিনি একপাশে আলি বিন আবি তালিব এবং অন্যপাশে আব্বাসের একজন পুত্রের সহায়তায় মাসজিদে গেলেন। তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, নিজে হাঁটতে পারছিলেন না। মাসজিদে গিয়ে তিনি আল্লাহর



Compressed with PDF Compressor by DL পি দিনি দল

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি খুতবা দিলেন, তারপর আল্লাহর কাছে উহুদযুদ্ধের শহীদদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। দুনিয়া ত্যাগের এই কঠিনতম সময়েও তিনি প্রিয় সাহাবিদের কথা ভুলেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথিদের প্রতি এবং যারা তাঁর মিশন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছেন, সবার প্রতি খুব বিশ্বস্ত ছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর উদ্মাহের জন্য বেঁচে ছিলেন।

তিনি বললেন—হে মুহাজির সকল, তোমরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছ; কিন্তু আনসাররা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তারা সেই লোক, যারা আমাকে শুরুর দিকে সহায়তা করেছে, তাই তাদের মধ্যে সম্মানিতদের সম্মান করো এবং যারা ভুল করে, তাদের ক্ষমা করে দাও। হে লোক সকল, উসামার নেতৃত্বে অভিযান অব্যাহত রাখো। তার নেতৃত্বের ব্যাপারে তোমাদের অভিযোগ তার বাবার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগের মতো একই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা সাক্ষী, উসামা তার বাবার মতোই নেতৃত্বের যোগ্য।

রাসূল ﷺ থামলেন, স্তম্থ নীরবতা বিরাজ করছিল। তারপর তিনি বললেন—হে লোকেরা, আল্লাহর এক বান্দাকে এই দুনিয়া এবং আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তার মধ্যে বাছাই করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং সে আল্লাহর কাছে যা আছে তা পছন্দ করল। (একথা শুনে আবু বাক্র ﷺ কাঁদতে শুরু করলেন। লোকেরা অবাক হলো, কেন কাঁদছেন তিনি? তিনদিন পরে তারা জানতে পারল।) আবু বাক্র ﷺ বললেন—আমরা নিজেদের এবং আমাদের সন্তানদের আপনার জন্য কুরবানি করব ইয়া রাসূলালাহ। রাসূল ﷺ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বন্ধুতু এবং সম্পদে আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি আবু বাক্র। আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে খলিল হিসেবে বেছে নিতাম, সে হতো আবু বাক্র; কিন্তু আমি আল্লাহর খলিল এবং আবু বাক্র আমার বন্ধু ও সজ্গী। মাসজিদের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, কেবল আবু বাক্রের দরজা হবে না। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ রাবুবল আলামীন ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে তাদের নবির কবরের ওপর উপাসনাঘর নির্মানের জন্য অভিশাপ দিয়েছেন। আরব উপত্যকায় আর কোনো ধর্মের স্থান নেই। তোমরা সালাতের হিফাজাত করো। তোমাদের অধীনদের যত্ন নিয়ে। তোমাদের নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। উসামার বাহিনীকে পাঠিয়ে দাও।

রাসূল ﷺ নামাজের ইমামতি করতে যেতে পারলেন না। নির্দেশ দিলেন, আবু বাক্রকে নামাজের ইমামতি করার জন্য বলতে। তিনি বললেন, আবু বাক্রকে নামাজে ইমামতির জন্য বলো। আয়িশা বিতর্কের ভয়ে তার পিতাকে নামাজ পড়াতে দিতে চাননি। তাই তিনি বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি অত্যন্ত নরম হৃদয়ের মানুষ এবং তিনি হয়তো আপনার স্থলে দাঁড়ালে নিজেকে সামলাতে পারবেন না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই আপত্তির পুনরাবৃত্তিতে বিরস্ত হয়ে বললেন, আবু বাক্রকে সালাতে লোকদেরকে ইমামতি করতে বলো। তোমরা মেয়েরা ইউসুফের (সময়কার) মেয়েদের মতো। পরে আয়িশা বলেন, আমি চাইনি আমার পিতা সালাতে নেতৃত্ব দিক। কারণ, মানুষ হয়তো রাসূলুল্লাহর জায়গায় তাকে দেখতে পছন্দ করবে না।

কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বুঝতে হলে অবশ্যই সেসময়ের প্রেক্ষাপট, সাংস্কৃতিক দ্যোতনা এবং সে কালের মানুষের আচরণিক আয়নার মধ্য দিয়ে দেখতে হবে। আমরা

m

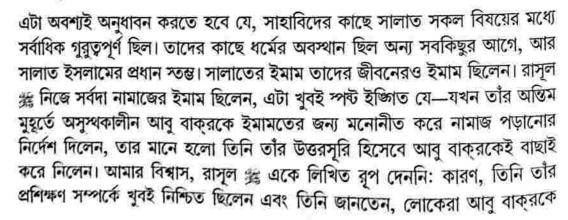


নিডারশিপ নেজনজ

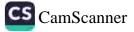
বর্তমান সময়ের মানদণ্ড চৌদ্দশো বছর আগে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি না এবং বলতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনাটি আমাদের বর্তমান সময়ের বিচারে 'গ্রহণযোগ্য' না হচ্ছে, ততক্ষণ একে গ্রহণ করব না। আরবদের মধ্যে, এমনকি তথাকথিত আমেরিকার ওয়াইল্ড ওয়েস্টকে যারা দখল করতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যেও মুখের কথাই চুক্তি হিসেবে গণ্য হতো। অনেক বড় লেনদেন কেবল একে অপরক দেওয়া মৌথিক প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতো। কিছু চুস্তি লিখিত হতো বটে—তবে তা এ কারণে নয় যে মুখের কথা যথেন্ট নয়; বরং কিছু নির্দিন্ট বিষয় এতটা জটিল যে, সাধারণভাবে মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে এ ধরনের চুস্তিও মুখের কথার ওপর ভিন্তি করেই স্বাক্ষরিত হতো। চুস্তির লিখন ছিল গৌণ এবং তা চুস্তির গুরুতে কিছুই বৃদ্ধি করত না। একবার কোনো বিষয়ে দু-পক্ষ একমত হলে উভয় পক্ষই তা মেনে চলত, চাই লিখিত হোক বা অলিখিত। এ কারণেই কাউকে মিথ্যাবাদী বলা খুনের মতো ঘটনা ছিল। কারণ, কোনো ব্যস্তি যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেয় এবং এ ব্যাপারে কিছু না করে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় সে এই অভিযোগকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে সে সমাজে বসবাসের যোগ্যতা হারাল। এমনকি বর্তমান সময়েও একজন আরবকে সবচেয়ে খারাপ বলার উপায় হলো তাকে মিথ্যাবাদী বলা।

মার্ক্লায় যারা রাসূল 蹇-এর বিরোধিতা করেছিল, মাদীনার মুনাফিকদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের চেয়েও কঠোর অভিশাপ দিয়েছেন। কারণ, প্রকাশ্যে তারা মুসলমান হওয়ার ভান করলেও গোপনে রাসূলের বিরোধিতা করত। তারা অভিশপ্ত; কারণ তারা ছিল মিথ্যাবাদী। ইসলাম সত্যবাদিতার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে। এমনকি এর জন্য যদি জন্মদাতা পিতা, আপন ভাই এবং পরিবারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়, তারপরও। ইসলাম সত্য এবং সকল প্রকার মিথ্যার বিরুদ্ধে এর অবস্থান।

এখানে আবু বাক্র 45 - এর উত্তরাধিকারের ঘটনায় আমরা কোনো সাধারণ মানুযের কথা নিয়ে আলোচনা করছি না। আমরা আল্লাহর রাসূলের মুখের কথা নিয়ে কথা বলছি, যার ওপর তাদের ঈমান প্রতিষ্ঠিত। সাহাবিরা রাসূল ﷺ-কে প্রশ্নাতীতভাবে মান্যই করতেন না, তাঁর অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাতেও সাড়া দেওয়ার প্রচেন্টায় নিজেদের উৎসর্গ করতেন। কারণ তারা তাঁকে ভালোবাসতেন, তাঁর নিকটবর্তী ছিলেন, তাঁর যোগাযোগের সূক্ষ পার্থক্যও বুঝতে পারতেন। সুতরাং যদি তিনি ইজ্ঞািত করতেন আবু বাক্র তাঁর উত্তরসূরি হবেন, তাহলে সেসময় কেউ এই আপত্তি তুলে বলত না যে, এটা লিখিত নয়।







Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এক্সঢ়া অর্ডিনারি দল

কতটা শ্রন্ধা করে। যদি তিনি সত্যিই এটা লিখে রাখা, অথবা আলি ইবনু আবি তালিবসহ অন্য কাউকে উত্তরসূরি নিযুক্ত করার প্রয়োজন মনে করতেন, তাহলে এমনটি করার জন্য তাঁর হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল। বৃহস্পতিবার আখেরি অসুস্থতা শুরু হওয়া থেকে সোমবার ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত লম্বা সময়ে যেকোনো সিন্দ্বান্ত বাস্তবায়ন করে যাওয়ার মতো সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট, তাঁর উত্তরসূরি কে হচ্ছেন এবং তাঁর অনুসারী সাহাবিগণ যে তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান করে মেনে নেবে, তা নিয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ঠিক তা-ই ঘটেছিল এবং আলি বিন আবি তালিবসহ সকলেই বিনা দ্বিধায় আবু বাক্রকে আল্লাহর রাসূলের খলীফা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।

নবিজির জীবন্দশায়ই আবু বাক্র সিদ্দিক ছিলেন তাদের শাইখ^{্যি}। তারা অন্যদের তুলনায় তাকে অধিক শ্রন্থা করতেন, পরামর্শ এবং বিধিনিষেধ জানার জন্য তার কাছে আসতেন। এমনকি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গো বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য তাকে অনুরোধ করতেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব হুদাইবিয়ার সন্ধির ব্যাপারে তার আপত্তি সম্পর্কে কথা বলতে কার কাছে গিয়েছিলেন? রাসূল ﷺ সেই মহিলাকে কী বলেছিলেন, যখন মহিলা কোনো এক বিষয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এবং নবিজি তাকে পরের দিন আসতে বলেছিলেন? মহিলা প্রশ্ন করলেন, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই, তখন? উত্তরে তিনি বললেন, আবু বাক্রকে জিজ্ঞেস করো। মহিলা পুনরায় জানতে চাইলেন, যদি আবু বাক্রও না থাকে? তিনি বললেন, 'উমারকে জিজ্ঞেস করো। রাসূল ﷺ-এর সীরাত খুবই সতর্কতার সঙ্গে এবং বিশ্বস্ত উৎস থেকে অধ্যয়ন করা জরুরি। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলের প্রিয় এই সাহাবিদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে, তাদের নামে কুৎসা রটায়, এমন পাপীষ্ঠদের থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক। তারা খুব কমই উপলম্বি করতে পারে যে, কোনো সাহাবির সততায় কালিমা লেপন করা মানে হলো কুরআনের বিশুম্থতা সন্দেহ করা এবং ইসলামের সম্পূর্ণ কাঠামোটাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা। কারণ, এই সাহাবিরাই আল্লাহর কথা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশাবলি আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। আমরা যদি তাদেরকে একটি বিষয়ে বিশ্বাস করতে না পারি, তাহলে বাকি বিষয়গুলোতে কীভাবে করব? ধর্ম হিসেবে ইসলামের কী অবস্থা হবে? হয়তো আল্লাহ ও তাঁর রাস্তলের এই শত্রুরা তাদের কর্মের পরিণাম ঠিকই বুঝতে পারে; তবু এমন জ্বঘন্য নিন্দামন্দে মেতে থাকে, কারণ তারা ইসলামের ক্ষতি চায়।

আবু বাক্রকে সালাতে ইমামতি করার নির্দেশ দানের মধ্য দিয়ে রাসূল ﷺ-এর কী অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, তা সাহাবিদের কাছে পরিম্কার ছিল। এ কারণে কেউ তাকে উত্তরসূরি নির্ধারণের জন্য কারও নাম উল্লেখ করা অথবা লিখে রাখার জন্য বলেননি। যদিও এসব করার জন্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রদন্ত খুতবার পর থেকে সোমবার মধ্য সকাল পর্যন্ত যথেষ্ট সময়-সুযোগ তাঁর হাতে ছিল। তিনি সচেতন ছিলেন, পুরো সময়টাতেই তাঁর কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। বহু লোক তাঁর সঞ্চো সাক্ষাৎ করেছেন এবং

২ শাইখ একটি পরিভাষা। আরবিতে দুই ধরনের লোককে শাইখ বলা হয়। ক. শাইখ ফিল ইলম (জ্ঞানবৃশ্ধ), খ. শাইখ ফিস সিন (বয়োবৃন্ধ)। আবু বাক্র 🚓 উভয় দিক দিয়ে অনেক সাহাবির শাইখ ছিলেন। রাসূলের হিজরাতের একমাত্র সজ্ঞী হিসেবেও তিনি সাহাবিদের মাঝে অনন্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। - সম্পাদক



লিডারশিপ লেসনস

তিনি তাদের সঞ্জো কথা বলেছেন। তিনি যদি চাইতেন, তাহলে খুব সহজেই আলি ইবনু আবি তালিব বা অন্য কারও নাম বলতে পারতেন। আলি ইবনু আবি তালিবকেও সালাতে নেতৃত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দ্বারা নির্দেশিত ছিলেন এবং তিনি তাই করেছিলেন, যা আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন। এ বিষয় আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত। আবু বাক্র ্বার্হা বৃহস্পতিবার রাসূল ﷺ-এর নির্দেশের পর থেকে সোমবার রাসূল ﷺ-এর ওফাত পর্যন্ত নামাজ পড়িয়েছেন। একবার আজান হওয়ার পর আবু বাক্র ক্র উপস্থিত না হওয়ায় মুয়াজ্জিন হজরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে নামাজ পড়ানোর জন্য বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমারের গলার আওয়াজ শুনে বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং মুমিনরা চায় না আবু বাক্র ছাড়া আর কেউ আমীর হোক। এটা রাসূল ﷺ-এর স্লন্ট ইজ্যিত যে, তিনি আবু বাক্রকে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

ফাতিমা প্রতিদিন তার বাবাকে দেখতে যেতেন। নবিজি তাকে আদর করে চুমু দিতেন এবং নিজ আসনে বসতে দিতেন। একবার ফাতিমা তাঁকে দেখতে এলেন এবং নবিজি তাকে চুমু দিলেন। রাসূল ﷺ তার কানে ফিসফিস করে কিছু বললে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। এবার তিনি অন্যকিছু ফিসফিস করে বললে ফাতিমা হাসলেন। রাসূল ﷺ কিছু একটা বলার কারণে ফাতিমা এমনটা করলেন, আয়িশা জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে যান। রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর জানালেন, তিনি বলেছিলেন যে, এই অসুস্থতা থেকেই তাঁর ওফাত হবে, এটা শুনে আমি কাঁদলাম। তারপর তিনি বললেন, এই ঘরের মানুষদের মধ্যে আমিই প্রথম তাঁর সজ্যে মিলিত হব, এ সংবাদে আমি হাসলাম।

অসুস্থতার শেষ দিনে ফাতিমা বললেন, হে আমার বাবা, আপনার কী যন্ত্রণাই না হচ্ছে! রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, আজকের পর আমি আর যন্ত্রণা ভোগ করব না। আমাদের উচিত নিজেদেরকে রাসূল ﷺ-এর পরিবার এবং সাহাবিদের সময়কালে সেই স্থানে নিজেদের কল্পনা করা, যেন সেই শেষ কয়টা দিন কেমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তা বুঝতে পারি। রাসূল ﷺ-এর ঘরে সাতটি দিনার ছিল। তিনি ওগুলো দান করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাসূলের অসুস্থতার কারণে আয়িশা তা করতে ভুলে গেলেন। রাস্লুল্লাহ ﷺ বারবার অচেতন হয়ে চেতন ফিরে পাচ্ছিলেন। এমনই একবার চেতন হয়ে তিনি দিনারগুলো তখনো আছে কি না, জানতে চাইলে আয়িশা জানালেন, সেগুলো তখনো আছে। রাসূল ﷺ ওগুলো চাইলেন এবং নিজ হাতে নিয়ে বললেন—এটা কি ভালো দেখাবে, যদি মুহাম্মাদ এ অবস্থায় তাঁর রবের সঞ্চো সাক্ষাৎ করেন? দিনারগুলো তৎক্ষণাৎ বিলিয়ে দেওয়া হলো।

রবিবার রাত অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে কেটে গেল।

সোমবার দিন সাহাবিরা হজরত আবু বাক্রের নেতৃত্বে সালাত আদায় করছিলেন, রাসূল ﷺ তাঁর ঘর এবং মাসজিদের মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে দিলেন। আনাস বিন মালিক ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে আমাদের দেখলেন। তাঁর মুখমন্ডল ছিল চাঁদের ন্যায়। তারপর তিনি আলি বিন আবি তালিব এবং ফাহাদ ইবনুল আব্বাস-এর ওপর ভর করে মসজিদে আসেন। তাঁকে দেখে লোকেরা এতই খুশি হলো যে, তারা প্রায়





এক্সট্রা অর্ডিনারি দল 🚦

সালাতই ছেড়ে দিচ্ছিল। আবু বাক্র 🚓 তিলাওয়াতে তার কণ্ঠসুর উঁচু করে বোঝাতে চাইলেন নামাজ জারি রাখা উচিত। আবু বাক্র 🚓 বুঝতে পারলেন, এই উত্তেজনা মানেই রাস্লুল্লাহ 💥 আসছেন। তাই তিনি পিছিয়ে আসতে শুরু করলেন; কিন্তু রাসূল ﷺ তাকে সামনের দিকে ঠেলে বললেন—তুমি পড়াও। তারপর রাসূল ﷺ তার পাশে বসে পড়লেন ও বসেই সালাত শেষ করলেন। এটাই সর্বশেষ দৃশ্য যা রাসূল ﷺ দেখেছেন— তাঁর উদ্মাত একসজো সালাতে দাঁড়িয়ে আছে।

এ দৃশ্য ছিল তাঁর মিশন সম্পন্ন হওয়ার ইজ্ঞািত, এটি তাকে সবচেয়ে খুশি করেছিল।

সালাতের পর তিনি সমবেতদের উদ্দেশে পরিষ্কার কণ্ঠে ভাষণ দিলেন। মসজিদের বাইর থেকেও শোনা গিয়েছিল তাঁর সে বক্তব্য।

রাসূল 差-এর রোগমুস্তিতে মুসলমানরা এতটাই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, উসামা বিন যাইদ অভিযানে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। আবু বাক্র ఉ রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, আমরা সবাই আপনার জন্য দু'আ করেছিলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনার ওপর রাহমাত বর্ষণ করে আপনাকে সুস্বাস্থ্য দান করেছেন। আমি (আমার স্ত্রী) বিনতু খারিজার সঙ্গে রাত কাটাব বলে কথা দিয়েছিলাম। আমি কি অনুমতি পেতে পারি? রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। আবু বাক্র ఉ মাদীনার সীমান্ত সুন্হ-এ চলে গেলেন। 'উমার ও আলি তাদের নিজেদের কাজকর্মে ফিরে গেলেন। রাসূল ﷺ ফিরে এলেন আয়িশার ঘরে। আয়িশার ভাই আবদুর রাহমান বিন আবু বাক্র রাসূল ﷺ ফিরে এলেন আয়িশার ঘরে। আয়িশার ভাই আবদুর রাহমান বিন আবু বাক্র রাসূল ﷺ মিসওয়াকটির দিকে তাকিয়ে আছেন, তাই তিনি জানতে চাইলেন, ওটা কি আপনার চাই ইয়া রাসূলাল্লাহ? রাসূল ﷺ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আয়িশা মিসওয়াকটি নিয়ে চিবিয়ে নরম করে রাস্ল ﷺ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আয়িশা মিসওয়াকটি নিয়ে চিবিয়ে নরম করে রাসূল ﷺ বে পড়ে রাসূল ﷺ-এর হাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর শরীরে বুলিয়ে দিলেন।

এরপর দ্রুত আল্লাহর রাসূল 蹇-এর অবস্থার অবনতি হতে লাগল। তিনি একটি পানিভর্তি পাত্রে হাত ডুবিয়ে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'মৃত্যুর যন্ত্রণা সত্য'। তারপর সেই অন্তিম সময় উপস্থিত হলো। আয়িশা বর্ণনা করেন, আমি তাঁকে দেখেছি আসমানের দিকে তাকিয়ে তিনি বলছেন, 'বরং সর্বোত্তম বন্ধুর সান্নিধ্যে'। আমি তখন বুঝতে পারলাম যে মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তাঁর কাছে অনুমতি চাইছেন (তিনি চাইলে দুনিয়াতে থাকতে পারবেন বলে জানিয়েছেন); কিন্তু তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যকেই পছন্দ করেছেন। তারপর তাঁর মাথাটা আমার দিকে হেলে পড়ে।

সংবাদটি মাদীনাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। 'উমার এবং মুগিরা রাসূল ﷺ-এর ঘরে ছুটে এলেন। 'উমার বললেন, তিনি অচেতন হয়ে গেছেন। মুগিরা বললেন, তিনি মারা গেছেন। 'উমার বললেন, তুমি ফিতনা তৈরি করতে চাইছ। মুনাফিকদের ধ্বংস করা ব্যতীত তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।

'উমার 🚓 মসন্ধিদে গেলেন। তরবারি বের করে বললেন, লোকেরা বলছে যে রাসুল 🎉



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft লিয়বশিপ লেমনস

মৃত্যুবরণ করেছেন। না, তিনি মারা যাননি; বরং মুসা 🖗 এর মতো অজ্ঞান হয়েছেন। যদি কেউ বলে তিনি মারা গেছেন, আমি এ তরবারি দিয়ে তার মাথা ফেলে দেবো।

আবু বাক্র ఉ তখন মাদীনার সীমান্তে ছিলেন, তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি দ্রুত ফিরে এলেন। তিনি কারও সঙ্গে কথা না বলে সোজা আয়িশার ঘরে চলে যান, যেখানে রাসূল 難 শায়িত। তিনি রাসূল 難-এর ঢেকে রাখা মুখ উন্মুক্ত করে তাঁকে চুম্বন করলেন এবং কাঁদলেন, বললেন—আপনি জীবিত অবস্থায় পবিত্র ছিলেন, মৃত অবস্থায়ও পবিত্র। যে মৃত্যু আপনার জন্য অবধারিত ছিল, আপনি তার মধ্য দিয়েই চলে গেলেন।

তিনি তারপর মসজিদে এলেন এবং দেখলেন 'উমার 🚓 লোকদের উদ্দেশ্যে চিংকার করছেন। তিনি বললেন—বসো, হে 'উমার; কিন্তু 'উমার 🚓 তাকে উপেক্ষা করলেন। তাই আবু বাক্র মিম্বারে আরোহন করলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে কথা আরম্ব করলেন। লোকেরা 'উমারকে ছেড়ে তার কথা শুনতে এলো। তিনি বললেন, যারা মুহাম্মাদের ইবাদাত করত, তারা যেন জেনে নেয় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যদি তারা আল্লাহর ইবাদাত করে থাকে তাহলে তিনি তো চিরঞ্জীব, কখনও মারা যাবেন না। তারপর নিন্মোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাওয়াব দান করবেন। [সূরা আলে ইমরান ৩: ১৪৪]

'উমার 🚓 বললেন, এই আয়াত কুরআনের? আয়াতটি তিনি জানতেন; কিন্তু এমনভাবে বললেন যেন তিনি এ প্রথমবার শুনলেন। এবার তিনি ভেঙে পড়লেন এবং বললেন, আমার পা আমাকে আর বহন করতে পারছে না। বর্ণনাকারী বলেন, সকলেই আয়াতটি এমনভাবে তিলাওয়াত করছিল যেন তারা এটি প্রথমবার শুনছে।

রাসূল ﷺ-এর আশপাশের মানুষ, যাদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তাদের প্রকৃতি কীরূপ—তা বোঝানোর জন্য আমি এ ঘটনাটি এত বিশদভাবে বর্ণনা করলাম। সাহাবিদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে রাসূলুল্লাহকে আবু বাক্র ক্র-এর চেয়ে বেশি ভালোবাসত এবং যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাক্রের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। যদি এমন কেউ থাকত, প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যুশোকে যার ভেঙে পড়া এবং ক্রিয়াহীন হওয়া যুস্তিযুক্ত মনে হতো—তিনি হতেন আবু বাক্র ক্র। অথচ তিনিই একমাত্র লোক, যিনি তার যন্ত্রণাকে পাশ কাটিয়ে শক্ত খুঁটি হলেন—যেন অন্যরা তার থেকে সহায়তা নির্তে পারেনি এবং বাস্তবতার আঘাতে ভেঙে পড়েছিল। যে আবু বাক্র রাসূল ﷺ কে তান্য যে কারও চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, তিনিই দুঢ় থেকে উন্মাহকে নেতৃত্ব দির্তে সক্ষম হয়েছিল। প্রশিক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায় যখন নেতা তার অনুসারীদের মাঝে





এক্সট্রা অর্ডিনারি দল

অনুপস্থিত থাকেন এবং এরকম একটি সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথমদিকের শিক্ষার্থী আবু বাক্রকে পাওয়া গেল সর্বোত্তম অবস্থায়। তার কর্মের মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করেছেন রাসূল ﷺ সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই বাছাই করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিশন কেবলমাত্র তাঁর বার্তা পৌঁছানো ছিল না; বরং ছিল এমন একটি জাতি প্রস্তুত করা, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম তক এই বার্তা পৌঁছে দেবে। আবু বাক্র الله এমন একটি প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ কাহিনি দিয়েই এ অধ্যায় সমাপ্ত করা যায়, কারণ ইতিহাস সাক্ষী এর পরে কী ঘটেছিল। পরবর্তী চৌদ্দশো বছর ধরে বর্তমান সময় পর্যন্ত যা কিছু ঘটে চলছে, এমন সময় ও স্থানে যা রাসূল ﷺ জানতেনও না, দেখেনওনি।

একজন নেতার কাছে কঠিনতম কাজ তার নির্দেশ মান্য করানো নয়; বরং সে যে স্বপ্ন দেখেছে তাদেরকে দিয়েও সে একই স্বপ্ন দেখানো। এমন এক লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্ধুম্ব করা যা একমাত্র সে-ই দেখতে পেরেছে। যখন মানুষ কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে, একমাত্র তখনই তারা এর বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে। যেকোনো ক্ষেত্রেই একজন নেতার জন্য এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ।

মুহাম্মাদ ﷺ এটা শুধু তাঁর নিজের প্রজন্মেই সফলভাবে করতে সক্ষম হননি, পরের প্রজন্মের যারা তখনও জন্মই নেয়নি—তাদের মাঝেও পৌঁছে দিয়েছেন। যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সময়ে বেঁচে ছিল না, কখনো তাঁকে দেখেনি কিংবা তাঁর কণ্ঠ শুনেনি, তারাও এমনভাবে তাঁর বার্তা দূরদূরান্তে পৌঁছে দিচ্ছেন—যেন তারা সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই শুনে আসছেন। তারা তাঁকে নিজেদের পিতামাতা ও সন্তানদের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন এবং তাঁর সন্মান রক্ষার্থে প্রয়োজনে নিজেদের জীবন ত্যাগ করতে রাজি এবং এমন কিছু করাকে গৌরবের কাজ বলে মনে করেন। রাস্ল ﷺ-এর নেতৃত্বে এমন কী ছিল—যা এসব কিছু সম্ভবপর করে তুলেছে? কী এমন বিষয়, যা তাকে যেকোনো বিচারেই স্মরণীয় করেছে? তাঁর মধ্যে কী এমন ছিল, যার কারণে তাঁর চরম শত্রুও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর সম্পর্কে ভালো বলতে বাধ্য হতো?



এক্সট্রা অর্ডিনারি গুণাবলি

বলা হয় শেষ পর্যন্ত ফলটাই ঘরে নেওয়া যায়। ফলাফল নির্ভর করে গুণের ওপর। গুণ হলো সবচেয়ে বড় পার্থক্যকারী, অনুসারীদের জন্য সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক এবং চলমান সফলতার সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা।

আগেই বলেছি, রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের কাছে সালাত ছিল সবকিছু পরিমাপ করার মিটার। তাদের জীবনকে সংজ্ঞায়িত করেছে সালাত। সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য তারা সালাতের দিকেই মুখ ফিরাতেন। সালাত ছিল তাদের রবের সঙ্গো কাটানোর সময়, কর্মশক্তির প্রেরণা। সালাত ছিল তাদের আনন্দ, অবসাদ দূর করার উপকরণ এবং মন ও শরীরের শক্তি। রাসূল ﷺ বিলাল বিন রাবাহকে ডেকে সালাতের জন্য আযাান দিতে বলতেন---সালাতের মাধ্যমে আমাদের শান্তি দাও হে বিলাল।

সালাতের মাধ্যমেই রাসূল ﷺ তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, সে বার্তা দিয়ে যান এবং তাঁর রবের সঞ্জো সাক্ষাতের পূর্বে পৃথিবীর যে দৃশ্যটি তাকে সুখী করেছিল, তা ছিল সাহাবিদের একসজো সালাত আদায়। তাই এটা খুব স্বাভাবিক যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের ভাষাতেই গুণাবলি বর্ণনা করবেন। বিখ্যাত হাদীসে জিবরীলে রাসূল ﷺ জিবরাইল আঞ্র-এর প্রশ্নের উত্তরে ইহসান (যার একটি অর্থ উৎকর্ষতা) বলতে কী বোঝায় বলেছেন। আমি এখানে সম্পূর্ণ হাদীসটি উপস্থাপন করছি, তবে আলোচনার ক্ষেত্রে কেবল আল-ইহসান সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করব।

ইয়াহিন বিন ইয়ামুরের সূত্রে বর্ণিত, একবার তিনি মাসজিদে প্রবেশের সময় আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনুল খান্তাবের সঞ্জো দেখা হলো। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার) বলেন--আমার বাবা 'উমার ইবনুল খান্তাব বলেছেন, একবার আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে ছিলাম। এমন সময় এক লোক আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন। যার পরিধেয় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার কেশ ছিল কালো কুচকুচে। তার মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন ছিল না। আমরা কেউ তাকে চিনি না। তিনি নিজের দু-হাঁটু নবি ﷺ-এর দু-হাঁটুর সজো লাগিয়ে বসে পড়লেন, আর তার দুহাত নবি ﷺ-এর দুই উরুর ওপর রাখলেন।

তারপর বললেন—হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাস্লুল্লাহ ﷺ ^{বললেন}, ইসলাম হলো তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো



ইলাহ নেই এবং অবশ্যই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযানের সাওম পালন করবে এবং বাইতুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করেছেন আবার তিনিই তা সত্যায়িত করছেন।

আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন, ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, এমনিভাবে তাকদীরের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

তারপর বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন, ইহসান হলো এমনভাবে ইবাদাত-বন্দেগি করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে না-ও দেখ, তাহলে অন্তত ভাববে তিনি তোমাকে দেখছেন।

আগন্তুক বললেন, আমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চাইতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অধিক অবহিত নন। আগন্তুক বললেন, আমাকে এর আলামাত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন—তা হলো এই যে দাসী তার প্রভুর জননী হবে, আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে।

'উমার ইবনুল খাত্তাব 🚓 বলেন, আগন্তুক চলে যাওয়ার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন—উমর, তুমি জানো এ প্রশ্নকারী কে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল বললেন, তিনি জিবরাইল। তিনি তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। [সহীহ মুসলিম]

আমার দৃষ্টিতে আল-ইহসান সম্পর্কিত চিহ্নিত অংশটুকু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে উৎকৃষ্টতার ধারণার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, যা রাসূল ﷺ নিজে পালন করেছেন এবং আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে রেখে গেছেন—যেন আমরা নিজেরাই পরিমাপ করতে পারি। আমি আগেও বলেছি, ইসলাম এবং রাসূল ﷺ-এর শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই ধর্মের আজিকে বলা হয়েছে; কিন্তু এর প্রয়োগ কেবল ধর্মীয় প্রার্থনাই নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ কারণেই আল্লাহ রাবুবল আলামীন তাঁর রাসূলের শুধু ইবাদাতের অংশটুকু নয়, সমগ্র জীবনকেই মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা বলেন:

| যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, | তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। [সূরা আহযাব ৩৩: ২১]

ইসলাম হলো জীবনের পূর্ণাজ্ঞা জীবনব্যবস্থা, যা আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে ইবাদার্ত-বন্দেগি, আচরণবিধি, পারম্পরিক ব্যবহার (মু'আমালাত) এবং সমাজ (মু'আশারাত) পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে, যদিও নীতিমালা এবং আদর্শসমূহ ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু তা জীবনের বাকি সকল ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত।



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft এক্সট্রা অর্ডিনারি গুণাবলি

এ হাদীসে উৎকর্ষতা বলতে রাসূল ﷺ যা বলেছেন, সেটার সহজ অর্থ হলো আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা। এর মানে হলো তিনি আমাদের দেখছেন, তিনি আমাদের সহায়তা করবেন, আমাদের বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করবেন, আমাদের প্রচেন্টায় সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের প্রতি সন্তুন্ট হবেন। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল কাজে, কথায় এই সচেতনতার সার্বক্ষণিক উপস্থিতি থাকতে হবে। আমাদের প্রত্যেকটি লেনদেন, কথোপকথন এবং প্রত্যেকটি সম্পর্ক স্থাপনের সময় এটি মনে রাখতে হবে।

ভাবুন তো এমন একটা সমাজ তৈরি হলে কেমন হবে—যেখানে সকল সদস্য এই সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সতর্ক যে, সে এক আল্লাহর কাছে দায়বন্ধ; যার কাছে কোনো কিছুই লুক্কায়িত নয় এবং একদিন তাকে জবাবদিহির জন্য ডাকা হবে, ও সে কেমন জীবনযাপন করেছে, তার ওপর ভিত্তি করে তাকে পুরস্কার অথবা শাস্তি দেওয়া হবে। এটা হবে এমন একটি সমাজ, যেখানে মানুষ বস্তুগত সম্পদ নয়; বরং পরস্পরের কাছে ভালো হওয়ার, পরস্পরের অধিকার আদায় করার জন্য প্রতিযোগিতা করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের জীবনে এমন একটি সমাজ তৈরি করেছিলেন। রাসূল ﷺ-কে অন্যান্য শিক্ষকদের থেকে আলাদা করেছে তাঁর জীবন, যা ছিল তাঁর প্রচারিত শিক্ষার জীবন্ত উদাহরণ। তাঁর জীবনে কথা ও কাজের মধ্যে কোনো অমিল ছিল না। তিনি অন্যকে যা করতে বলেছেন, তা নিজে করেছেন এবং তিনি ছিলেন জীবনযাপন, হাঁটাচলা, কথাবার্তায় ইসলামের পতাকাবাহক। তাঁর জীবনে ইসলাম কেবলই কোনো তত্ত্ব, আদর্শ বা দর্শন ছিল না; বরং সত্যিকারের বাস্তব পম্ধতি যা পরবর্তী সময়ে আবু বাক্র, এর পরবর্তী সময়ের খলিফা 'উমার ইবনুল খাত্তাবের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর 'উমার ্ল্র কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন—আবু বাক্র ্র্রু আমার জন্য অনেক উঁচু আদর্শ স্থাপন করে তার পরবর্তী সময়ের খলিফাদের জন্য কঠিন করে গেছেন।

আরেকটি উদাহরণ: প্রত্যেকদিন ভোরে ফজর নামাজের আগে আবু বাক্র সিদ্দিক للله মাদীনার সীমান্তে অবস্থিত একটি ক্যাম্পে যেতেন। তিনি তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করতেন এবং কিছু সময় কাটিয়ে ফিরে আসতেন। তার মৃত্যুর পর 'উমার للله ওই তাঁবুতে কে বাস করে তা জানতে আগ্রহী হলেন। তিনি তাঁবুতে গিয়ে বর্ষীয়সী অন্থ একজন বৃষ্ণা মহিলাকে পেলেন।

তিনি তার সম্পর্কে জানতে চাইলে বৃন্ধা মহিলা উত্তর দিলেন, আমি এক বৃন্ধা, যার এই দুনিয়াতে কেউ নেই এবং আমি এখানে আমার ভেড়া নিয়ে একাকী বাস করি। প্রত্যেক সকালে মাদীনা থেকে একজন লোক আমার এখানে এসে আমার তাঁবু পরিষ্কার করে, আমার খাবার রান্না করে, ভেড়ার দুধ দোহন করে, তাদের যত্ন নেয় এবং তারপর ফিরে যায়। তার যত্ন-পরিচর্যা ব্যতীত আমি টিকে থাকতে পারতাম না। 'উমার জ্ঞানতে চাইলেন, আপনি জ্বানেন তিনি কে? উত্তরে সে বৃন্ধা জানালেন—লোকটি কে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই, কারণ সে কখনো তাকে বলেনি।

'উমার 🚓 বললেন, তিনি ছিলেন রাসূলুলাহর খলিফা আবু বাক্র সিদ্দিক 🐲।



নিডারশিপ নেচানচা

এমন একটা সমাজে বসবাসের কথা ভেবে দেখুন যেখানে একজন শাসক নিজে দুর্বল ও বঞ্চিতদের সেবা করছে। এমন একটি সমাজ যার শাসক তার জনগণের ভয়ে ভীত নয়; বরং শাসিতদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জ্র্বাব দেওয়ার ভয়ে ভীত।

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, খলিফা থাকাকালীন সময়ে একদিন তিনি সাহাবিদের সঞ্জো এক স্থানে এলেন এবং বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি মহিমান্বিত এবং যাকে ইচ্ছা তাকে দেন, সে যা-ই চাক না কেন। এমন এক সময় ছিল, যখন আমি আমার পিতার উটের রাখাল ছিলাম। আমি উটগুলোকে নিয়ে এখানে আসতাম। আমার পিতা আমাকে অনেক কাজ দিতেন এবং আমি যদি কাজ না করতাম, তবে তিনি আমাকে প্রহার করতেন এবং আমি খুব জীর্ণ শীর্ণ পোষাক পরিধান করতাম; কিন্তু আজ আমার দিকে তাকাও, আল্লাহ আমাকে এত উচ্চতায় নিয়ে এসেছেন যে, আমার আর আল্লাহর মাঝে আর কেউ নেই।

আবদুর রাহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেন, 'উমার 🚓 লোকদের মাসজিদে ডাকলেন এবং তারা জমায়েত হওয়ার পর তিনি মিম্বারে উঠে বললেন, আমি আমার ফুপুদের রাখাল ছিলাম এবং আমি যখন ঘরে ফিরতাম, তারা আমাকে মুঠোভর্তি খেজুর অথবা কিসমিস দিতেন এবং আমার এক একটি দুর্বিষহ দিন যেত। তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে পড়লেন। আবদুর রাহমান ইবনে আওফ তাকে বললেন, এই খুতবার কারণ কী? আপনি তো নিজেকে সবার সামনে ছোট করলেন। এতে কী লাভ হলো? 'উমার 🚑 বললেন, তোমার অমজ্ঞাল হোক হে ইবনে আওফ। আমার নফস আমাকে বলছিল, তুমি হলে আমীরুল মু'মিনীন। তোমার থেকে ভালো আর কে আছে? আমি আমার নফসকে শিক্ষা দিলাম সত্যিটা কী।

'উমারকে কেউ বোকা বানাতে পারত না, এমনকি তার নিজের প্রবৃত্তিও না। আবদুলাহ বিন মাসউদ সাহাবিদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—আল্লাহ সাক্ষী, তারা এ উদ্মাহর শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। তারা ছিলেন সবচেয়ে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী (সর্বাধিক তাকওয়াবান)। তাদের ছিল সুগভীর জ্ঞান। তারা কোনো ভণিতা করতেন না। তিনি 'সকল জ্ঞান' বলেননি, বলেছেন 'সুগভীর জ্ঞান'। এর কারণ হলো তারা সরাসরি রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে সেগুলো শিখেছেন।

একজন সাহাবি যদিও এককভাবে ইমাম বুখারি বা মুসলিমের মতো এত বেশি হাদীস জানতেন না, তবুও তাদের জ্ঞান ছিল গভীর। তারা আল্লাহর রাসূল থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোকে নিজেদের জীবনে জীবস্ত রেখেছিলেন এবং কোন হাদীস কী প্রেক্ষাপটে উপস্থিত হয়েছে তার সাক্ষী ছিলেন। তারাই একমাত্র প্রজন্ম যারা প্রকৃতপক্ষে রাসূল ﷺ যা বলেছেন তা শুনেছিলেন এবং জানতেন কেন তিনি তা বলেছেন। কুরআন নাযিলের সময় তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে ওয়াহি গ্রহণ করতে দেখেছেন। জিবরাইল ﷺ যখন মানুষের রূপে হাজির হয়েছেন, তখন তারা তাকে দেখেছেন এবং তার কথা শুনেছেন। সাহাবিরা ছিলেন পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী এবং তাদের জীবন ছিল সাধারণ এবং খাঁটি। তারা এমন এক জাতি, যারা গ্রিক দর্শন বা রোমান ও পারস্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। তাই যখন ইসলাম এল, তারা একে গ্রহণ করে নিলেন এবং কোনো কিছু যোগ না কিরে এর বিশুম্বতম রূপে পালন করলেন।





এক্সট্রা অর্ডিনারি গুণাবলি 🏾

এমনকি ইসলাম আগমনের পূর্বে, জাহিলিয়াতের যুগেও তারা ছিলেন মরুভূমির সাধারণ লোক। তাদের ভাষা কৃত্রিমতা এবং বাহুল্য বিবর্জিত ছিল তাদের কবিতা ছিল সরল এবং বর্ণনাত্মক, রূপক এবং প্রতীকী নয়। হিন্দু বা গ্রিকদের মতো জটিল দর্শন, প্রতীকীবাদ এবং যুক্তিতে পরিপূর্ণ কোনো পৌরাণিক কাহিনি তাদের ছিল না। এমনকি যখন তারা জাহেলিকালে মূর্তিপূজারি ছিলেন, তারা কেবল তার সামনে মাথানত করতেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে কোরবানি দিতেন। এটুকুই। এর পেছনে কোনো জটিল কাহিনি এবং দার্শনিক যৌক্তিকতা ছিল না। এর সজ্যে কোনো পৌরাণিক কাহিনি সংযুক্ত ছিল না।

ইসলাম গ্রহণের সময় তারা তাদের এই স্পষ্টতা এবং সরলতা দীনের কাছে নিয়ে এসেছেন। তারা দর্শন এবং যুক্তিকে এর সঙ্গো যুক্ত করেননি। তারা কুরআন এবং সুন্নাহকে যেভাবে পেয়েছেন সেভাবেই গ্রহণ করেছেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেছেন ও জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারা আয়াতের জটিল কোনো অর্থ খোঁজ করেননি। তারা শুনেছেন এবং মেনে নিয়েছেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

রাসূল বিশ্বাস রাখেন ওই সকল বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। [সূরা বাকারা ২: ২৮৫]

যারা আয়াতের গুপ্ত অর্থ সম্থান এবং জটিল দার্শনিকতা তৈরি করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আর বোধশস্তি সম্পন্নরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। [সূরা আলে ইমরান ৩: ৭]

সাহাবিরা যার ওপর কুরআন নাজিল হয়েছে, সেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছ থেকে সরাসরি কুরআন শিখেছেন। তারাই একমাত্র প্রজন্ম, যারা প্রত্যেকটি ওয়াহি, প্রত্যেকটি আয়াত নাযিলের পরিস্থিতির সাক্ষী। তারা কেবল শব্দের পারিভাষিক অর্থই নয়, এ শব্দগুলো নাযিলের কারণও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ কারণেই মুসলিম আলিমগণ আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে সাহাবিদের উপলম্বিকে কন্টিপাথর বিবেচনা করেছেন। এমনকি ভাষাবিদ্যার ক্ষেত্রেও কোনো বিশেষ শব্দের অর্থ কী হবে—তা চূড়ান্ত হয় কুরআন-হাদীসের আলোকে সাহাবিরা সে শব্দের অর্থ কী বুঝেছিলেন—তার ওপর।





আমি বিশ্বাস করি কেউ যদি তার সহযোগীদের কল্যাণে আগ্রহী হয়, তবে রাসূল ﷺ-এর জীবনীপাঠ খুবই জরুরি এবং বর্তমান পৃথিবীতে সেসময়ের পুনঃসৃষ্টির জন্য সর্বোচ্চ চেঁটা করা উচিত। তবেই আমরা সুবিচার, সমবেদনা, সত্যবাদিতা এবং সহমর্মিতাপূর্ণ একটি পৃথিবী পেতে পারি। বর্তমান সময়ে এগুলোর অভাব প্রকট, ফলে আমরা এমন একটা পৃথিবীতে বাস করছি, যার বৈশিষ্ট্য হলো নিষ্ঠুরতা, উদাসীনতা এবং বৈষম্য। কেমন পৃথিবী আমরা চাই--সেটা আমাদেরই সিম্ধান্ত।

পরিপালন করেছিলেন। সাহাবিদের জীবনে বহু ঘটনা রয়েছে, যেগুলো আমি এমত পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। বর্তমান সময়ের যে কারও জন্য খুবই ভালো পরামর্শ হলো তাদের জীবনী পাঠ করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে বেঁচে থাকা কেমন হতো, তা অনুধাবনের চেষ্টা করা।

ł

তেরে আলাৎ বনং তরে আরু দিয়ের তাই বলেছেন, সে সম্পর্কে লোকে যা-ই ভাবুক না কেনা তন তারা যা বলা দরকার তাই বলেছেন, সে সম্পর্কে লোকে যা-ই ভাবুক না কেনা তন আমাদের জন্য শুধু সাহাবিদের গল্প না শুনে তাদের মতো চরিত্র গঠন ইসলামে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ তাদের মানদণ্ডেই বিশ্বাস ও কর্মের শুম্থতা বিচার করা হবে। আল-ইহসান বলতে সাহাবিরা এটাই বুঝেছিলেন এবং নিজেদের জীবনে তারা এর্ পরিপালন করেছিলেন। সাহাবিদের জীবনে বহু ঘটনা রয়েছে, যেগুলো আমি এখানে পরিপালন ফার্রি কর্মের মাই নাম নর্বমান ক্লাবনে বহু ঘটনা রয়েছে, যেগুলো আমি এখানে

কোনোটিই তাদের ছিল না। সাহাবিদের কাছে শিক্ষার চিহ্ন ছিল সরলতা এবং সুস্পষ্টতা; জটিলতা, প্যাঁচানো যুক্তি এবং দর্শন নয়। তারা কূটনৈতিক ছিলেন না। তারা ছিলেন স্পষ্টবাদী। তারা মানুষের মতামতের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করতেন। তারা মানুষের কাছে অপছন্দনীয় হওয়ার মতামতের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করতেন। তারা মানুষের কাছে অপছন্দনীয় হওয়ার চেয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর কাছে অপছন্দনীয় হওয়াকে ভয় করতেন। তাই তারা যা বলা দরকার তাই বলেছেন, সে সম্পর্কে লোকে যা-ই ভাবুক না কেন। তাই আমাদের জন্য শুধু সাহাবিদের গল্প না শুনে তাদের মতো চরিত্র গঠন ইসলামে অনেক

সংস্পর্শে এসেছে—তখন আবির্ভূত হয়েছে। এ সময়ে ইসলামের মধ্যে দর্শন প্রবেশ করে। সাহাবিরা ছিলেন কর্মমুখী, আল্লাহর সঞ্জে সংযুক্ত এবং তাঁর সঞ্জো সাক্ষাতের ব্যাপারে সচেন্ট। এমন আন্দাজ-অনুমান করা, যা সংযুক্ত এবং তোঁর সঞ্জো সাক্ষাতের ব্যাপারে সচেন্ট। এমন আন্দাজ-অনুমান করা, যা স্ল্যহীন এবং কেবল সন্দেহ সৃষ্টি ও ঈমানকে দুর্বল করে, তার সময় বা আগ্রহ—

সাহাবিদের নিকটতম। ইসলামে বিদআত মাক্কা এবং মাদীনায় শুরু হয়নি। বর্তমান সময়ের সকল দর্শন এবং উচলামে বিদআত মাক্কা এবং মাদীনায় শুরু হয়নি। বর্তমান সময়ের সকল দর্শন এবং জটিল তত্ত্বসমূহ, যা নিয়ে অনেক বইপুস্তক রচিত হয়েছে, তার বেশিরভাগই সাহাবি জটিল তত্ত্বসমূহ, যা নিয়ে অনেক বইপুস্তক রচিত হয়েছে, তার বেশিরভাগই সাহাবি জটিল তত্ত্বসমূহ, যা নিয়ে অনেক বইপুস্তক রচিত হয়েছে, তার বেশিরভাগই সাহাবি মুগের অনেক পরে—যখন ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে এবং কন্টিক খ্রিস্টান ও হিন্দুত্ববাদের যুগের অনেক পরে—যখন ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে এবং কন্টিক খ্রিস্টান ও হিন্দুত্ববাদের

সময়ের, তারপর যারা তাদের পরবতা...। হাদীস বিশারদগণ বলেন, এ শ্রেষ্ঠত্ব ক্রম এবং আদর্শ—উভয়ক্ষেত্রেই। যার মানে হলো হাদীস বিশারদগণ বলেন, এ শ্রেষ্ঠত্ব ক্রম এবং আদর্শ হাদীস বিশারদগণ বলেন, এ শ্রেষ্ঠত্ব ক্রম এবং আদর্শ হাদীস বিশারদগণ বলেন, এ শ্রেষ্ঠত্ব ক্রম এবং আদর্শ

নিডারশিপ নেমনস এ কারণে রাসূল ﷺ তাঁর বিখ্যাত হাদীসে তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছিলেন—সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, অতঃপর যারা তাদের পরবর্তী করে বলেছিলেন—সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, অতঃপর যারা তাদের পরবর্তী

এক্সট্রা অর্ডিনারি গুণাবলি

মাক্বা থেকে মাদীনায় হিজরাত

মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাক্বা থেকে মাদীনায় গমন বা হিজরাতের ঘটনা স্মরণ করার জন্য কিছু সময় ব্যয় করা যেতে পারে।

ইসলামের ইতিহাসে মার্ক্বা থেকে মাদীনায় হিজরাতের ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'উমার ইবনুল খাত্তাবের সময়ে যখন হিজরি সাল কোন তারিখ থেকে গণনা করা হবে, তা নির্ধারণের প্রয়োজন হলো, সাহাবিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম বা মৃত্যুদিবসকে বাছাই না করে হিজরাতের তারিখটিকেই বাছাই করলেন। পৌত্তলিকতার ভূমি থেকে তাওহীদের ভূমিতে অভিবাসনের দিনটিকে বেছে নিলেন। এর প্রতীকী অর্থ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির ওপরে আল্লাহর ইচ্ছাকে গ্রহণের সিম্থান্ত নিল এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে চলার মধ্যেই কেবল মুক্তি এবং সফলতা নিহিত মেনে নিয়ে নিজেকে সমর্পণ করল, সে যেন নতুন জীবন শুরু করল।

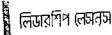
থিজরাত আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো, এ সময়েই রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর উদ্মাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই মুসলমানরা একক রাফ্ট হিসেবে জাতীয়তা, গোত্র বা বর্ণের ভিত্তিতে নয়; বরং বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি সেসময়েই শতবর্ষের গোত্রীয় এবং জাতীয়তার বন্ধন মুছে গিয়ে বিশ্বাসের ভিত্তিতে নতুন বন্ধন স্থাপিত হয়। সেটা এমন এক মুহূর্ত, যখন ভাতৃত্বের কারণ প্রতিষ্ঠিত হলো। এক আল্লাহর ইবাদাত এবং তাঁর রাস্ল ﷺ-এর অনুসরণ করাই হলো এখানে অন্তর্ভুক্তির একমাত্র শর্ত। খুবই দুঃখের বিষয়, মুসলমানরা বর্তমানে কেবল হিজরি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করাই বন্ধ করেনি, রাসূল ﷺ বন্ধনের যে সকল ভিত্তি মুছে ফেলেছিলেন, সেগুলো পুনরায় আঁকড়ে ধরেছে। এর ফলাফল পরিষ্কার।

আয়িশা 🐲 বলেন, একদিন দুপুরে আমরা একজন লোককে আমাদের বাড়ির দিকে আসতে দেখলাম, তার মুখ ছিল আবৃত। যখন তিনি সামনে এলেন, আমার পিতা তাকে চিনলেন। তিনি বললেন, জরুরি না হলে মুহাম্মাদ এ সময় আসতেন না। তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং আমার পিতাকে বললেন, দয়া করে সবাইকে এই স্থান ত্যাগ করতে বলুন। আবু বাক্র 🚓 বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, এখানে আপনার পরিবারের বাইরের কেউ উপস্থিত নেই।

সীরাতের প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা অপরিহার্য। বন্থুতের কোন পর্যায়ে আপনার বন্থু আপনার ঘরে প্রবেশ করতে পারে এবং বলতে পারে—দয়া করে সবাইকে এ জায়গা ত্যাগ করতে বলুন এবং প্রতিউত্তরে—হে আল্লাহর রাসূল, এখানে আপনার পরিবারের বাইরে কেউ নেই—এমন জ্বাব আসে! আবু বাক্র সিদ্দীক ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটতম বন্ধু, যারা একে অপরকে যে কারও চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তাদের এই ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের শিকড় ছিল গভীর এবং এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ তারপর বললেন, আমাকে মার্কা ত্যাগ এবং হিজরাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবু বাক্র 🚓 প্রশ্ন করলেন—আমি কি আপনার সজ্জী হতে পারি?





রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। আবু বাক্র 🐗 আনন্দে কাঁদতে শুরু করলেন। আয়িশা 🥮 বলেন—আনন্দে কেউ এভাবে কাঁদতে পারে, তা সেদিন আমার পিতার কানা না দেখলে চিন্তাই করতে পারতাম না!

এই অভিযাত্রা ছিল বিপদের; কিন্তু আবু বাক্র ﷺ রাসূল ﷺ-এর সাথি হতে পেরে খুবই খুশি হলেন। রাসূল ﷺ আবু বাক্রকে দুটো উট প্রস্তুত করতে বললেন। আবু বাক্র ﷺ জানালেন, আমি ইতোমধ্যেই প্রস্তুত করে রেখেছি হে আল্লাহর রাসূল। আমার মনে হচ্ছিল যে, আপনার রব আপনাকে মার্কা ত্যাগের অনুমতি দেবেন, তাই আমি উটেগুলোকে প্রস্তুত করে রেখেছি। রাসূল ﷺ বললেন—তবে হাাঁ, আমি ওগুলোর মূল্য পরিশোধ করব।

আবু বাক্র 🞄 বললেন, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে তা-ই আমার নিকট আনন্দের। এটা আতিথিয়তার মৌলিক নীতি। অতিথিকে যা সন্তুষ্ট করে, তা করা এবং নিজের ইচ্ছাকে অতিথির ওপর চাপিয়ে না দেওয়া।

রাসূল ﷺ হজরত আলি ইবনু আবি তালিবকে নিজ বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন এবং তাঁর কাছে রক্ষিত আমানাত প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আলি 🚓 যথাযথভাবে তা পালন করলেন। রাসূল ﷺ-এর সাথি বা সাহাবিদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল—আল্লাহর রাসূলকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া। তারা কখনোই নিজের এবং তাদের পরিবারের উধ্বের্ রাসূল ﷺ-এর স্বৃস্তি এবং নিরাপত্তার জন্য কিছু করতে দ্বিধা করতেন না। তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল ছিলেন যেকোনো কিছুর চেয়ে প্রিয় এবং মৃল্যবান, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও।

গ্রেফতার এড়াতে মুহাম্মাদ ﷺ এবং আবু বাক্র ﷺ ঘুরপথে মার্কা ত্যাগ করলেন। কখনো আবু বাক্র ﷺ মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগে থাকলেন, কখনো পিছনে। তাকে জিঞ্জেস করা হয়েছিল, কেন তিনি এরূপ করলেন। তিনি বলেন, যখন আমি সামনের দিক থেকে বিপদের উপস্থিতি টের পেতাম তখন সামনে থাকতাম এবং যখন পেছন থেকে বিপদের আশঙ্কা করতাম, তখন পেছনে চলতাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কী নিজের ক্ষতি হতে দিতে নাকি আমার? তিনি বললেন, আমার হে আল্লাহর রাসূল। তাঁরা গারে সাওরে সৌঁছলেন। আবু বাক্র 🚓 গুহার ভিতরে গিয়ে দেখে এলেন গুহাটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য নিরাপদ কিনা। তারা সেখানে রাতযাপন করলেন বটে; কিন্তু তখনো নিরাপদ দূরত থেকে অনেক দূরে।

মাক্কার কুরাইশরা তাঁদের অভিযাত্রা বুঝতে পারল এবং তাদের বন্দি কিংবা হত্যার জন্য পিছু নিল। আবু বাক্র الله -এর গোলাম তাঁদের পদচিষ্ণের ওপর দিয়ে একপাল ভেড়া চড়িয়ে দিলো—যেন তাঁরা কোন দিকে গিয়েছে, মরুভূমির বালুতে তার পরিম্কার ছাপ না থাকে; কিন্তু আরবরা হরিণ এবং খরগোস শিকারি, সুতরাং এর জন্য তাদের খুব বেশি একটা চিষ্ণের দরকার হলো না। শেষপর্যন্ত তারা গুহার কাছে পৌঁছে গেল এবং গুহার প্রবেশমুখে এমন জায়গায় দাঁড়াল যে, আবু বাক্র 🚓 তাদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—হে আল্লাহুর রাসল জোরা ক্লিকে জাকালেই আমাদের



এক্সট্রা অর্ডিনারি গুণাবলি

দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবু বাক্র, এমন দুজনের ব্যাপারে কী ধারণা—যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ? রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সম্পূর্ণ শান্ত এবং মোটেও ভীত নয়; বরং তিনি আবু বাক্রকে যা বললেন, তা পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা আলা নাযিল করেন,

যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তাঁর সাহায্য করেছিলেন, যখন তাঁকে কাফিররা বের করে দিয়েছিল, তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সজ্ঞীকে বললেন দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত, আল্লাহ কাফিরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবা ৯: ৪০]

আল্লাহর রাস্লের সঞ্জো আবু বাক্রের বিশেষ সম্পর্ক ছিল সবার কাছে ঈর্ষণীয়। আগুন যেমন লোহাকে গলিয়ে সম্পর্ককে দৃঢ় করে তোলে, তাদের বন্ধুতুও তেমনি বিপদ আর কন্টের মাধ্যমে মজবুত হয়েছে। 'উমার ইবনুল খান্তাব খলীফা থাকাকালীন একদিন শুনতে পেলেন—লোকেরা আবু বাক্র এবং 'উমারের মধ্যে কে অধিকতর মর্যাদাবান— তা নিয়ে আলোচনা করছে। তিনি তাদের কাছে ছুটে গেলেন এবং বললেন, আবু বাক্রের জীবনের একদিন 'উমারের গোটা জীবনের চেয়ে উত্তম। সাহাবিদের মধ্যে আবু বাক্রের মর্যাদার অনেক নিদর্শনের এটি একটি।

তিনি ছিলেন সুভাবগত নেতা, বিদ্বান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরামর্শক এবং এমন ব্যক্তি যাকে তারা রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর আমীর হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। তাকে বলা হতো খলিফাতু রাসূলিল্লাহ। এই উপাধি কেবল তার জন্যই প্রযোজ্য ছিল এবং আর কাউকে এই খেতাব দেওয়া হয়নি। আবু বাক্র 🚓 তাদের শাইখ ছিলেন, কারণ রাসূল ﷺ তাকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন।

তাঁরা গুহায় ছিলেন তিনদিন। আবদুল্লাহ বিন আবু বাক্র 🚓 সারাদিন মাক্কায় তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং রাতে গুহায় এসে তাদের সঞ্চো রাত কাটাতেন। তিনি সন্ধ্যায় যাওয়ার সময় আবু বাক্রের ভৃত্য আমের বিন ফুহাইরাকে দিয়ে দুধ সংগ্রহ এবং তার পদচিহ্ন মোছার জন্য একপাল ভেড়া চড়িয়ে নিয়ে যেতেন। আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিত তাদেরকে ঘুরপথে মাদীনা নিয়ে যাওয়ার পথপ্রদর্শক ছিল। সে মুসলিম ছিল না; তবে রাসূলুল্লাহকে সহযোগিতা করতে রাজি ছিল।

কুরাইশরা মুহাম্মাদ ﷺ এবং আবু বাক্রের প্রত্যেকের জীবিত অথবা মৃত মাথার মূল্য ১০০ উট পুরস্কার ঘোষণা করল। আদিবাসী সমাজে উট হলো আয়-রোজ্ঞ্গার এবং সামাজিক মর্যাদার উৎস, তাদের জন্য এটা ছিল বিশাল পুরস্কার। আল্লাহর রাসূলের শত্রুপক্ষের একজন সুরাকা বিন মালিক, সে তার গোত্রের লোকদের সঙ্গো বসে ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জানাল সে দুজন লোককে দেখেছে এবং ধারণা করছে তারা মুহাম্মাদ এবং আবু বাক্র হতে পারে। সুরাকা ইচ্ছা করেই লোকটিকে উপহাস করল



লিডারশিপ নেজনজ

এবং বোঝাল তার ভুল হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই পুরস্কারটি নিতে চাচ্ছিল। লোকটি চলে গেলে সুরাকা সন্তর্পণে সজ্ঞীদের পরিত্যাগ করল এবং নিজের অস্ত্র ও বাহন প্রস্তুত করল। কেউ যেন খেয়াল না করতে পারে, এজন্য সে বর্শা নিচু করে নীরবে লোকটির নির্দেশিত পথের দিকে যাত্রা করল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে সামনে এগিয়ে চলছিলেন। আবু বাক্র 4% পিছনে তাকিয়ে সুরাকাকে দেখতে পেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে জানালেন এবং তিনি দু'আ করলেন। সুরাকার ঘোড়া বালিতে আটকে গেল এবং সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। সে খুবই অবাক হলো। এমন কেউ যে ঘোড়ার পিঠেই বড় হয়েছে, তার জন্য ঘোড়া থেকে পরে যাওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিক নয়। সে আবার ঘোড়ায় চড়ে বসে ছুটে চলল এবং রাসূল ﷺ আবারও দু'আ করলেন আর সুরাকার ঘোড়া বালিতে আটকা পড়ল এবং সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। সুরাকা আরও একবার বাহনে উঠে বসে রওয়ানা হলো; কিন্তু এবার তার মুখে বালি পড়ল এবং সে পুনরায় ঘোড়া হতে পড়ে গেল। সুরাকা বুঝতে পারল, বিষয়টি অতিপ্রাকৃতিক কিছু এবং সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মত হলেন। সুরাকা লিখিত দিতে অনুরোধ করল। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবদুল্লাহ বিন উরাইকিতকে লিখে দিতে বললেন এবং সুরাকা সেই নিরাপত্তাপত্রকে সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখলেন। বহু বছর পর যখন রাসূল ﷺ তায়েফ অবরোধ করলেন, তখন সুরাকা গ্রেফতার হলে সে এই দলিল দেখিয়ে নিজের জীবন বাঁচিয়েছিল। রাসূল ﷺ সুরাকাকে বলেছিলেন, সে যেন কুরাইশদের নিবৃত্ত করতে চেন্টা করে এবং সুরাকাও তার কথা রেখেছিল।

মুহাম্মাদ ﷺ, আবু বাক্র ఉ এবং তাদের পথপ্রদর্শক চলতে লাগলেন। দৃশ্টি কল্পনা করুন। মরুভূমিতে তিনজন মানুষ, গ্রীমের উপচে পড়া গরমে পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে চলছে, তাদের তাড়া করে আসছে শত্রুরা, যারা তাদেরকে হত্যা করতে চায়। আজ আমরা হিজরাতকে এক বাক্যে উপস্থাপন করি—তিনি মাক্বা থেকে মাদীনায় মাইগ্রেট করলেন—যার মধ্যে সেই যাত্রার প্রকৃত কোনো মর্যাদা বা উপলম্বি অনুভূত হয় না। তাদের কন্ট, ক্ষুধা-তৃয়া ও নিরাপত্তাহীনতা এবং আল্লাহর রাস্ল ﷺ-এর ধৈর্য ও সাহস—সবই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যক্তিগত সাহস নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অনুষজা এবং রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে সাহসী আর কেউ ছিল না। জীবনের পুরোটা সময়ে তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন।

চলতে চলতে তারা একটি মেষপালকের শিবিরে এসে পৌঁছালেন। এ ধরণের ছাউনি বা শিবির আজও আরব দেশে দেখতে পাওয়া যায় যেখানে মেষপালক তার পরিবার এবং মেষগুলো নিয়ে বসবাস করে। মেষপালক মেষগুলোকে চড়াতে নিয়ে যেত এবং তার অনুপশ্বিতিতে তার স্ত্রী ছাউনিতে থাকত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাথিরা যখন সে ছাউনিতে পৌঁছালেন, তখন সেখনে ছিলেন উম্মু মা'বাদ। রাসূল তাকে বললেন—আপনি কি আমাদের কিছু খেতে দিতে পারেন? তিনি জ্বাব দিলেন—যদি খাবার মতো কিছু থাকত, তবে আপনাকে চাইতে হতো না। অতিথির আপ্যায়ন করা মরুভূমির আদিবাসী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। রাসূল ﷺ





Compressed with PDF Compressor by বিশ্বী অর্তিনরি গুঁণাবলি

উম্মু মা'বাদের তাঁবুর কোনায় রোগামতো একটি ভেড়া দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, আপনি কি আমাকে ওই ভেড়ার দুধ দোহনের অনুমতি দেবেন? তিনি বললেন, যদি ওটা কোনো কাজের হতো, তাহলে সেটা অন্যগুলোর সঙ্গো ঘাস খেতে যেত। এর ওলানে কোনো দুধ নেই; কিন্তু রাসূল ﷺ জোর করলেন, তাই তিনি তাঁকে ভেড়া থেকে দুধ দোহনের অনুমতি দিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে ছাউনির সবচেয়ে বড় পাত্রটি নিয়ে আসতে বললেন। উম্মু মা'বাদ বিস্মিত হলেও সবচেয়ে বড় পাত্রটি নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান হাতে ভেড়াটির পেছনে চাপড় দিয়ে দুধ দোহন করতে শুরু করলেন এবং পাত্রটির কানায় কানায় ভর্তি হওয়া পর্যন্ত দুধ প্রবাহিত হলো।

আল্লাহর রাসূল ﷺ উম্মু মা'বাদের হাতে পাত্রটি দিয়ে পেট ভর্তি করে খেতে বললেন। তার শেষ হলে তিনি পাত্রটি আবু বাক্রকে দিলেন এবং তারপর পথপ্রদর্শককে খেতে দিয়ে সবশেষে নিজে খেলেন। সবার খাওয়া শেষ হলেও দেখা গেল পাত্রে দুধ রয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্পর্শে এমনই বারাকাহ ছিল।

সে রাতে স্বামী ফিরে এলে উম্মু মা'বাদ বিকেলে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে যে ভাষায় রাসূল ﷺ-এর বর্ণনা করেছিলেন, তা শত শত বছর ধরে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে। উম্মু মা'বাদ বলেছিলেন,

'আমি সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার মিশেলের এক ব্যক্তিকে দেখেছি। প্রদীপ্ত চেহারা, রুচিবান ব্যক্তিত্ব; না কৃশকায় আর না স্থ্লকায়, না খর্বকায় না দীর্ঘকায়, সুদর্শন, চোখের কালো অংশটি গভীর কালো আর সাদা অংশটি উজ্জ্বল সাদা। ঈষৎ কোঁকড়ানো চুল। কণ্ঠসুর মিন্টি, দীর্ঘ গ্রীবা, নিবিড় দাড়ি। চিকন কিন্তু লম্বা ও জ্রোড়া লু। যখন চুপ থাকেন তখন অত্যন্ত গুরুগঞ্জীর, আর যখন কথা বলেন তখন মাথা উঁচু করে বলেন। দূর থেকে তিনি অত্যন্ত সুদর্শন আর কাছ থেকে আরও প্রদীপ্ত। মিন্টভাষী; না অনর্থক, না গোঁজামিল; বরং একটা পরিমিতিবোধ পরিলক্ষিত হয় তাঁর কথায়। মালার সুতা হেড়ে দিলে একটার পর একটা দানা যেভাবে আলাদা আলাদা করে বেরিয়ে আসে, তাঁর কথাগুলো সেভাবে পরিস্ফুটিত হয়। তিনজনের মধ্যে দেখতে তিনিই সবচেয়ে প্রাণবন্ত, আর আকারে সবচেয়ে সুন্দর। সজ্ঞী-সাথিরা তাঁকে আগলে রাখেন চারপাশ থেকে। যখন কথা বলেন, তারা মন দিয়ে শোনে। আদেশ করলে সেটা পালনে উঠেপড়ে লাগে। বিরন্ত নিয়ে ভু কুঁচকে থাকেন না, অজ্ঞতা কিংবা নির্বুম্খিতার কোনো ছাপ তাঁর মাঝে নেই।' আবু মা'বাদ বলেন, 'আল্লাহর কসম, তিনি কুরাইশদের সেই লোক; তাঁর সম্পর্কেই আমাদের বলা হয়েছে। আমার অভিপ্রায় তাঁর সজ্ঞী হব। যেকোনোভাবেই আমি তাঁর

সজ্জো মিলিত হব।'

মুসলমানদের হৃদয়ে মাদীনার প্রতি ভালোবাসা তৈরির জন্য রাসূল দু'আ করলেন—হে আল্লাহ, আমাদের হৃদয়ে মাদীনার প্রতি ভালোবাসা মাক্বার মতো কিংবা তারচেয়েও বেশি করে দিন। মাদীনায় বারাকাহ দানের জন্যও রাসূল দু'আ করলেন,

হে আল্লাহ, তুমি মাদীনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও। যেমনিভাবে প্রিয় করেছ মাক্তাকে; বরং তারচেয়েও বেশি প্রিয় করো। [সহীহ বুখারি: ১৮৮৯, সহীহ মুসলিম: ৩৪০৮]



লিডারশিপ লেমনস

মাদীনা দাজ্জাল থেকে সুরক্ষিত। অন্যায় হত্যাকাণ্ড থেকে মুক্ত। বৃক্ষনিধন, অস্ত্রবহন নিষিন্ধ। মাদীনায় দুঃখ-কন্টে ধৈর্য ধারণের জন্য রয়েছে বিশেষ পুরস্কার।

মাদীনা ছিল নিচু ভূমি। শীতের সময় এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ত। মার্কা থেকে আগত সাহাবিরা অসুস্থ হয়ে পড়তেন, এমন অনভ্যস্ত ও বৈরী পরিবেশে বসবাস করা তাদের জন্য খুব কঠিন হতো। এ কারণে রাসূল বললেন, যে ব্যক্তি মাদীনার কন্ট ও বালা-জন্য খুব কঠিন হতো। এ কারণে রাসূল বললেন, যে ব্যক্তি মাদীনার কন্ট ও বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামাতের দিন আমি তার তার জন্য শাফায়াত করব। মাদীনায় যারা আন্তরিক, তাদের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন। 'উমার ইবনুল খাত্তার মাদীনায় শাহাদাতবরণের জন্য দু'আ করতেন। একদিন তিনি মাসজিদে নববিতে ক্ষ মাদীনায় শাহাদাতবরণের জন্য দু'আ করতেন। একদিন তিনি মাসজিদে নববিতে ফজরের সালাত পড়াচ্ছিলেন, একজন খ্রিস্টান তাকে ছুরিকাঘাত করে। তিনি শাহাতাদের ফজরের সালাত পড়াচ্ছিলেন, একজন খ্রিস্টান তাকে ছুরিকাঘাত করে। তিনি শাহাতাদের মাম্বি মুধা পান করেন। চেয়েছেন মাদীনায় শহীদ হবেন, আল্লাহ একেবারে মাসজিদে অমিয় সুধা পান করেন। চেয়েছেন মাদীনায় গাহীদ হবেন, আল্লাহ রাসূল বলেন, যারা মাদীনাবাসীর বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করে, আল্লাহ তাদেরকে অদৃশ্য করে দেন—যেভাবে লবণ পানিতে গলে অদৃশ্য হয়ে যায়। মাদীনা পবিত্র, তাই এখানে গাছ কাটা, পশুহত্যা, লড়াই এবং অস্ত্রবহন নিষিশ্ব।

হিজরাতের ঘটনা ইসলামে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামিক ক্যালেন্ডার গণনা এখান থেকেই শুরু হয়েছে। এটা বোঝার জন্য এ ভ্রমণের কিছু বিষয় পাঠ করা অত্যাবশ্যক। আগেই বলেছি, এটা ছিল বহু-ঈশ্বরবাদ এবং দুর্নীতির ভূমি থেকে সেই ভূমিতে রাসূলুল্লাহ এর পরিভ্রমণ, যা তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান এবং তাঁর বাণী প্রচারের কাজে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাঁর নিজের জন্ম বা মৃত্যু তারিখকে ক্যালেন্ডারের সূচনা তারিখ বিবেচনা করা হয়নি। ইসলাম যে কাজের ধর্ম এবং সব কাজের সেরা হলো আলাহর নির্দেশনা অনুসরণ করা, অসম্ভব বা কঠিন—এমন স্থান থেকে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। সম্ভব—এমন স্থানে গমন করা, ইত্যাদি বিষয়গুলোর ইজ্যিত পাওয়া যায় এ হিজরাতের বিস্তীর্ণ ঘটনা ও ব্যাখ্যায়।

হিজরাতের ধারণার মধ্যে এ কারণে প্রতীকী এবং আক্ষরিক উভয় অর্থই রয়েছে। প্রতীকী অর্থে আল্লাহ যা অপছন্দ করেন—তা পরিত্যাগ করে যা পছন্দ করেন, তা গ্রহণ করা হলো হিজরাহিজরাত। হিজরা হলো নিজের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আনা, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল এর আনুগত্যকে প্রতিফলিত করে রচিত হয়। হিজরা হলো পাপ থেকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হিজরাত। এই ধরনের হিজরাত, সচেতনভাবে সব ধরণের অবাধ্যতা থেকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। আক্ষরিক অর্থে হিজরাত হলো মন্দ স্থান থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া। নিখুঁত বলে কোনো জায়গা নেই, এমন চিন্তার মাধ্যমে শয়তান আমাদের থামিয়ে দিতে চায় যথাযথ পরিপালনকে অসম্ভব করে তোলে। আমাদের প্রত্যেকের কী করা উচিত, সে বিষয়ে নিজেদেরই সিম্থান্ত নেওয়া নিয়ে কাজে নেমে যেতে হবে।





Compressed with PDF Compressor by PI M Infosoft এডিনারি গুণাবলি

জনপদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কয়েকজনকে হত্যা পর্যন্ত করেছে দুখ্কৃতিকারীরা। নবি ছিলেন না, এমন বহু ব্যক্তি যারা সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, তাদেরকে হত্যা করে আল্লাহর নামের উচ্চারণ থামিয়ে দিতে চেন্টা করা হয়েছে। সত্যের এই বিরোধিতা এখনো ভয়াবহ গতিতে চলমান। ওয়ারাকা বিন নওফেল নবুওয়াতের ঘটনা শুনে এই বিরোধিতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এ কারণেই হিজরাহিজরাতের পুরস্কার এত বেশি।

কুরআনকে আল-ফুরকান বলা হয়। কারণ এটি সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে। বদরযুম্বকে একই কারণে আল-ফুরকানও বলা হয়। ইসলাম এসেছে সত্য প্রচার করতে এবং মিথ্যাকে নিষিম্ব করতে। যেন সকল মানুষ একটি নৈতিক সমাজে শান্তি-সুখে মিলেমিশে বসবাস করতে পারে। শয়তান ও তার অনুসারীরা এর বিরোধিতা করে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। এই সংগ্রাম আদ্যিকালের। ইসলাম সব সময়ই তার অনুসারীদের সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে বাছাই করতে বলে। তাই কল্যাণের পথে আমাদের সর্বদা নিরত থাকা উচিত।

মুহাম্মাদ-ই সেই ব্যক্তি, যিনি এই বিশ্বব্র্য়াণ্ডের একক এবং একমাত্র স্রন্টার কাছ থেকে সমগ্র মানবজ্রাতির জন্য ভালোবাসা, দয়া ও ক্ষমার বাণী নিয়ে এসেছেন।

নিজের চোখে দেখা বিবরণ বলি

হাজ্জের সফরে আমরা। শহরের নিকটবর্তী হতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাওযা মাসজিদে নববির মিনার দেখতে পেলাম। রাসূল যে পথ ধরে মাদীনায় হিজরাত করেছিলেন, সে একই পথ ধরে আমরা চলছি। সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ আলে সৌদ মাক্বা থেকে মাদীনায় যাওয়ার মহাসড়ক নির্মাণের সময় রাসূলুল্লাহ-এর হিজরাহিজরাতের রাস্তা হুবহু অনুসরণ করার ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন। রাস্তাটি সহজতম ছিল না এবং অনেকগুলো গিরিখাদ অতিক্রম করতে হয়েছিল, ফলে বিশাল পরিমাণ ব্যয়ে এটি নির্মিত হয়। বর্তমানকালে মুসলমানরা খুব সহজে সে পথ অনুসরণ করতে পারে, যা রাসূল কন্ট ও ত্যাগের নযরিয়া স্থাপন করে চৌদ্দশো বছর আগে করেছিলেন। আমরা এয়ার কন্তিশনের আরামে ভ্রমণ করি, আর রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর সাথিরা সে পথে পায়ে হেঁটেছেন, গিরিখাদের খাড়া প্রান্ত ধরে উঠেছেন-নেমেছেন। এ গিরিখাদগুলোর ওপর স্থাপিত কোনো একটি সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে যেকেউ খাদের গভীরতা অনুমান করে আসতে পারেন। নবিজির জীবন সহজ ছিল না, তিনি ছিলেন খৃব কর্ম্ঠ একজন মানুষ, একজন যোম্থা, একজন ব্যক্তি, যিনি নিজ লক্ষ্যের প্রতি সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবন্ধ।

আগেই বলেছি, তাঁর সীরাতে খুব সহজভাবে লেখা হয়: তিনি মাক্বা থেকে মাদীনায় স্থানান্তরিত হলেন। এ ছোট বাক্য স্থানান্তর (মাইগ্রেট) শব্দের অর্থ—শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার সামান্যটুকুও প্রকাশ করে না। এর অর্থ বাস্তুভিটা, পিতৃভূমি, নিজ্ব শহর ত্যাগ করা। গোষ্ঠীবন্ধ সমাজে নিজের জন্মভূমি থেকে উৎখাতের চেয়ে বড় কোনো শাস্তি হতে পারে না। কোনো উপজাতি তার সবচেয়ে খারাপ অপরাধীর ক্ষেত্রেও

লিডারশিপ লেজনজ

গোত্রের নিরাপত্তার বাইরে রাখার এ সিম্ধান্ত গ্রহণ করে না। অথচ তারা মুহাম্মাদ ﷺ -এর ক্ষেত্রে এই কাজটিই করল। যিনি জীবনে বিন্দুবিসর্গও অপরাধ করেননি, তাঁর ঘাড়ে হত্যার হুলিয়া ঝোলাতে অথবা তাঁকে বিতাড়িত করতে তাদের সামান্য বিবেক নড়ল না।

গোত্রের প্রতি আনুগত্য সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এমনকি ন্যায়বিচার এবং নিরপেক্ষতার চেয়েও। সে যুগের গোত্রীয় সমাজে জ্ঞাতিজনকে সহযোগিতা করতে হতো; ভুল বা শুম্ব যা-ই হোক না কেন। বহু বছর পরে রাসূলুল্লাহ এ ঐতিহ্যকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োগ করেছিলেন।

তিনি বলেন: তোমার ভাইকে সহায়তা করো, সে ভুল বা সঠিক যা-ই হোক। তাঁর সাথিরা জিজ্ঞেস করলেন, সে যদি সঠিক হয়, তবে তাকে সহায়তা করার ব্যাপারটি আমরা বুঝতে পেরেছি; কিন্তু ভুল হলে কীভাবে সহায়তা করব? তিনি জবাব দিলেন, তার ভুল কাজ বন্ধ করার মাধ্যমে তাকে সহায়তা করবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন। যদি তুমি তার মন্দ কাজ বন্ধ কর, তবে তুমি তাকে সহায়তা করলে। অথচ এই নবিজির নিজ গোত্র সকল সহায়তা তুলে নিল। তিনি কোনো ভুল করেছেন এ কারণে নয়; বরং তিনি তাদের সহায়তা করতে চেন্টা করছিলেন, এতে তারা খেপে গেল। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বর্তমানেও মানুষ সে অজ্ঞতার যুগে ফিরে গেছে; যেখানে বর্ণ, জাতীয়তা, গোত্র প্রভৃতি সত্য ও ন্যায়বিচারে আগে গুরুত্ব পায়। অবিচার নির্যাতনের এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে মুহাম্মাদ ৠ্র-এর শিক্ষা মানুযের পথ দেখানোর বাতিঘর হয়ে আপন বিভায় আলো জ্বালতে থাকে।

পৃথিবীর নিয়ম বড়ই অন্তুত, এর পরিবর্তন হয় না। যে বার্তাবাহক তোমার মুক্তির বার্তা বয়ে এনেছেন, তাকে হত্যা করো—এই নিয়ম আজও চলছে।

সুতরাং মাইগ্রেশন বা হিজরাত সত্যিকার অর্থে শুধু অভিবাসন নয়, এটা তাঁর সবচেয়ে ভালোবাসার জায়গা থেকে উচ্ছেদ হওয়া। যেখানে তাঁর একটি পরিচিতি ছিল, যার প্রত্যেকটি জায়গা তিনি চিনতেন, প্রতিটি ঘর, টিলা, উপত্যকার সঙ্গো তাঁর স্মৃতি জড়িত। এমন স্থান, যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং জীবনের তেপ্পান্নটি বছর পার করেছেন। এখানে তিনি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হজরত খাদিজা ক্র-কে বিবাহ করেছিলেন, যিনি তাঁর সন্তানদের জন্ম দিয়েছেন। তাঁর দুর্দিনে সহায় ছিলেন। এখানেই তিনি তাঁর আশ্রয়দাতা চাচা আবু তালিবের মৃত্যুশোকে কাতর হয়েছিলেন, মুষড়ে পড়েছিলেন প্রিয়তমা সহধর্মিণী সাইয়িদুনা খাদিজাতুল কুবরা ক্র-এর মৃত্যুতে। মাক্বা হলো সেই স্থান, যেখানে তাঁর সন্তানদি জন্মগ্রহণ করেছে, বড় হয়েছে। তারপরও তিনি মাক্বা ত্যাগ করলেন। সেখানে তাঁর কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল এবং বিরোধীরা দিনে দিনে আরও নির্মম ও নিকৃষ্ট হয়ে উঠছিল। এ কারণেই রাস্লুল্লাহ বলেছেন, সকল নবিকেই বিরোধিতা ও নির্যাতন সহা করতে হয়েছে এবং আমি সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত। মানুযের এই প্রবণতার কথা মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমেও উল্লেখ করেছেন। মানুয ইতিহাসে এমন সব মানুয়কেই বেশি নির্যাতন করেছে, যারা তাদেরকে সত্য ও কল্যাণের পথে আহ্বন করেছে। সূরা ইয়াসিনে আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

। আফসোস মানুষের জন্য। এমন কোনো নবি তাদের কাছে আসেনি, যাকে তারা

98



। ঠাট্টাবিদ্রুপ করেনি। [সূরা ইয়াসিন: ৩০]

হিজরাত বলতে নিজের পরিবারকে এমন স্থানে ফেলে আসাকেও বোঝায়, যেখানে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়। এর মানে নিজের সহায়সম্পত্তি বলতে যা কিছু আছে, তা ফেরত পাওয়ার আশা না করে ফেলে আসা। এর বাস্তবতা হলো বছরের গরমকালে মরুভূমির ওপর ৪৫০ কিলোমিটার পথ মাড়িয়ে চলা, পেছনে তাড়া করে আসছে পুরস্কারলোভী শিকারীরা; কারণ তাঁর মাথার জন্য ১০০ উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে তাঁরই গোত্রের লোকেরা। এ পুরস্কারের পরিমাণ বিশাল, এ কারণে বহু মানুষ তাঁর বিরুম্থে অবস্থান নিয়েছে। মাক্বা থেকে মাদীনায় হিজরাত ছিল তাঁর বিগত ১৩ বছরের নবিতৃ ও সংগ্রামের পর্যালোচনা।

আমরা সমান্য কিছু সফলতা ছাড়া কেবল ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা দেখতে পাই। এটি একজন নবির জন্য খুবই হুদয়বিদারক ব্যাপার। নবিদের হুদয় তাঁদের রবের সঞ্জো সম্পর্কের ভিত্তিতে মজবুত হয়। তাদের জীবন আমাদেরকে কন্টসহিষ্ণু হতে শিক্ষা দেয়। কঠিন ও রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার শক্তি যোগায়। সফলতার দৃশ্যমান কোনো সম্ভাবনা না দেখা সত্ত্বেও শতভাগ আস্থা নিয়ে কাজ করে যাওয়ার সাহস যোগায়।

মাদীনার নিকটবর্তী হলে রাসূল কী দেখতে পেয়েছিলেন আমি তা কল্পনা করার চেন্টা করলাম। আমরা এখন যে বিশালাকৃতির উঁচু দালানগুলো দেখতে পাই, তা তো অবশ্যই নয়। তিনি হয়তো কেবল বালু আর খেজুরগাছ দেখতে পেয়েছেন, গাঢ় সবুজ্ব রঙের গাছ বাতাসে দুলে দুলে তাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। দূরে, মাটির তৈরি ঘরের নগরীটি দেখা যায়, যা তাঁর বাণী প্রচারের কেন্দ্রস্থল হতে যাচ্ছে। ছোট্ট সেই নগরটি এখন সম্পূর্ণই াঁসজিদে নববির সুন্দর অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহর বিজ্ঞতার কী অপূর্ব নিদর্শন, রাসূল যে মাটিকে বিশ্বাস করেছেন, হেঁটেছেন, তার প্রতিটি ইঞ্চি এখন সিজ্বদাহর স্থান। জায়গাটির এই গুরুত্বের কারণ হলো, এর অধিবাসীরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ছোট্ট এই নগর থেকে এমন এক আলো ছড়িয়ে পড়েছিল, যা সে সময়কার পুরো বিশ্বকেই আলোকিত করেছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরবর্তী প্রজন্মকে আলোকিত করে চলছে। এমন অভাবনীয় কাজ করতে আলোর বাহক কী এমন করেছিলেন? তাঁর মহিমান্বিত জীবন থেকে নেতৃত্বের কী শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি? রাসূল ﷺ-এর সম্পর্কে আল্লাহ তা আলা নিজে বলেছেন: তাঁর জীবন সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ। নবিজির জীবনকে আল্লাহ তা আলা সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অতএব, তাঁর জীবন থেকে অবশ্যই শোখার অনেক অনেক কিছু আছে। আসলে আমাদের কেউই দাবি করতে পারবে না যে, সম্পূর্ণ হক আদায় করে আমরা সে শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি।

এই বইয়ে আমি তাঁর মহিমান্বিত জীবনের কিছু দিক তুলে ধরে নেতৃত্বের কী শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তা দেখার এবং আপনাদের জানানোর চেম্টা করেছি। আমাদের বর্তমান ক্রান্তিকালের সবচেয়ে বড় ও দৃশ্যমান ঘাটতি হলো জ্বাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং নিডারশিপ নেজনজ

সামাজিক ন্যায়বিচারের অনুভূতিসম্পন্ন আদর্শিক নেতৃত্ব। সারা বিশ্বে আদর্শিক নেতৃত্বের অভাব খুবই প্রকট।

আমরা বর্তমানে যে দুনিয়ায় বসবাস করছি, ভবিষ্যতে যে দুনিয়ার সন্মুখীন হতে যাচ্ছি, তা খুবই জটিল। এখন তথ্য পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় সহজে পাওয়া যায়। ক্ষমতা অভিজাত শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত হয়ে আছে। এ পৃথিবীর টিকে থাকা না থাকা যে বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরশীল—তা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ যে, এসবের পুনরুম্বার প্রায় অসম্ভব। আমরা যে সমাজে বাস করি, সেটা অর্থনীতি, জাতিগত, জাতীয়তা, ধর্ম এবং ক্ষমতার রেখায় বিভক্ত। এই কালো বিভক্তি ক্রমাগত বাড়ছে।

বস্তুগত দিক বিবেচনায়, যেমন: গ্যাজেট, যন্ত্রপাতি, সম্পদ, অর্থ প্রভৃতি পার্থিব ভোগবস্তুতে আমরা সম্ভবত আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় প্রাচুর্যের মধ্যে আছি। আমাদের যা নেই তা হলো, নৈতিক ভিত্তিতে সিম্ধান্ত গ্রহণের মানসিকতা ও আল্লাহ-ভীতি। যাদের সম্পদ কম রয়েছে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার মানদন্ড। বস্তুগত সম্পদ জমা করার চেয়ে সততার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে, সুল্পমেয়াদী লাভের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের দিকে ধাবিত করে এমন মানদন্ড। এমন ব্যবস্থা যা আমাদেরকে আমাদের কাজের জন্য জবাবদিহিতার মুখোমুখি করবে। এমন সমাজ যেখানে মানুষ তাদের স্রন্টার সঞ্জো সম্পর্ক নির্মাণ করতে পারবে সহজে, আসমানি মূল্যবোধের আলোকে গড়তে পারবে নিজেদের জীবন। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সম্মান ও ন্যায়নীতির ঐতিহ্য রেখে যাওয়ার চিন্তা যেখানে স্বার মধ্যে থাকবে।

রাস্লুল্লাহ-এর সীরাত অধ্যয়নকালে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, ট্রেন্ড, ফোকাস এবং মৌলিক সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর সময়ের পৃথিবী এবং আমাদের বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে বস্তৃত কোনো পার্থক্য নেই। এটা তাঁর জীবন থেকে নেতৃত্বের শিক্ষা গ্রহণের জন্য আশাব্যঞ্জক। কারণ, সে সময়ের সমস্যাগুলো যদি আমাদেরগুলোর মতো হয় এবং সেগুলো তাঁর পম্ধতি অনুযায়ী সমাধান করা হয়, তা হলে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে—একই পর্ম্বতি অনুসরণের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্যগুলোও সমাধান করতে সক্ষম হব। নতুন এবং পরীক্ষামূলক কোনো তত্ত্বের তুলনায় প্রয়োগকৃত ও পরীক্ষিত উপায় অবশ্যই শ্রেয়তর। বিশেষ করে যখন সেই উপায়টি মানুষের স্রন্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং তা প্রয়োগ করেছেন তাঁরই রাসূল। এ ধরনের উপায় কখনো বার্থ হবার নয়।



হিজাজ এবং তৎকালীন সমাজ

ইসলামপূর্ব যুগে হিজাজ নামে পরিচিত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি। হিজাজের প্রধান শহর ছিল মার্কা, আল্লাহর ঘর বা কা'বা শরীফের কারণেই এর গুরুত্ব বেশি ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মের সময় আরবের শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা, বিশেষ করে মার্কার কুরাইশ এবং তায়েফের বনু সাকিফ গোত্র, উত্তরদিকে শাম (সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন, লেবানন) এবং দক্ষিণ দিকে ইয়েমেনের সজ্যে সমৃদ্ধ ব্যবসার কারণে বেশ ধনী এবং ক্ষমতাবান ছিল। তাদের এই সমৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে





Compressed with PDF Compressor brand diana and a

সাম্প্রতিককালের আরব উপদ্বীপের (জাজিরাতুল আরব) গোত্রগুলো এক প্রজন্ম আগেও যে দরিদ্র ছিল, সেটা মনে রেখেছিল এবং তারা তাদের সমৃন্ধি নিয়ে খুব গর্বিত ছিল।

ধর্ম ছিল তাদের ব্যবসায়ের প্রসার, ক্ষমতা আর সম্পদ আহরণের একটা উপায় মাত্র, সর্বস্তরে ন্যায়বিচার নিশ্চিতের লক্ষ্যে মানুযের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নয়। দেবদেবীদের কারণে কা'বায় তীর্থযাত্রীরা উপস্থিত হতো এবং এদের সংখ্যা যত বেশি, তাদের ব্যবসা ছিল তত রমরমা। কালব্রুমে এই পুণ্যার্থীদের সংখ্যা এতই বেড়ে গেল যে, শুধু আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে হজরত ইবরাহীম ক্র্র্র্রা যে ঘর নির্মাণ করেছিলেন, তার ভিতরে তারা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে ফেলল। মাক্কা যেহেতু একই সঞ্জো ব্যবসা এবং তীর্থকেন্দ্র, তাই মাক্কার স্থানীয় সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান বাণিজ্যপ্রধানদের সমৃন্ধির অন্যতম উৎস ছিল তীর্থযাত্রা ও এর আনুষঞ্জািক কার্যাবলি।

বস্তুগত সম্পদ তাদের একমাত্র বিবেচ্য ছিল। সামাজিক মান-মর্যাদার প্রতীক। কে কী পোষাক পরল, কী সুগন্ধি ব্যবহার করল, কার কতজন দাসদাসী রয়েছে, কী ধরনের বাহন ব্যবহার করে ইত্যাদি ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। যারা তাদের মতো হতে চায়, গল্পের আসরে এসব তাদের কল্পনা এবং ভাবনার খোরাক জোগাত। ঔষ্ধত্য ছিল ক্ষমতাবানদের অধিকার। তাদের অবাধ শোষণের ক্ষমতা মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। যারাই তাদের প্রতিবাদ করেছে, ক্ষমতার ক্রোধানলে তাদের দন্ধ হতে হয়েছে। মাত্র এক প্রজন্ম আগেই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই ভিন্নরকম। তাই যারা সম্পদশালী হয়ে গেছে, তাদের নিজেদের স্মৃতিতে অসুখী দিনগুলো রয়ে গিয়েছিল এবং সে কারণে নিজেদের সম্পদের ব্যাপারে তারা খুবই স্পর্দাকাতর ছিল। অর্থই ছিল তাদের স্ব। দু-পয়সা আয় হলে চিন্তা থাকত—কী উপায়ে এর ভোগ করা যায়! ভোগসুখের কোনো নির্দিন্ট সীমা ছিল না; সীমানা নির্ধারিত হতো কী পরিমাণ অর্থ রয়েছে তার ওপর। দরিদ্ররা সম্পদশালীদের দ্বারা নির্মমভাবে নিপ্রীড়িত হতো। দাস এবং নারীদেরকে ওয়ানটাইম গ্রাসের মতো ব্যবহার শেষে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হতো।

দাসপ্রথা আক্ষরিক অর্থেই বিস্তৃত ছিল। নারীদেরকে সম্পত্তির মতো ক্রয়বিক্রয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকার কিংবা ইচ্ছামতো ত্যাগ করা যেত। মুহাম্মাদ -এর সময়কার সে সমাজ গোত্রভিত্তিক পুঁজিবাদি ছিল। যেখানে সফলতার একমাত্র মাপকাঠি ক্ষমতার প্রতাপ এবং সম্পদের পুঞ্জিভূতকরণ। নৈতিক মূল্যবোধের প্রকট অভাব ছিল। বেশ্যাবৃত্তিতে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা লাজলজ্জার যবনিকাপাত করেছিল। নারীদের কোনো অধিকার ছিল না, তাদেরকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। যার সবচেয়ে জ্বযন্যরূপ হলো কন্যাশিশু হত্যা। যারা জীবিত কবরস্থ হওয়ার মতো ভয়ংকর পরিণতি থেকে বেঁচে যেত, তারা বড় হয়ে বহু পুরুষের ভোগ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার হতো। গোত্র ও জাতীয়তা, বর্ণ ও বংশ পরিচয়কে সবকিছুর চেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হতো। কিছু নারীর সমাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি থাকলেও এগুলো ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম। নারীরা মোটাদাগে তিন অর্থে বেঁচে ধাকত, বেশ্যা, দাসী অথবা পণ্য। তাদের জীবন ছিল কদর্য, নিষ্ঠুর এবং সংক্ষিপ্ত।

অর্থই ছিল ক্ষমতার উৎস। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বলরা গোত্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও প্রভাবহীন ছিল। দাসরা ছিল কঠিন নিপীড়নের শিকার এবং ক্ষমতাসীন অভিজাত

~~ I

লিডারশিপ লেসন্স

সম্প্রদায়ের করুণার বস্তু। মুহাম্মাদ ﷺ যে গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন, মার্কার সেই কুরাইশরা পেশায় ছিল ব্যবসায়ী। অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, তারা ছিল কা'বার তত্ত্বাবধায়ক। কুরাইশদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার বনু হাশিম ছিল সবচেয়ে সম্মানিত। পবিত্র জমজম কৃপের রক্ষক হিসেবে তারা তীর্থবাত্রীদের খাবার ও পানীয় সরবরাহের মাধ্যমে সেবা করার বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত কুরাইশদেরকে একতা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। যে সময় মানুষ যার ওপর পারত চরাও হতো, সেসময়ও তারা ছিল সম্মানিত ও সুরক্ষিত।

কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা শীতকালে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত এবং গ্রীমে উত্তরে শাম পর্যন্ত নির্বিঘ্নে যাতায়াত করত। যে সকল গোত্রের পেশা ছিল এ ধরনের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করা, তাদের থেকেও কুরাইশদের কাফেলা নিরাপদ ছিল। কারণ তারা হলো কা'বার তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রধান ধর্মযাজক। মার্কার সমাজে আভিজাত্যের ব্যাপারটা জমিদারি, শাসন কিংবা কোনো ঐতিহ্যবাহী অনুযজ্যের সজ্যে সম্পৃত্ত ছিল না। এখানে অর্থই ছিলো সমাজের উঁচু স্তরে উঠে যাওয়ার একমাত্র উপাদান। যেকোনোভাবে বিত্তশালী হতে পারলেই হতো। তাই এখানে সম্পদ অর্জনই ছিলো মানুযের প্রধান লক্ষ্য; ধর্ম ছিল তা অর্জনের একমাত্র উপায়।

আগেই বলেছি, আমরা যদি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাব, আমাদের বর্তমান পুঁজিবাদি সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এর কত গভীর মিল। সেকালের মতো এ যুগে হয়তো আগের অর্থে দাসপ্রথা নেই; কিন্তু আমাদের দাসপ্রথা আরও বিভীষিকাময়। কারণ, এটা প্রকৃতিতে মতাদর্শভিত্তিক (ideological) এবং সারা বিশ্বে ভয়াবহভাবে বিস্তৃত। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও দাস তৈরি ও দাসপ্রথার প্রশিক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে একে আরও শক্তিশালী করে তুলছে। এটি এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা মানুষকে একটি সুদৃশ্য খাঁচায় বন্দী করে। স্বাধীনতা ও সমতার আদর্শের কারণে যেন এই দাস ব্যবস্থা হুমকির মুখে না পড়ে, বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গো তার শৃঙ্খল নিশ্চিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেসময়ের দুই পরাক্রমশালী বাইজেন্টাইন (রোমান) সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কখনো এপক্ষ কখনো ওপক্ষ একে অপরের উপর জয়ী হতো। এদের কেউই আরব অঞ্চল শাসনের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। এর কারণ মূলত ছিল আরবের শুক্ষ, চাষাবাদ অযোগ্য মরুভূমি। কিছু মরুদ্যান ছিল অবশ্য, তাও সেখানে যাযাবর গোত্রগুলো দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের সঙ্গো জড়ামড়ি করে বসবাস করত। সামান্য যা ছিল, তা কেবল দুইটি বাণিজ্যকেন্দ্র—তীর্থ শহর মাক্কা আর ফসলের শহর তায়েফ; বৃহৎ একটি সাম্রাজ্যের ব্যয়ের হিসেবে এটা শস্য পারিমাণও নয়। কর আদায়, সৈন্য ও দাস সংগ্রহ, রসদ লুষ্ঠন অথবা অন্য যেকোনো বাহ্যিক প্রয়োজনেই সেকালের আরব খুব পছন্দনীয় ছিল না। দুই পরাশক্তি রোমান এবং পারসীয়রা আরব্য উপদ্বীপের এই অঞ্চলটাকে উপেক্ষা করায় তারা বিচ্ছিন্ন ছিল এবং কখনো অন্য কারও অধীন হয়নি।

আরবরা তাদের নিজস্ব গোত্রীয় আইন মেনে বাস করত। নিজস্ব গোত্রপ্রধান দ্বারা পরিচালিত হতো। লড়াই করে অন্যদের থেকে নিজেদের গোত্র ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করত। একটি





मणीत अधिनाति भूषानील ।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা উচিতি, আরবের সেই মানুযোরা কখনোও কারও অধীন ছিল না, ফলে উপনিবেশের অধীনে থাকা দেশ অথবা গোজগুলোর সাধারণ বেশিষ্ট্য তাদের মধ্যে ছিল না। তাদের এই অনমনীয়তা এবং আভাওরাণ দন্দ সত্তে প্রচন্ড স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রকট হয়ে উঠত। তারা ছিল এমন লোক, যারা নিজেদের আইন কঠোরভাবে মেনে চলত; কিন্তু অন্যদের নিয়মকানুন গ্রহণ করাতে আগ্রহা জিলা 👘

তারা কখনোই কারও সামনে মাথা নত করেনি। এ নিয়ে তারা গার্নিত দ্বিদা ফাল যখন তারা আল্লাহর কাছে মাথা নত করল, তখন তাদের সনে ছিল, তারা আগে কখনো মাথা নত করেনি, ফলে তাওহীদের সকল অর্থই তারা গ্রহণ করেছিল। সুহাশ্যাদ ﷺ এই বিশ্বজ্ঞগতের স্রন্টার কাছ থেকে যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল সরুর বাঁতাসের মতো বিশুন্ধ, পরিম্কার এবং সরল। ইসলাম যখন রাজাদের কাছে এল, মুসলমানরা রাজ্য জয় করতে শুরু করল, তখনই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক বিষয়গুলো আত্মভূত করতে শুরু করে, যার সঙ্গো মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত ইসলামের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

আরবদের গোত্রভিত্তিক সমাজের প্রকৃতি এবং ইসলামের বাণীর বিরোধিতার ধরন—এই উভয়ের বৈশিষ্ট্য মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের বার্তাকে ধরা হয়েছিল এমন কিছু, যা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে এবং তাদের যাজকতন্ত্র ও ক্ষমতার ভিত্তিকে প্রনর্বিন্যাস করতে চায়।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমকালীন আরব সমাজের এই সংক্ষিপ্ত চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এর সঞ্জো বর্তমানের প্রভাবশালী বৈশ্বিক সংস্কৃতির কত গভীর মিলা অর্থ-ক্ষমতার ওপর অধিকতর গুরুত্ব, বিনোদন ও মুনাফার জন্য নারীদের পন্যে পরিণত করা, (যদিও একে স্বাধীনতার নামে বিক্রি করা হচ্ছে), ব্যপক বিস্তৃত অবাধ যৌনাচার, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বস্তুগত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা, সমাজকে বর্ণপ্রথা, জাতীয়তা ইত্যাদি রেখায় বিভক্তিকরণ, ন্যায়বিচার ও কর্তব্যবোধের লক্ষ্যে যেকোনো ধর্মের পদক্ষেপকে অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত জ্ঞান করা হয়। দরিদ্র ও দুর্বলদের কোনো স্বর, ক্ষমতা এমনকি পরিচিতিও নেই। উলটো ধনীদের আরও ধনী ২ওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। তাদের এ অবস্থার কারণে বাকি দুনিয়ার কী পরিণতি ২চ্ছে, তা নিয়ে তাদের কোনো ভাবনা নেই। গোটা দুনিয়া নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট, অথচ এর কোনো সমাধান দেখা যাচ্ছে না।

এমন একটি সমাজেই মুহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বেড়ে উঠেছিলেন। এ সমাজেই তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেছেন। যে বাণী গোত্র, বর্ণ, লিঞ্চা, অর্থনৈতিক বৈষম্য নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতের লক্ষ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চায়। এই বাণীতে রয়েছে ব্যক্তির জন্য মর্যাদা, মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রন্ধা এবং দুর্বলের জন্য সহানুভূতি। রয়েছে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি। স্রন্টার আইনকানুনের প্রতি নত হওয়ার বার্তা। যা নিশ্চিত করে শান্তি, সুসম্পর্ক ও নিরাপত্তা। বর্তমানে এই বাণীর চেয়ে অধিক আর কী প্রয়োজন?

এমন বার্তা আমাদের ভীষণ প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে পৃথিবী যে সমাধান খুঁজছে, তা

ବ୍ୟ



লিডারশিপ লেজনজ

কেবল এখানেই আছে। এই প্রেক্ষাপটে যে সকল নেতৃত্বের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমি বিশ্বাস করি, তা ঘেঁটে বের করেছি এবং একটি আধুনিক ও প্রয়োগোপযোগী ফরম্যাটে উপস্থাপন করছি। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো সেটা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। এর অন্যথায় জ্ঞান আমাদের উপকার করতে পারে না। তাই আমি অনুরোধ করব, নেতৃত্বের শিক্ষাগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়নের অভিপ্রায় নিয়ে এই বইটি পড়ুন।

আল্লাহর রাসূলের জীবন থেকে যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে শিক্ষা নেওয়া উচিত: ১. সর্বান্তকরণে নিশ্চয়তা

২. আপসহিনতা

৩. সামনে থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া

প্থিতিশীলতা

৫. সবকিছুর ওপর আল্লাহকে প্রাধান্য দেওয়া

৬. বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করা

৭. ঝুঁকি গ্ৰহণ

৮. দীর্ঘমেয়াদের স্বার্থে সুল্পমেয়াদী স্বার্থ ত্যাগ

৯. ক্ষমাশীলতা

১০. ব্যক্তি-চালিত থেকে প্রক্রিয়া-চালিতে রূপান্তর

১১. উত্তরাধিকার পরিকল্পনা এবং নেতৃত্ব তৈরি

এই বইয়ের বাকি অংশে আমরা এগুলোর প্রত্যেকটি আলাদাভাবে কুরআন, সুনাহ এবং সীরাত থেকে প্রমাণসহ উপস্থাপন করব। আমি যতটুকু সম্ভব পরিম্কারভাবে উপস্থাপনের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের সাহায্য কামনা করছি এবং আমার ভুলব্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।



আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে পূর্ণ আস্থা

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রথম যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো তাঁর প্রচারিত বাণীতে পূর্ণ আস্থা; আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তিনি নিজে আল্লাহর রাসূল, তাঁকে সমগ্র মানবজাতির কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

দৃশ্যটি নিজের ক্ষেত্রে কল্পনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাফা পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলেন, চিৎকার করে ডাকলেন তাঁর কওমকে—হে লোকসকল!

লোকজন হারাম শরীফে, বাজারে, যে যেখানে ছিল—চারদিক থেকে তাঁর কাছে ছুটে এল। শুধু এ কারণে নয় যে, এই বিপদের ডাক কুরাইশদেরকে সবকিছু ফেলে রেখে জরুরিভিত্তিতে উপস্থিত হতে বলছে; বরং দ্রুত জড়ো হওয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহের নিগূঢ় কারণ ছিল—এই ডাক এসেছে মুহাম্মাদ আস-সাদিক আল-আমীন (সত্যবাদী এবং বিশ্বাসী—কুরাইশরা তাঁকে এই নামে ডাকত) থেকে। তিনি যদি 'হে লোকসকল' বলে ডাক দেন, তাহলে সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তারা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর চারদিকে জমায়েত হলো। বর্তমানকালে আমরা যখন হাজ্জ করতে যাই, তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর সাফা পাহাড়ে সা'ঈ করি, আমাদের উচিত একটু থেমে এই পাহাড়ে ঘটে যাওয়া সেই দৃশ্যের রোমন্থন করা। এটাই সেই স্থান, যেখানে দাঁড়িয়ে রাস্লুল্লাহ ইবরাহীম স্ক্র্য্যে পরে প্রথমবার তাওহীদের বাণী ঘোষণা করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন—হে লোকেরা, যদি আমি বলি যে একটি সৈন্যদল এই পাহাড়ের পেছনে অপেক্ষা করছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে?

তারা বলল, তুমি কখনো আমাদের সঙ্গো মিথ্যা বলনি, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে (পরকালে) কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে এসেছি (যদি তোমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ এবং এক আল্লাহর ইবাদাত না কর)।

আবু লাহাব ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়, তাঁর পিতার ভাই— চাচা। সে তাদের অনেকের পক্ষে বলল, তাব্বান লাকা সা-ইরাল ইয়াওম, আলিহাযা জামা'আতানা? (সারাটা দিন নন্ট হোক তোমার, তুমি কি এজন্য আমাদের জমায়েত করেছ?)

আবু লাহাবের মতে আখিরাতের কথা বলা মানে সময়ের অপচয়। এই সতর্ক বার্তার শোনানোর জন্য তাকে কাজ্বকর্ম ফেলে ডেকে আনাকে সে ক্ষতি বলে বিবেচনা করল।

CS CamScanner

. . 1

এ ধরনের ব্যক্তিরা পৃথিবীর যেকোনো বিষয়ে কথা বলতে আপত্তি করে না; কিন্তু আথিরাতের মুক্তি নিয়ে আপত্তির অন্ত নেই। এখনকার কালে আপনি যদি কীভাবে মলিয়ন ডলার আয় করা যাবে, তা নিয়ে কথা বলেন, তাহলে মানুষ যেভাবেই যেক মলিয়ন ওলার আয় করা যাবে, তা নিয়ে কথা শোনার জন্য অর্থও প্রদান করবে। গোটা সময় বের করে নেবে। এমনকি আপনার কথা শোনার জন্য অর্থও প্রদান করবে। গোটা লকচার রেকর্ডারে সংরক্ষণ করে রাখবে; কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি এবং জানাতে প্রবেশের উপায় সম্পর্কে বলতে চান, তাহলে তান্ন তাদের সময় নন্ট করা হয়েছে বলে আপনাকে অভিযুক্ত করবে।

আবু লাহাব আখিরাত নিয়ে কথা বলাটা সময়ের অপচয় এবং ব্যবসা ফেলে তাকে ডেকে আবু লাহাব আখিরাত নিয়ে কথা বলাটা সময়ের অপচয় এবং ব্যবসা ফেলে তাকে ডেকে আনাকে ক্ষতি বলে মনে করল। তাই সে তার ভাতিজাকে অভিশাপ দিলো; কিন্তু তার ভাতিজা ছিলেন আল্লাহর রাসূল, যারা আল্লাহর রাসূলকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাদের ভাতিজা ছিলেন আল্লাহর রাসূল, যারা আল্লাহর রাসূলকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা তাৎক্ষণিক সূরা নাযিল করলেন:

১. আবু লাহাবের দুহাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। ২. তার ধনসম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে সেগুলো কোনো কাজে আসেনি। ৩. অচিরে<u>ই সে লেলিহান আগুনে দণ্ধ হবে।</u> [সূরা লাহাব, ১১১: ১-৩]

কুরআনের উৎস যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যারা প্রমাণ খুঁজতে চায় তাদের জন্য এই সূরা অনেক প্রমাণের একটি। কারণ, আবু লাহাব যে অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, এখানে সেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আবু লাহাবের জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে শুধু ইসলাম গ্রহণের ভান করবে, তাহলেই এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হতো; কিন্তু সে তা করেনি বা করতে পারেনি। এই সূরা নাযিলের অনেক বছর পরে সে ইসলাম গ্রহণ ব্যাতিরেকেই খুবই ভয়ংকর এক রোগে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃতদেহে পচন ধরে যায়। মানুষ তাকে কবরস্থ করার জন্য ধরতেও চায়নি। তিনদিন পরে তার ছেলেরা লম্বা লাঠির সাহায্যে তার শবদেহটি একটি গর্তে ফেলে দিয়ে পাথর ছুঁড়ে ভর্তি করে দেয়। অর্থাৎ এমনই অভিশপ্ত হলো আবু লাহাব, তার নিজের ছেলেরাই বাবার লাশে পাথর মারে! মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জাহান্নামের আগুন তো আছেই!

প্রথম যে নেতৃত্বের শিক্ষা আমরা পাই, তা হলো নেতার জন্য নিজের আদর্শের ওপর পূর্ণ আম্থা থাকা জরুরি। নিজের লক্ষ্য, কৌশল, পম্বতির ওপরও এই বিশ্বাস থাকা জরুরি যে, তাকে কেউ অনুসরণ করলে নিশ্চিত সে উপকৃত হবে। নেতা যদি এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহও প্রকাশ করে, তার নেতৃত্বের ক্ষমতা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। মানুষ তাদের নেতাকে বিভিন্ন কারণে অনুসরণ করে—কেউ করে কারণ তারা তার বাণী বিশ্বাস করেছে, কারও আনুগত্যের কারণ নেতা ক্ষমতাবান, আবার কেউ নেতার বিভিন্নরক্ম সম্পর্কের কারণে অনুসরণ করে।

নেতা যদি তার পথে অটল থাকেন, তবে ক্রমান্বয়ে তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পা^{য়।} বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত হয়। অটল ও অবিচল থাকা নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।



আলাহ ও তাঁ্র বা্ণীত্তে পূর্ণ আস্থা

নবিত্বের ২৩ বছরের কঠিনতম সময়ে একটি ঘটনারও অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না যেখানে মুহাম্মাদ তাঁর বাণী এবং দায়িত্ব থেকে বিন্দুমাত্র সরে এসেছেন। এটাও একটি অলৌকিক ব্যাপার; রাসূল ﷺ-এর ওপর প্রদন্ত ইলাহি মিশনের প্রমাণ। এই বিশ্বাস এবং এর সজো মুহাম্মাদ ﷺ-এর মহৎ গুণাবলি, সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি, সুন্দর ব্যবহার, নিম্কলঙ্ক চরিত্র, সূগভীর প্রজ্ঞা, অসাধারণ বিচক্ষণতা, স্বভাবসুলভ মহানুভবতা তাঁকে খুবই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল। অনেকে তাঁর আহ্বানে ঈমান না এনেই ব্যস্তি হিসেবে তাঁকে খুবই বিশ্বাস করত। ঈমানের আহ্বানের কারণে যারা তাঁকে হত্যা করতে হিজরাতের রাতে বাড়ি ঘিরেছিল, তারাই তাঁর কাছে সম্পদ আমানাত রেখে নিরাপদ বোধ করত। মুহাম্মাদ -কে শত্র্রাও বিশ্বাস করত—যদি তিনি একথা বলে থাকেন, তবে অবশ্যই তা সত্য। এ থেকে বার্তাবাহকের ব্যক্তিগত চরিত্রের গুরুত্ব স্কট হয়ে যায়। বার্তা প্রচারে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম সহায়ক আর কিছু হতে পারে না।

বর্তমানের দুনিয়ায় দাওয়াহ সংগঠনগুলোর অধিকাংশই ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য ভালোমন্দ সব ধরনের পার্শ্বতি অনুসরণ করে। এই যাত্রায় আস্বিয়া কিরামের দাওয়াহ পার্শ্বতি ও তাঁর বৈশিষ্ট্য মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে: তারা এ কাজ করেছিলেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, কোনো উপায়েই মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রতিদানের আশা করেননি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নবিদের সম্পর্কে বলেন:

ওরা তারা, যাদের আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশমাত্র। [সূরা আনআম ৬: ৯০]

নবিগণ অনুসৃত হওয়ার জন্যই এসেছেন। তাদের পথই একমাত্র পথ, যা আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীকৃতি দিয়েছেন, সরাসরি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

নবিদের দাওয়াহর মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল:

- ১. সরল, সুম্পন্ট, আপসহীন
- ২. কুণ্ডলীকৃত কোনো জটিল দর্শন নেই
- ৩. আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল
- 8. একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা
- ৫. মানুষের কাছ থেকে ক্রোনোরকম বিনিময়ের আশা না করা
- ৬ শুধু আল্লাহর সন্তুন্টির জন্য কাজ করা

নিডারশিপ লেমনম

বাৰ্তাটি তা হলে কী ছিল?

আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে জানাতের একটি জানালা খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুযের সজ্জে কথা বলেছিলেন। জিবরাইল ক্র্য্রা নবি কারীম মুহাম্মাদ স্ক্র-এর নিকট এসে তাকে আলিজান করে বললেন—ইকরা (পড়ো)। মুহাম্মাদ বললেন—আমি পড়তে পারি না। তিনবার ঘটল এর পুনরাবৃত্তি। তারপর জিবরাইল ক্র্য্রা তাঁকে যে বার্তাসহ পাঠানো হয়েছে, তা হস্তান্তর করে সূরা আলাকের প্রথম আয়াত পাঠ করলেন; কুরআন শারীফের প্রথম আয়াতগুচ্ছ নাযিল হলো।

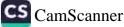
১. আপনি পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ২. যিনি মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। ৩. পড়ুন আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। [সূরা আলাক ৯৬: ১-৫]

এ মহাবিশ্বের স্রন্টা এবং তাঁর রাসূলের মধ্যকার এটাই প্রথম আলাপ, যা তাঁর বার্তাবাহক জিবরাইল স্ক্র্য্যা-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি ছিল মহান স্রন্টার পক্ষ থেকে দুটি ভিন্ন মাত্রার দুই ধরনের সৃষ্টির সাক্ষাৎ। মুহাম্মাদ এর জন্য এই রকম সাক্ষাৎ প্রথম, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি বেশ ভীত হয়ে পড়লেন।

মুহাম্মাদ খুব ভীত অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে তাঁর স্ত্রী খাদিজার কাছে গিয়ে বললেন—, ''যাম্মিলুনী, যাম্মিলুনী'' (আমাকে চাদর দিয়ে আবৃত করে দাও)। তিনি ধারণা করেছিলেন, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে সে জিন, তাই তিনি ভীত ছিলেন, জিন আর জাদুকরের সঙ্গে মিলে কিছু করতে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে তাঁর সঙ্গে যা ঘটেছে তা বর্ণনা করে বললেন, তিনি ভয় পাচ্ছেন, এটি হয়তো তাঁকে ধ্বংস করবে। জবাবে খাদিজা বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা আপনাকে ত্যাগ করবেন না; কারণ আপনি অভাবগ্রস্থকে সহায়তা করেন, দরিদ্রকে সহযোগিতা করেন এবং আপনি অতিথিদের সম্মান করেন।

মজার ব্যাপার হলো তিনি যে সকল গুণাবলির কথা বলেছেন, তার সবগুলোই মানুষের সঙ্গে ভদ্র আচরণ ও দয়ার্দ্র ব্যবহারের সঙ্গো সম্পৃক্ত। এটা এমন একটা বিষয়, যা আমরা বর্তমানে আমাদের জীবন থেকে প্রায় নির্বাসিত করে দিয়েছি। এ কারণে বিশ্বব্যাপী আমাদের আজকের করুণ অবস্থা। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে পৃথিবীকে দেওয়ার জন্য। পৃথিবী তাদেরকে ভালোবাসে, যারা দিতে জানে, বিবেকবান এবং দয়ালু। অন্যদিকে তাদেরকে ঘৃণা করে, যারা টাকাপয়সা, ধনসম্পদ ইত্যাদির জন্য লালায়িত, ধান্দায় লিপ্ত। অন্যের থেকে লুটেপুটে আনন্দ পায়। আমাদের চরিত্রের বর্তমান রূপ কী, তা তুলে ধরর কী আর প্রয়োজন আছে?

আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবিরা এমন উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন, যে কেউ ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না যে, তারা যা প্রচার করতেন—তা তারা নিজেরা অনুসরণ করতেন না। তাহলে অনুসরণ করার অর্থ কী? আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত,



Compressed with PDF Compressor by তাঁব বাণীনত প্রতি নাস্থা

বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এবং সাহাবিরা মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার আগেই সংশোধন করে নেওয়া উচিত।

আমরা প্রিয় নবি রাস্লুল্লাহ ﷺ-সহ নেতৃত্বে নাম করা নেতাদের দিকে তাকালে দেখতে পাব, তাদের মধ্যে উদারতা, সহানুভূতি, নিজেদের প্রতি অবিচার ক্ষমা করে দেওয়ার প্রবণতা, অন্যদের জন্য উদ্বেগ, সাহায্য করার মানসিকতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, দানশীলতা, দরিদ্র ও অসহায়দের পক্ষে দাঁড়ানোর উদ্যম ইত্যাদি মৌলিক গুণাবলিসমূহ তাদের বাণী প্রচারের অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। এ সকল গুণাবলি তাঁকে মানুষের প্রিয় করে তুলেছে, ভালোবাসতে ও প্রম্বা করতে উৎসাহিত করেছে। জনসাধারণের মাঝে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। এটা বলা যেতে পারে যে, এই সকল গুণাবলিই নেতৃত্বের ভিত্তি।

এই গুণগুচ্ছ একজন নেতাকে শ্রুম্বার পাত্র এবং অনুসরণীয় করে তোলে। এটা বলা অযৌস্তিক হবে না যে, মানুষ যাকে পছন্দ বা শ্রুম্বা করে না, তাকে অনুসরণও করে না। নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী ব্যস্তিকে তার নিজের চরিত্র পরীক্ষা করে এই সকল গুণাবলির নিরিখে সে কোথায় অবস্থান করছে, তা বিচার করা উচিত। সঙ্গো সঙ্গো তৎপর হয়ে ঘাটতি পূরণের জন্য আন্তরিক প্রচেন্টা চালানো উচিত। কারণ, এ সকল গুণই নেতা হিসেবে তার সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ধারণ করে দেবে।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর এই গুণগুলো শুধু চমৎকার পর্যায়েই ছিল না, তিনি ছিলেন এর সর্বোচ্চ উদাহরণ। নেতৃত্বের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। জনগণ তাকে আস-সাদিক আল-আমীন বা সত্যবাদী ও বিশ্বাসী উপাধি দিয়েছিল। যে সমাজে বিশ্বাসের মাপকাঠিতে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নির্ণীত হতো, সেখানে এই উপাধি ছিল একজন যুবকের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক। মুহাম্মাদ ﷺ সবদিক থেকেই অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন, যা তাকে তাঁর থেকে বয়সে বড়দের কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার দিয়েছিল এবং মানুষ তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত।

বর্তমানে আমরা একটি নৈব্যক্তিক শহুরে সমাজে বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলে আমাদের ব্যক্তিগত গুণাবলি বড়জোর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়সুজনের গণ্ডিতে প্রভাব রাখতে পারে; কিন্তু গোত্রবন্ধ সমাজে একজন ব্যক্তির সাফল্য বা ব্যর্থতা তার বিশ্বাসযোগ্যতার খ্যাতির ওপর নির্ভর করত। কোনো ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি ছিল তার সন্মান বজায় রাখা এবং অসন্মানিত হওয়া ছিল মৃত্যুদণ্ডসম অপরাধ। তারা কাউকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেই কেবল তার সঞ্জো সম্পর্ক স্থাপন করত। এ কারণে কাউকে মিথ্যাবাদী বললে খুনোখুনিও ঘটে যেত। বড় বড় অঙ্কের ব্যবসায়িক লেনদেন কেবল উভয়পক্ষের মৌথিক প্রতিশ্রুতির ওপরই সম্পাদিত হতো।

এই ধরনের চুন্তির বাস্তবায়ন নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তুলত না। কারণ, সে সমাজে একমাত্র হীনতম ব্যক্তিই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গা করত। মিথ্যাবাদিতা, প্রতারণা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গা করা ছিল গুরুতর অপরাধ। এমনকি ইসলাম আগমনের পূর্বেও যখন তাদের জীবন ছিল অনৈতিকতা আর নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ, সে সময়টাতেও হিজাজের লোকদের মাঝে এ ধ্রনের মহৎ গুণ বিদ্যমান ছিল। শুনতে বেশ অদ্ভুত লাগে যে, একজন মানুষ মিথ্যা



লিডারশিপ নেসনস

বলবে না ঠিক; কিন্তু আবার আরেকজন মানুষকে হত্যা করা কিংবা অনৈতিক ব্যবহার করতে ইতস্ততও করবে না। মজার ব্যাপার হলো এই একই রকম বৈপরিত্য নেটিভ আমেরিকান এবং ওয়েস্টার্ন আমেরিকানদের মাঝেও বিদ্যমান ছিল।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাঝে তাঁর সময়কার লোকদের ভালো যত গুণ হতে পারে, তার সব বিদ্যমান ছিল। দুর্বলতার বিন্দু পরিমাণও উপস্থিত ছিল না। যার প্রভাব সত্যবাদিতা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার সেই মহান সময়েও তাঁর সামসময়িকদের মাঝে তাঁকে সমীহ ও সম্মানিত করে তুলেছিল। মানুযের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো নিজের দোষ স্বীকার করা এবং যার মধ্যে সে দোষ অনুপস্থিত তাকে শ্রদ্ধা করা। এ কারণে মাক্কার লোকেরা তাঁকে পছন্দ করত, ভালোবাসত। ওয়াহির প্রথম সবকের পর হজরত খাদিজা 🚓 ভীতসন্ত্রস্ত নবিজিকে এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন।

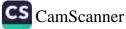
খাদিজা রাসূলকে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ -কে যা ঘটেছে তা বর্ণনা করতে বললেন। সময় ও মাত্রার দুটি জিন্ন জগতের দুই সৃষ্টির সাক্ষাতের ঘটনাটি শুনে ওয়ারাকা বললেন, ওটা ছিলেন আন-নামুস আল-আকবার, যিনি হজরত মৃসা ক্র্য্যা-এর কাছেও এসেছিলেন। আমি যদি যুবক হতাম (তাহলে তোমাকে সহায়তা করতাম), যখন লোকেরা তোমাকে তোমার ভূমি থেকে উচ্ছেদ করবে।

মুহাম্মাদ ﷺ বিস্মিত হয়ে ওয়ারাকা বিন নওফেলের বক্তব্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে প্রশ্ন করলেন, তারা আমাকে আমার ভূমি থেকে উচ্ছেদ করবে?

নবিজির অবাক হওয়ার যথেন্ট কারণ ছিল। তিনি ছিলেন সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র, সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। এমন একটি সমাজে তিনি বাস করতেন, যেখানে কাউকে; বিশেষ করে তাঁর মতো সম্ভ্রান্ত বংশ এবং পূর্বপুরুষের উত্তরসূরিকে কোনো গোত্র বা ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। অথচ ওয়ারাকা বলছেন, যে লোকগুলো তাকে অন্য যে কারও তুলনায় বেশি ভালোবাসে, তারা শুধু তাঁর বিরোধিতাই করবে না, আরব সমাজের অবিশ্বাস্য কাজ—তাকে সমাজ থেকে, পিতৃভূমি থেকে উৎখাত করার মতো জঘন্য কাজও করবে। ওয়ারাকা বললেন, অতীতে যে ব্যক্তিই তোমার বর্ণনার মতো কিছু তার লোকদের সামনে উপস্থাপন করেছে, তাকেই আপন ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানের এটা এক বিরাট উপকারিতা হলো, বিদ্বান ব্যক্তি কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কী ঘটবে তা আগেই বুঝতে পারেন।

এর কারণ হলো, দাওয়াহ মানে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, ভালো এবং মন্দের মধ্যে, নবিগণ এবং শয়তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এটাই প্রকৃত ও আদি দ্বন্দ্ব যা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত চলবে। সেদিন মহান রাব্বুল আলামীন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সকল দায় পরিশোধ করা হবে। তবে দুনিয়ার জীবনে এই সংগ্রাম চলতে থাকবে।

এ যুগেও আমরা এই সত্য দেখতে পাই। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান নীরবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার ধর্ম পালন করে, ততক্ষণ কেউ তার বিরোধিতা করে না; কিন্তু যে মুহূর্তে সে ধর্মকে জনসম্মুখে নিয়ে আসে, তা সে তার পোষাকের মাধ্যমে হোক (কাপড়,



Compressed with PDF Compresser by DLM Infosoft আল্লাই ও তাঁর বাণীতে পূর্ণ আস্থা

দাড়ি, পাগড়ি, হিজাব) অথবা দাওয়াহর মাধ্যমে, তখনই মারাত্মক বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। মানুষ অবাক চোখে তাকায়, যখন দেখে কেউ একজন ইসলামকে উপস্থাপন করছে, জ্বীবনযাপনের এমন একটি বিকল্প উপায়ের কথা বলছে, যা এর পালনকারীকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেবে।

একজন মুসলমান যে ব্যক্তির কাছে ইসলামকে উপস্থাপন করছে, সে তার জন্য সবচেয়ে ভালেটুকুই চায়, শুধু এই জীবনে না, অনন্তকালের জীবন পরকালেও। যদি কেউ একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে একবেলা খাবার দেয়, তবে সে একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিগণিত হয়; কিন্তু কেউ যদি কাউকে চিরন্তন আযাব থেকে রক্ষা করতে চায়, তখন তার বিরোধিতা করা হয়, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয়, এমনকি তাকে নানা প্রক্রিয়ায় আক্রমণ করা হয়। এ সবই মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগের সকল নবির ক্ষেত্রে ঘটেছিল। রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে এ কাজ করেছিল তাঁর নিজের লোকেরাই। এটা এমন এক বিষয়, যিনি ইসলাম প্রচারের কাজ করতে আগ্রহী, তাকে অবশ্যই এর মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যে অন্যকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে চায়, শয়তান তার সঙ্গো তীব্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সর্বশস্তি ব্যয় করে।

এ যুগে সবাই যেকোনো কিছুর 'বিকল্প' নিয়ে জোরেশোরে প্রচারণা চালাচ্ছে, হোক সেটা বিকল্প ঔষধ, স্থাপত্য, খাবার, শিক্ষা বা বিকল্প থেরাপি। এ সবকিছুকেই স্থাগত জানানো হয়, গ্রহণ করা হয় এবং তাদের প্রস্তাবিত পম্থতি যতই অদ্ভুত হোক না কেন, তা সম্পর্কে প্রচারণা চালানোর অধিকার নিয়ে সকলেই বেশ সচেতন; কিন্ডু যে মুহূর্তে আপনি ইসলাম নামে জীবনযাপনের একটি বিকল্প উপায়ের কথা বলবেন, ঘটনা উলটে যাবে এবং আপনাকে আক্রমণ করা হবে। ইসলামের প্রচার মানে যে শয়তানের বিরুম্থে লড়াই করা। এই আক্রমণ হলো তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্বীকৃতি। ওয়ারাকার উচ্চারিত শব্দগুলো ছিল রাসূলুল্লাহ-এর জন্য সতর্কবার্তা; তার কাজ সহজ হবে না।

অন্যান্য রাসূলদের মতোই রাসূলুল্লাহ সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর ঈমান মজবুত হয়েছে সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়ে। এটি হলো অন্যকে তাঁর বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান জানানো। আল্লাহ বলেন,

। আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। [সূরা শু'আরা ২৬: ২১৪]

প্রথম বাধা এল যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাস্লুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দিলেন—যেন তিনি তাঁর আত্মীয়দেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেন, তাদের চলমান বহু-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী জীবনধারা থেকে ফিরে আসতে বলেন এবং সামাজিক দুর্নীতির কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করেন। আমি ইতোমধ্যেই রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে 'হে লোকসকল' বলে চিৎকারের ঘটনাটি বর্ণনা করেছি।

মহান আল্লাহ নবিদেরকে কোনোরকম সন্দেহ-সংশয় ছাড়া সরাসরি তাঁর বাণী প্রচারের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ কারণে নবিগণ কোনো প্রকার কূটনৈতিক প্রক্রিয়া, মিখ্টি ভাষণের সুর মূর্ছনা অথবা ভিন্ন কোনো পম্থার আশ্রয় নেননি। রাসূলুল্লাহ দাওয়াতের সমস্ত কথা



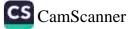
নিডারশিপ নেসনস

সরাসরি এবং সুস্পন্টভাবে বলেছেন। মানুষ বিশ্বিত হয়ে গেল। বস্তুগত কোনো সমাজ বস্তুর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। মানুষ যা দেখতে পারে, স্পর্শ করতে পারে, ক্রয় বা বিজ্ঞা করতে পারে, তা-ই বিশ্বাস করে; কিন্তু তাদেরকে মৃত্যু এবং পরকালের বিষয়ে বলে দেখুন, তাদের চোখ জ্বলে উঠবে, বস্তার দিকে এমনভাবে আড়চোখে তাকাবে-- যেন সে বন্ধ পাগল। তাদের দৃষ্টিতে গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে কথা বলা মানে হলো আপনি বুম্বিমান, আধুনিক কিংবা বিজ্ঞানমনশ্ব্দ নন। বস্তুকেন্দ্রিক সমাজে এমনভাবে বসবাস করে, যেন তাদের কখনো মৃত্যুবরণ করতে হবে না। পুনরুত্থান ও শেষ বিচার বলডে কিছু নেই। কেউ যদি তাদেরকে মৃত্যু ও পরকালের বাস্তবতা সম্পর্কে মনে করিয়ে দিডে চায়, তবে তাকে স্থাগত না জানিয়ে উলটো তার বিরোধিতা করা হয়। পনেরো শতাব্ধী পেরিয়ে গেল, এখনও একই অবস্থা বিরাজমান।

মার্কায় রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে অসুবিধা ও বিরোধিতা ক্রমশ বৃষ্ধি পাচ্ছিল; কিন্তু হেরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বিরোধিতা কেবল শস্তি বৃষ্ধি করেই যায়। প্রতিরোধ যত বেশি হবে, এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার শস্তি ততই বৃষ্ধি পাবে। বডি বিচ্ছিংয়ের ক্ষেত্রে দেখুন, ভারোত্তলন আপনার পেশীগুলোকে মজবুত করে গড়ে তোলে। দাওয়াহর ক্ষেত্রেও একই রকম, মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান জানানো এবং সকল বিরোধিতার মুখেও অটল অবিচল থাকার মাধ্যমে ঈমান মজবুত হয়। মার্কায় থাকাকালীন মুসলমানগণ এই শিক্ষাই পালন করেছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর বিভিন্ন রকম অত্যাচারের বহু ঘটনা রয়েছে। যারা তাঁকে অনুসরণ করেছে, তারা নিষ্ঠুর নিপীড়নের শিকার হয়েছে। শুধু শারীরিক, মানসিক, আর্থিক যন্ত্রণাই নয়, অনেককে নির্মমভাবে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। এ সবই করা হয়েছে কুরাইশদের ধনী ও ক্ষমতাবান প্রধানদের পূর্ণ সহযোগিতা ও ছত্রছায়া; কিন্তু এর ফলে যা হয়েছে, তা হলো আল্লাহের প্রতি তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে।

রাসূল ﷺ নিজে মার্কার কুরাইশ বংশের যে গোত্রের সদস্য ছিলেন—বনু হাশিম—তারাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে। তারা তাদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। হুমকি-ধমকি দিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে, তাঁর সুনাম ও সচ্চরিত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়েছে; এমনকি তাঁকে শারীরিকভাবে আক্রমণও করা হয়েছে। যখন কোনো কিছুই তাঁকে ভীত করতে বা ইসলাম প্রচার থেকে বিরত করতে পারল না, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল, তাঁকে পদমর্যাদা ও সম্পদের মাধ্যমে প্রলুম্ব করবে।

ইবনু আব্বাস বলেন, কুরাইশদের নেতৃবৃন্দ এক ব্যক্তিকে পাঠালেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডেকে আনার জন্য। তাকে দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ খুশি হলেন যে, তারা বোধহয় তাদের অবস্থান পালটেছে। উতবা বলল, আমরা তোমার সঙ্গো মিটমাট করে নেওয়ার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমরা এমন কাউকে কখনোই দেখিনি, যে নিজের লোকদের জন্য এত দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে। তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে ঠাট্টা করেছ, আমাদের ধর্মের সমালোচনা করেছ, আমাদের দেবতাদের অভিশাপ দিয়েছ এবং আমাদের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য সবকিছু করেছ। যদি তুমি এসব এ কারণে করে থাক যে, তোমার অর্থের প্রয়োজন, তাহলে আমরা অর্থ সংগ্রহ করে দিতে থাকব—



Compressed with PDF Compressed with PDF Compressed with PDF Compression

যতক্ষণ না তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী হয়ে যাও। যদি তুমি ক্ষমতা চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা নির্বাচিত করব। যদি তুমি নারী চাও, তাহলে সবচেয়ে সুন্দরী দশজন নারী নির্বাচন করে তোমাকে দিয়ে দেবো। যদি তোমার ওপর শয়তানের আছর হয়, তাহলে আমরা আমাদের সকল অর্থ ব্যয় করব—যতক্ষণ না তুমি সুম্থ হও!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—তোমরা যা বলেছ, তা আমার জন্য মানায় না। আমি তোমাদের থেকে সম্পদ বা সম্মান আদায়ের জন্য এই বার্তা নিয়ে আসিনি। তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোতেও আমার আগ্রহ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা আমাকে বার্তাবাহক হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি আমার ওপর একটি বার্তা নাযিল করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য, সতর্ক করার জন্য। আমি আমার রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বাণী নিয়ে এসেছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। যদি তোমরা আমার বার্তা গ্রহণ কর, তাহলে তা তোমাদের এই দুনিয়া এবং পরকালের জন্য ভালো হবে। অন্যথায় আমি অপেক্ষা করব—যতক্ষণ না আল্লাহ তা 'আলা তোমাদের এবং আমার মধ্যকার বিষয়ে সিম্থান্ত দিচ্ছেন।

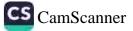
তারা বলল, তার মানে তুমি আমাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছ? তুমি তো জানো, আমাদের এই ভূমি কত সংকীর্ণ, আমরা কত গরিব, এখানে জীবনযাপন করা আমাদের জন্য কত কঠিন! তাহলে তুমি তোমার রবকে কেন বলছ না এই পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দিতে এবং সিরিয়া ও ইরাকের ন্যায় কিছু নদী এখানে প্রবাহিত করে দিতে! তাকে আরও বলো, আমাদের পূর্বপুরুষদের (কুসাই বিন কিলাব) জীবন ফিরিয়ে দিতে, যদি তারা জীবিত হয়ে বলে যে—তুমি সত্য বলছ, তাহলে আমরা তোমাকে অনুসরণ করব।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমাকে এ কারণে প্রেরণ করা হয়নি। আমি আল্লাহর কাছ থেকে কেবল তা-ই নিয়ে এসেছি, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। যদি তোমরা এই আহ্বান গ্রহণ কর, তবে তা তোমাদের ইহকাল ও পরকালের জন্য মঞ্চালকর হবে। আর যদি তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে আল্লাহ আমাদের মধ্যে কী বিচার করবেন, তার জন্য আমি অবশ্যই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব।

তারপর তারা বলল, তাহলে তুমি তোমার প্রভুকে একজন ফেরেশতা পাঠাতে বলছ না কেন, যিনি সাক্ষ্য দেবেন তুমি সত্য বলছ? কেন তুমি আমাদেরকে কিছু প্রাসাদ, বাগান, স্বর্ণ ও রুপা দেওয়ার জন্য তাঁকে বলছ না? কেন তুমি বলছ না তোমাকে কাজ করা ব্যতীত জীবিকা সরবরাহের জন্য? আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাদের মতোই ব্যবসা করছ। তোমার রবকে বলো তোমাকে সম্পদ দেওয়ার জন্য—যেন তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান হতে পার। তুমি তো বরং আমাদের সকলের মতোই সাধারণ!

আল্লাহর রাসূল কাফিরদের এসব প্রলাপ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

তারপর তারা বলল—ঠিক আছে, তাহলে তুমি যে শাস্তির সতর্কতা দিচ্ছ, তোমার ^{রব}কে বলো তা পাঠানোর জন্য। যদি তুমি সত্যবাদী হও বলো, যেন আকাশকে আমাদের মাথার ওপর ভেঙে ফেলে দেয়। তোমার রব কি জানেন না যে, আমরা তোমাকে এ সব



सिर्फा स्विति with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রশ্ন করব? এটা কেমন হলো যে, তিনি তোমাকে এসবের উত্তর দেওয়ার জন্য সহায়তা করছেন না? আমরা জানি কে তোমাকে এসব শিখিয়ে দিচ্ছে। সে হলো রাহমান নামের ইয়ামামার এক ব্যক্তি। আমরা তাকে বা তোমাকে বিশ্বাস করি না।

আল্লাহর রাসূল প্রত্যাখ্যাত হয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে গেলেন। আকিল ইবনু আরি তালিব বর্ণনা করেছেন, কুরাইশগণ আবু তালিবের কাছে অভিযোগ করল যে, মুহাম্মদ তাদের সভাগুলো বিনন্ট করছে। আবু তালিব নম্রভাবে রাসূল -কে দাওয়াহ ক্ষ করতে বললেন। রাসূলুল্লাহ বললেন—চাচা, আপনি কি সূর্য দেখতে পাচ্ছেন? আমি যেমন সূর্যকে থামাতে সক্ষম নই এবং আপনি যেমন তা থেকে আগুন আনতে সক্ষম নন, তেমনি আমি এই বাণী প্রচারেও বিরত থাকতে পারি না। আবু তালিব বললেন, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। এগিয়ে যাও এবং তোমার যা করা উচিত করো।

শেষোক্ত ঘটনাটি তার বিশ্বাস, যে বাণী তাঁর ওপর নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাঁর ওপর সম্পূর্ণ আস্থার প্রমাণ। কোনো কিছুই তাঁকে তাঁর বার্তা প্রচার থেকে বিরত, ধীরগতি কিংবা নিস্তেজ করতে পারত না। কোনো বিপত্তিই তাঁকে রাজনৈতিকভাবে ভুল প্রমাণিত করা, বাণী প্রচার বন্ধ করার জন্য ভীত বা বাধ্য করতে পারত না। কাউকে সন্তুন্ট করার জন্য সমঝোতাও তাঁর দ্বারা করানো সন্তব হয়নি। তিনি কেবল তাঁর স্রন্টার সন্তুন্টি নিয়েই চিন্তিত ছিলেন এবং তা অর্জনের জন্যই কাজ করে গেছেন, এজন্য যে মূল্যই দিতে হোক না কেন।

শিক্ষা

যেকোনো নেতার জন্যই এই পূর্ণ নিশ্চয়তার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যার ওপর তার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকাংশে নির্ভর করে। কারও পক্ষে তা-ই দেওয়া সম্ভব, যা তার কাছে আছে। ফলে কোনো নেতা যদি আশা করে তার মধ্যকার আকাঙ্কা তাকে বেন্টন করে থাকা অনুসারীদের হৃদয়ে স্থানান্তরিত হোক, তাহলে তার নিজের বিশ্বাস নড়বড়ে হওয়া চলবে না। নেতাদেরকে তাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হবে এবং এ সময় সংশ্লিন্ট সকলের নিকট পরিক্ষার হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বিশ্বাসের ওপর শক্তভাবে অবস্থান করে এর প্রতি দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করতে হবে। তবেই সে জন্গণের মধ্যে পরিবর্তন দেখতে সক্ষম হবে এবং জনগণের ওপর তার পক্ষই বিজয়ী হবে, যেমনটি রাস্ল্লাহ ৠ্র-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে। জনগণ তাদের চোখ দিয়ে শোনে। আপনি যা-ই বলেন না কেন, তারা যতক্ষণ না আপনার মধ্যে তা দেখতে পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মোটেও বিশ্বাস করবে না। যখন মানুষ দেখবে তাদের নেতা তার নিজের বলা কথানুযায়ী চলছে, তখন তারা অনুভব করতে পারবে, তিনি কী বলছেন এবং জনমত তার বার্তাব্দে গুরুত্বের সজো গ্রহণ করতে শুরু করবে। যখন তারা সরেজমিনে এর ফলাফল জমা হতে দেখবে, আরও বেশি মানুষ তাকে অনুসরণ করতে থাকবে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চরিত্র এমন ছিল যে, শত্রুরা পর্যন্ত তাঁর সত্যবাদিতা এবং আন্তরিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হতো। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায় এমন— সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনাটি ছিল বাইজেন্টাইন সম্র্রাট হেরাক্লিয়াসের সজ্জে আবু সুফিয়ানের



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft আল্লাহ ও তার বাণীতে পূর্ণ আম্থা

সাক্ষাতের ঘটনায়। ঘটনাটি আবু সুফিয়ানের মুসলমান হওয়ার আগে ঘটেছে এবং সেসময় তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরোধীদের নেতা; মাক্কায় তাঁর সবচেয়ে ক্ষমতাবান শত্র।

ļ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মার্কার কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি স্থাপিত হওয়ার প্রবর্তী সময়ে তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে চিঠ্টি লিখতে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের বললেন, আমি তোমাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বিদেশি রাজাদের নিকট পাঠাতে চাই। বনু ইসরাইলরা যেমন মারইয়াম ﷺ-এর পুত্র হজরত ঈসা আঞ্রা-কে নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করত, আমাকে নিয়ে তোমরা তেমনটি করো না। তারা বললেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আপনার কোনো বিষয়েই ভিন্ন মত পোষণ করব না। আমাদের সামনে চলার নির্দেশ দিন। বিদেশি রাজাদের বেশিরভাগই ছিল বিরুপ মনোভাবাপন্ন, তাদের নিকট যাওয়া সহজ কোনো কাজ ছিল না। এই যাত্রা ছিল বির্পদসংকুল; কিন্তু সাহাবিদের স্পিরিট এমন ছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের (বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য) সম্রাট হেরাক্রিয়াসের নিকট তাঁর চিঠি পৌঁছানোর জন্য হজরত দিহইয়া কালবিকে নিযুক্ত করলেন। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে মুসলমানরা রোম বলে অভিহিত করতেন। বাইজেন্টাইন শব্দটি সে কালের এক শতকেরও কম সময় আগে থেকে ব্যবহৃত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এতটা প্রচলিত ছিল না। এই সম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাস্থল)। সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমভাগে বিভক্ত ছিল, পশ্চিমের রাজধানী ছিল রোম এবং পূর্বের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। হেরাক্রিয়াস ছিলেন তিউনিস অঞ্চল থেকে উঠে আসা এক সামরিক কমান্ডার, যিনি সেখান থেকে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব রোমান সম্রাজ্যের সম্রাট হন।

তখন রোমান সাম্রাজ্যের খুব খারাপ সময় চলছিল। পারসিয়ানরা তাদেরকে ক্রমাগত আক্রমণ করছিল এবং রোমানরা তাদের কাছে একের পর এক যুন্দে হারছিল। ৬১৩ খ্রিস্টান্দে দামেস্ক ও ৬১৪ খ্রিস্টান্দে জেরুসালেমের পতন হলো। পারসিয়ানরা তথাকথিত 'আসল ক্রুশ' (টু ক্রস) নিয়ে গেল। 'টু ক্রস' হলো কাঠের তৈরি একটি ক্রুশ, যেটিতে যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল বলে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করত। যদিও সত্যি সত্যি স্টনা ক্রিয়ান একে রি হয়েছিল বলে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করত। যদিও সত্যি সত্যি স্টনা ক্রিয়ানরা একে হিয়েছিল বলে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করত। যদিও সত্যি সত্যি স্টনা ক্রিয়ান একে রিস্ট সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনি; স্মৃতিচিহ্ণ হিসেবে বিবেচনা করত। হেরাক্লিয়াস একজন শক্তিশালী নেতা এবং ভালো সামরিক কমান্ডার হওয়া সত্ত্বেও পারসিয়ানদের নিকট হারছিলেন। ৬২১ খ্রিস্টাব্দে হেরাক্লিয়াস পারসিয়ানদের বিরুন্দে নিজেই একটি অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং কথিত আসল ক্রুশসহ তাদের থেকে দখল নেওয়া একের পর এক শহর পুনরুম্বার করেন। একপর্যায়ে তিনি পারস্য শহরে প্রবেশ করেন এবং পারসিয়ানদেরকে নিজেদের দেশেই পরাজিত করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পূর্বেই সূরা রুমের ১-২ নম্বর আয়াতে এই ভবিয্যদ্বাণী করেছিলেন। ৬০০ খ্রিস্টাব্দে হেরাক্লিয়াস খ্রিস্টান ধর্মভীরু তীর্থযোত্রী হিসেবে নগ্নপদে জেরুসালেমে প্রবেশ

 \sim

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft লিডারশিপ লেমনম

করে হোলি সেপালচার চার্চে 'আসল ক্রুশ' পুনঃস্থাপন করেন। তাকে গালিচা, ফুল ইত্যাদির মাধ্যমে দারুণভাবে স্বাগত জানানো হয় এবং সম্মানিত করা হয়। যে সময় তিনি তার গৌরব ও ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। তখনই তিনি রাস্ল ﷺ-এর নিকট হতে চিঠি গ্রহণ করেন। হেরাক্লিয়াস রাস্ল ﷺ-এর দাওয়াত শুনে প্রত্যাখ্যান করেন। আল্লাহ তা 'আলা রোমানদের বিজয়কে উলটে দিলেন, হেরাক্লিয়াস একের পর এক শহর হারাতে লাগলেন। মিশর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডান, লেবানন এবং সর্বশেষে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের সময়ে কনস্টান্টিনোপল মুসলমানদের দখলে আসার মাধ্যমে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য অস্তিত্বের হুমকিতে পড়ে যায়।

দিহইয়া কালবি 🤹 খুব সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। জিবরাইল 🕮 যখন মানুষের বেশে রাসূল ﷺ-এর নিকট আসতেন, অনেক সময় দিহইয়া কালবির রূপ ধরে হাজির হতেন। হেরাক্রিয়াস চিঠিটি পড়ে বললেন, শাম অঞ্চলে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে এবং এই ব্যক্তির জাতির মধ্য থেকে কয়েকজনকে ধরে আনো। তার সৈন্যরা গাজায় আবু সুফিয়ান এবং তার সহযোগীদের পেয়ে হেরাক্রিয়াসের নিকট নিয়ে আসে। হেরাক্রিয়াস আবু সুফিয়ান এবং তার সহযোগীদের পেয়ে হেরাক্রিয়াসের নিকট নিয়ে আসে। হেরাক্রিয়াস আবু সুফিয়ান এবং সঙ্গীদেরকে তার পেছনে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়ে বললেন, আমার প্রশ্নের উত্তরে যদি সে মিথ্যা বলে তবে আমাকে সংকেত দেবে। পরবর্তী সময়ে আবু সুফিয়ান বলেন, আমি কখনো এই মানুষের মতো ধূর্ত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিনি। আমি জানতাম, আমার লোকেরা তার সামনে আমার সঙ্গো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না; কিন্তু আমি সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের সামনে মিথ্যা বলতে আমার ব্যক্তিত্বে বাঁধল। আমার ভয় ছিল যে, পরবর্তী সময়ে তারা অন্যদের কাছে বলে বেড়াবে এবং আমি মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হয়ে যাব।

হেরাক্নিয়াস প্রশ্ন করলেন, মুহাম্মাদ কে? আবু সুফিয়ান বললেন, হুয়া সাহিরুল কাজ্জাব— সে একজন জাদুকর এবং মিথ্যাবাদী।

হেরাক্নিয়াস: সে তোমাদের মধ্যে কেমন বংশের লোক?

আবু সুফিয়ান: তাঁর পূর্বপুরুষ বেশ সম্ভ্রান্ত।

হেরাক্রিয়াস: তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা ছিলেন?

আবু সুফিয়ান: না

হেরাক্রিয়াস: তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর আগে কেউ এই নবি দাবি নিয়ে এসেছে? আবু সুফিয়ান: না

হেরাক্রিয়াস: তাঁর বেশিরভাগ অনুসারী কী অভিজাত শ্রেণির নাকি দরিদ্র লোকজন?

আবু সুফিয়ান: তারা দরিদ্র।

হেরাক্রিয়াস: তারা কি সংখ্যায় বেড়ে চলছে নাকি কমছে?

আবু সুফিয়ান: তাদের সংখ্যা বাড়ছে।



Compressed with PDF Compressed with PDF Compressed with PDF Compressed with PDF Compression (

হেরাক্রিয়াস: তাদের মধ্য থেকে কেউ কি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করার পর পরিত্যাগ করেছে?

আবু সুফিয়ান: না।

হেরাক্লিয়াস: সে এই দাবি করার পূর্বে কি কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে দেখেছ?

আবু সুফিয়ান: না।

হেরাক্লিয়াস: সে কি কখনো বিশ্বাসভঙ্গ করেছে?

আবু সুফিয়ান: না। তবে আমরা তাঁর সঙ্গো একটি যুম্ধবিরতির চুস্তি করেছি, জানি না সে এই সময়ে কী করবে! (আবু সুফিয়ান বলেন, এটাই ছিল একমাত্র নেতিবাচক কথা, যা আমি বলতে সক্ষম হয়েছিলাম।)

হেরাক্রিয়াস: তোমরা কখনো তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছ?

আবু সুফিয়ান: হ্যাঁ।

হেরাক্লিয়াস: তাঁর ফলাফল কী?

আবু সুফিয়ান: কখনো সে জিতেছে, কখনো আমরা।

হেরাক্রিয়াস: সে তোমাদেরকে কী ধরনের নির্দেশ দেয়?

আবু সুফিয়ান: সে আমাদেরকে আল্লাহর সঙ্গো কাউকে শরীক না করে কেবল এক আল্লাহর উপাসনা করতে বলে। আমাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করতে বারণ করে। সে আমাদেরকে সালাত আদায় করতে, সত্যবাদী হতে, ব্যভিচার না করতে এবং মানুষের প্রতি দয়ালু হতে নির্দেশ করে।

তারপর হেরাক্লিয়াস বললেন: তুমি বলেছ সে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। সকল নবি ও রাসূলের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছিল। তুমি বলেছ তোমাদের মধ্যে তাঁর পূর্বে এমন দাবি কেউ কখনো করেনি। একারণে আমি বলতে পারছি না সে কাউকে অনুকরণ করছে। তুমি একথাও বলছ যে তার পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা ছিল না, সুতরাং সে রাজত্বের দাবিদার নয়। তুমি আরও বলেছ যে, সে এই বার্তা নিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত ছিল না। বেশ, আমি জানি সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার মাধ্যমে শুরু করবে না। তুমি বলেছ দরিদ্ররা তাঁর অনুসারী। আল্লাহর সকল রাসূলের ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে। তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা ব্রুমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারটিও সত্য বিশ্বাসের একটি নিদর্শন---যতক্ষণ না সে ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করে। তুমি আরও বলেছ, যারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের কেউই তা ত্যাগ করেনি। এটা হলো সত্যিকার বিশ্বাসের বৈশিষ্ট, যখন তার আলো মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে। সে বিশ্বাসঘাতক এমন কথা তুমি অস্বীকার করেছ। আল্লাহর কোনো রাসূলই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। তুমি আমাকে আরও বলেছ যে, সে তোমাদের আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করতে, প্রার্থনা ^{করতে}, সত্যবাদী হতে এবং ব্যভিচার না করতে আহ্বান জানায়। তুমি যা বলেছ, তা ^{যদি} সত্যি হয়, তবে আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই মাটির ওপরও সে শীঘ্রই ^{আধিপ}ত্য লাভ করবে। আমি জানতাম তাঁর আসার সময় হয়ে গেছে; কিন্তু আমি ভাবিনি



লিডারশিপ লেসনস

সে তোমাদের লোক হবে। আমার সামর্থ্য থাকলে আমি অবশ্যই তাঁর সঞ্জো সাক্ষাৎ করতাম এবং তাঁর পা ধুয়ে দিতাম।

আল্লাহর নামে যিনি দয়ালু এবং কল্যাণময়

আল্লাহর রাসূল মুহান্মাদের পক্ষ থেকে

রোমানদের রাজা হেরাক্রিয়াসের প্রতি,

যারা সত্য নির্দেশনা অনুসরণ করে, তাদের প্রতি শান্তি বর্যিত হোক। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন। আপনি নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর আপনি যদি অস্বীকার করেন, তবে আপনার লোকদের অবিশ্বাসের দায় আপনার ওপরই বর্তাবে।

পত্র পড়ার পর আবু সুফিয়ান বললেন, যখন তিনি যা বলার বললেন এবং পত্রপাঠ শেষ করলেন, এত বেশি শোরগোল শুরু হয়ে গেল যে, আমাদের বের করে দেওয়া হলো। আমি আমার লোকদেরকে বললাম, আবু কাসবার পুত্রের (মুহাম্মাদের) ব্যাপারটি এতটা গুরুত্ব লাভ করেছে যে, সাদা চামড়ার রাজাদেরকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছে। অতঃপর আমি উপলম্বি করলাম, মুহাম্মাদ অবশ্যই বিজয়লাভ করবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে ইসলামে নিয়ে এলেন।

হেরাক্রিয়াস তার গোত্রনেতাদেরকে বললেন, তাদের উচিত ইসলাম গ্রহণ করা; কিন্তু সম্রাটের কথায় তারা প্রচণ্ড রেগে গেল। বেকায়দায় পড়ে হেরাক্রিয়াস ভড়কালেন না, উপস্থিত বুন্ধিতে পরিস্থিতি সামলে নিয়ে বললেন, আমি তো তোমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করছিলাম! তিনি তার রাজ্য নিয়ে ভীত ছিলেন। আবু সুফিয়ান বলেন, যখন পত্রটি পড়া হচ্ছিল, তখন হেরাক্রিয়াসের কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছিল। তিনি জানতেন প্রকৃত সত্য কী; কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো সাহস তার ছিল না। তিনি কাউকে বলেছিলেন, আমি যদি পারতাম, তবে মুহাম্মাদের নিকট পৌঁছতাম; কিন্তু বাস্তবে সে তার রাজ্যের জন্য ভীত ছিল। যার ফলে ইসলাম তার ভাগ্যে জোটেনি।

হেরাক্রিয়াসের এই পুরো ঘটনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা রয়েছে। এখানে এটা স্পন্ট যে, সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও রাজ্যের প্রতি ভালোবাসা তার ঈমানের ওপর বিজয়ী হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ না করে তিনি দুনিয়ার রাজ্যকেই আঁকড়ে রইলেন। ইসলামে প্রবেশ নয়; বরং এর নিয়মনীতি অনুসরণের বেলায় আমরা কতবার এই একই ফাঁদে পা দিই! যে সকল নিয়ম এই দুনিয়া এবং আখিরাতে আমাদেরই কল্যাণের জন্য, সেগুলো গ্রহণ না করে আমরা শয়তানের ফাঁদে পা দিই; অথবা হেরাক্রিয়াসের মতোই আমাদের পথভ্রন্ট বন্ধু ও সহযোগীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে আল্লাহর আইন ভঙ্গা করি। আমরা ভুলে যাই যে, এ জীবন একটি পরীক্ষা মাত্র। এই পরীক্ষার ফলাফল আল্লাহর সঙ্গো যখন আমাদের সাক্ষাৎ হবে, তখন পাব।

দ্বিতীয় শিক্ষাটি হলো, যদি নেতার চরিত্র খাঁটি হয়, তিনি তার মিশনে আন্তরিক হন, তবে শত্রুও তার পক্ষে কথা বলতে বাধ্য হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জ্রীবনে এটা খুবই



আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে পূর্ণ আস্থা

প্লম্টভাবে ফুটে উঠেছে। যারা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছে, তারাও তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ বা কুৎসা রটনা করতে সক্ষম হয়নি। কারণ তারা তাঁর চরিত্রে এমন কিছু পায়নি, যা নিয়ে সমালোচনা করা যায়। তাদের কুৎসায় সত্যিকারের যা ফুটে ওঠে, তা হলো হতাশামিশ্রিত ক্ষোভ—যা তাদেরকে সত্য গ্রহণ করতে বাধা দেয়।

অন্যদিকে, যেকোনো ঘটনায় জনগোষ্ঠীর বিশাল এক অংশ যারা সাধারণভাবে নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে, তাদের হৃদয় ধীরে ধীরে মহৎ এবং সত্যবাদী ব্যক্তিটির দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। এভাবে একটি অনুসারী দল তৈরি হয়ে যায়। তবে, ইসলামের কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া চলবে না যে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের লক্ষ্য, অনুসারীর সংখ্যা বা জনপ্রিয়তার ব্যাপকতা নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে তা-ই ঘটেছে, যেখানে ২৩ বছরের জীবনে তিনি দাওয়াতের কারণে তাদের ঘৃণিত ব্যক্তি থেকে সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্রে পরিগণিত হয়েছেন। মনে রাখতে হবে, ধৈর্য খুব সহজ কোনো বিষয় নয়; কিন্তু ধৈর্য সব সময়ই মূল্য দেয়।



আপসহীনতা

রাসূল ﷺ যখন দীনি দাওয়াহর কাজ শুরু করলেন, তখন কী কী বিকল্প পন্থা তাঁর হাতে ছিল দেখা যাক।

১. তিনি কুরাইশদের রাজা হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারতেন, পরে অবস্থা বুঝে পরিবর্তন করে নিতেন!

২. তিনি সমঝোতা করতে পারতেন, পরে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনতেন।

৩. সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রথমে একজন সমাজ সংস্কারক হয়ে স্থানীয় সহায়তা গ্রহণ করতে পারতেন, তারপর জনপ্রিয়তার ফায়দা নিয়ে ধর্মীয় বার্তা প্রচার করতেন।

কিন্তু তিনি এগুলোর কোনোটিই বেছে নেননি; বরং তিনি তাই করলেন, যা সকল নবিগণ করেছেন। কোনো রাখঢাক না রেখে তিনি সরাসরি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। এটা তাঁর আসমানি নির্দেশনার অন্যতম নিদর্শন। মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কারণ, যাকে আল্লাহ পরিচালনা করছেন, তিনি ব্যতীত আর কে এমন সাহস করতে পারে?

যখন তাঁর সহযোগিতার খুব প্রয়োজন ছিল, তখনও তিনি তায়েফের বনু সাকিফের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কারণ তারা শর্ত দিয়েছিল, তারা যাকাত প্রদান করবে না। কিছু ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে অবস্থানে কোমল হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে বলেছিল, বনু সাকিফের ইসলামকে গ্রহণ করে নেওয়া উচিত, হয়তো তারা ভবিষ্যতে ঠিকমতো যাকাত প্রদান করবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করতে রাজি হলেন না; বরং যা বললেন তাঁর সারমর্ম হলো, যে ব্যক্তি সালাত থেকে যাকাতকে আলাদা করে, সে মুসলমান নয়। এই সিম্থান্তের ওপর ভিত্তি করেই রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আবু বাক্র সিদ্দীক ক্ষ যুন্ধ ঘোষণা করেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কীভাবে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুন্ধ ঘোষণা করেন? উত্তরে তিনি রাসূল্লাহ ﷺ-এর উক্তি 'যে যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে, সে মুসলমান নয়' উল্লেখ করেন।

যেকোনো মহৎ কাজ্ঞে সবচেয়ে ক্ষতি তাদের দ্বারা হয়, যারা সম্ভাব্য ভালোর জন্য নীতির সঙ্গো আপোষ করে। যখন এমনটি ঘটে, তখন পার্থক্যের স্পষ্টতা মুছে চিয়ে বার্তা তার গুরুত্ব হারায়।

امہ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াহর ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান এমন ছিল যে, তিনি তাঁর বাণীর সজে আপোষ করা বা নরম করা কিংবা কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য লঘু করতে রাজি ছিলেন না। আসমানি বাণী হওয়ার অনেক প্রমাণের মধ্যে এটিও একটি। রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর বাহক হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই জানতেন যে, এর মধ্যে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন করার অধিকার তাঁর নেই। তাঁর পিতৃপুরুষ ও গোত্রের লোকদের ধর্ম গ্রহণ করা, তাদের জন বিধি-নিষেধ সহজ করা, তাদের রীতিনীতি ও ঐতিহ্য গ্রহণ করার বিশাল মানসিক ও নৈতিক চাপ তাঁর ওপর ছিল; কিন্তু তিনি উপেক্ষা করেছেন।

তারা চাপ দেওয়ার সকল পন্থাই গ্রহণ করেছিল। তাকে স্বর্ণ, নারী, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংক্রান্ত প্রস্তাবের কথা আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি। তারা তাঁকে রাজা বানানের প্রস্তাব করেছিল। মৃত্যুর ভয় দেখানো হয়েছিল। এমনকি এই প্রস্তাবও দিয়েছিল যে, তারা একদিন তাঁর আল্লাহর উপাসনা করবে, যদি তিনি অন্যদিন তাদের মাবুদের উপাসনা করতে রাজি হন। তারা বলেছিল, আল্লাহর একত্ববাদ গ্রহণ করতে সন্মত আছে, যদি তিনি এ কথা বলা বন্ধ করেন যে, বহুত্ববাদ ও মূর্তিপূজা ভুল। সবশেষে যখন সকল বিপদে সুরক্ষা দানকারী চাচা আবু তালিব কুরাইশদের চাপে তাঁকে দাওয়াতের কাজে বিরত থাকতে বললেন, উত্তরে নবিজি বললেন—চাচাজান, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয়, তবুও আমার ওপর অর্পিত বাণী প্রচারের দায়িত্ব থেকে সামান্য সময়ের জন্যও বিরত হব না।

সামনের দিকে অগ্রসর ২ওয়ার আগে আমরা বর্তমানে ইসলামের নামে কী করছি, কৈফিয়তমূলক অবস্থানে থেকে তা বলতে চাই। আমরা পিছু হটতে, ইসলামের বাণীকে ঘষেমেজে মোলায়েম করতে, এর মাঝে সকল প্রকার নতুনতৃ প্রবেশ করাতে; এমনকি যেকোনো কিছু করতে আগ্রহী, কেবল সরাসরি ও সুম্পন্টভাবে বলতে আগ্রহী না। নিজেকে প্রশ্ন করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি আজ জীবিত থাকতেন, মাক্কায় যেরকম অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, আজও সে রকম অবস্থান গ্রহণ করতেন, তাহলে আমাদের কতজন তার পাশে দাঁড়াতে আগ্রহী হতাম? উলটো আজ আমরা তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করতে ক্লান্তি অনুভব করি। তাঁর অনুসারী দাবি করতেই ভয়ে মরি। কী লজ্জা! আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

শিক্ষা

একজন নেতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাঁর বাণী বা মতাদর্শের ভিত্তিতে নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তোলা। যদি নেতা জনপ্রিয়তার জন্য, পার্থিব লাভের জন্য, অনুসারী বৃদ্ধি বা অন্য কিছুর জন্য নিজের বাণীর সঞ্জো আপোয করে, তাহলে তাঁর বার্তা স্থাতন্ত্র্য হারাবে। একটি সুপ্পষ্ট আদর্শ যার ওপর সকল কার্জ নির্ভর করার কথা, তা নস্ট হয়ে পড়বে। স্থাভাবিকভাবেই এটি খুব সহজ কোনো কার্জ নয়। কারণ, বিদ্যমান নিয়ম, মূল্যবোধ ও রীতিনীতি ধরে রাখার জন্য প্রচুর সামার্জিক ও সম্পূর্ণ উলটো শ্রোতে চলা সব সময়েই জটিল কাজ; কিন্তু এটি নেতাকে অন্যদের তুলনায় আলাদা করার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত।



Compressed with PDF Compressor by DLM In নির্ভিষ্ঠ বিশিতা

আগেও বলেছি, পতাকা শেষ পর্যন্ত এক টুকরা কাপড়ই। একে ধুয়ে যদি কাপড় টাঙানোর দড়িতে শুকাতে দেওয়া হয়, তবে এর আলাদা কোনো মর্যাদা থাকে না; কিন্তু সেই একই কাপড় যখন পতাকার দণ্ডে লাগিয়ে উত্তোলন করা হয়, আদর্শ, বিশ্বাস ও রস্ত মেশানো শক্তিতে বাতাসে উড়তে থাকে, মানুষ তখন একে সালাম জানায়। পতাকার সহজাত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়নি; কিন্তু এর অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের কারণে পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি অন্যান্য কাপড়ের সঙ্গো এক দড়িতে ছিল, আলাদা কোনো মর্যাদা তার ছিল না; কিন্তু যখনই একাকী স্পন্টভাবে দেখা যাওয়ার মতো করে দাঁড়াল, প্রতিনিধিত্বকারী একটি রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হলো, এটি সন্মান, শ্রন্ধা ও সালাম লাভ করল।

একজন নেতাকে অনুসরণ করতে হলে তার পরিচয়, লক্ষ্য, তাকে অনুসরণ করলে কী ফায়দা ইত্যাদি বিষয় সর্বসাধারণ্যে সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও অনুপ্রেরণাদায়ী হতে হবে। পতাকা যখন উঁচুতে উড়ে, কেবল তখনই প্রতীক হয়ে ওঠে। একজন নেতাও একটি আদর্শ কিংবা আন্দোলনের পতাকা।

ইসলামের বিরোধিতাকারীরা যখন দেখে, তারা ইসলামের দাওয়াহ প্রচার থেকে বিরত করতে পারছে না, তখন বিকল্প পন্থা হিসেবে এর বাণীকে আরও সহজীকরণের মাধ্যমে যাদের অন্তরে মুনাফেকি আছে, তাদের জন্য 'রুচিকর' করে তুলতে তারা নানান উপায়ে চেষ্টা করে। আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের প্রবৃত্তিকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে আগ্রহী নয়, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত বার্তাবাহককে তার বাণী তাদের জীবনধারা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী পরিবর্তন না করতে দেখছে, ততক্ষণ তাঁকে সহযোগিতার ভান করতে মোটেও আপত্তি করে না। সিম্বুকে ঢুকে সিঁধ কাটার কৌশলও তাদের অনেক পুরোনো। বর্তমান যুগের মুসলমানদের মধ্যেও আজকাল এই সহজীকরণের ব্যাপারে ফাতওয়া সওদার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এ মানসিকতার মানুষ এমন ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বেড়ায়, যারা তাদের আকাঞ্চ্মা পূরণের অনুমতি প্রদানের জন্য ধর্মের সার্টিফিকেট দেয়। এ ধরনের 'আলিমদের প্রশংসা করা হয়, পুরস্কৃত করা হয়। অথচ যাদের মধ্যে সতর্ক করা, সত্যি কথা বলা এবং মন্দকে নিষেধ করার মতো সততা রয়েছে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয়, তারা হয় নির্যাতিত, নিপীড়িত।

লোভনীয় প্রস্তাবে প্ররোচিত না হওয়া আবশ্যক। ধর্মের বস্তুব্যে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে কারও আকাজ্জ্ফা পূরণ করে তাকে ধর্মে আনার কোনো প্রয়োজন নেই। বার্তাই নেতাকে সকলের থেকে আলাদা করে তোলে। যখন সে বার্তার সঙ্গো আপোষ করে তা সুবিধা অনুযায়ী অদল-বদল করে, তখন তাকে সব হারাতে হয়।

যার নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করার প্রত্যয় নেই; বরং ভেড়ার পালের লিডারের মতো নিরীহ থাকতেই আগ্রহী, সে নেতা হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। নেতা হওয়া মানে হলো কঠিন সিম্ধান্ত গ্রহণ করা এবং কখনো কখনো একাকী হওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়া। বাঘ কখনও একাকীও ঘুরে বেড়ায়। আর ভেড়ার সঞ্চো সব সময় অনেক সঞ্জীসাথি থাকে।



নিজেকেও সারিতে রাখা

তৃতীয় যে বিষয়টি রাসূল ﷺ-কে অন্যদের তুলনায় আলাদা করেছে, তা হলো নিজেকে সঠিক পথের ওপর রাখার দৃঢ় ইচ্ছা। কোনো অবস্থাতেই তিনি নিজে যা করতে আগ্রহী নন, তা করার জন্য অন্যকে বলেননি। একজন আদর্শ বাহকের যৌক্তিক অবস্থান হলো দলের সম্মুখভাগ, যেন সকলেই তাকে দেখতে পারে, তার পদাঙ্ক ও আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, তবে দায়িত্ব গ্রহণ করার এই মানসিকতা আপনার ভেতরে সুপ্ত থাকা নেতৃত্বের একটি নিদর্শন। এই গুণ শ্রুম্বা, ভালোবাসা ও আনুগত্যকে উৎসাহিত করে।

নবিজির সীরাতে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যেখানে তিনি সামনে থেকে অন্যান্যরা টের পাওয়ার আগেই সম্ভাব্য বিপদের মোকাবিলা করেছেন। জীবনের কোনো অবস্থায়ই তিনি তাঁর কোনো সাথিকে বিপদের মুখে ঠেলে দেননি বা তাদের পেছনে গিয়ে লুকাননি। তাঁর তায়েফে ভ্রমণের ঘটনাটি একটি ভালো উদাহরণ, যেখানে তিনি কাউকে প্রেরণ না করে নিজেই ব্যক্তিগতভাবে ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন। আরেকটি ঘটনা, হাওয়াজিনদের বিরুদ্ধে হুনাইন যুদ্ধে যখন মুসলমানরা আচমকা গুপ্ত আক্রমণের মুখে শৃঙ্খলা ভেঙে পিছু হটেছিলেন, আবু সুফিয়ান বিন হারব তাদের ছত্রভক্ষা অবস্থা দেখে বলেছিল—একমাত্র সমুদ্রই এখন তাদেরকে থামাতে পারে। অর্থাৎ, কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত লোহিত সমুদ্র তক তারা মুসলমানদেরকে তাড়া করে নিয়ে যাবে। এই অবস্থায়ও রাস্লুল্লাহ স্থ্র দিকে পিঠ দেখাতে রাজি হলেন না; বরং সম্মুখ দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তাঁর সাথিগণ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তাঁকে থামাতে চাইলেও তিনি সামনের দিকে এগোতে থাকেন।

তিনি আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে দেখে আনসারদের এবং তাদের মধ্যে তাঁর বিশেষ সেনাবাহিনী বনু নাজ্জার গোত্রের লোকদেরকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। তারা এসে তাঁকে থিরে ধরল। সবশেষে, মাত্র একশোর চেয়ে অল্প কিছু বেশি মানুষ ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ ২৯-এর সজ্যে ছিলেন এবং যুন্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে সেদিন বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। আলাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। যখন তিনি বলেন যে, তিনি প্রশান্তি নাযিল করেছেন ও সেনা পাঠিয়ে সহযোগিতা করেছেন---যা তারা দেখতে পায়নি। তখন তিনি এই অল্প সংখ্যক মানুষের কথাই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ্র্ –এর সাহস এমনই ছিল যে, কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। আরেকটি উদাহরণ হিসেবে আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ-এর প্রতি নবিজির আচরণ উল্লেখ করি। আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ ছিল ধর্মনিন্দাকারী ইসলাম ও রাসূল ﷺ-এর ক্ষতি করার জন্য মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত সাত আসামির অন্যতম। রাসূল 🏂 তাদের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে বললেন, তারা যদি কাঁবার গিলাফও আঁকড়ে থাকে, তবু যেন তাদের হত্যা করা হয়। আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ তার দুধভাই উসমান ইবনু আফফানের 🚲-এর ঘরে আশ্রয় নিলেন। উসমান 🚕 তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। আবদুলাহ বিন আবি সারহ বলল, আমি আপনার নিকট বাই'আত নিতে এসেছি। রাসূলুল্লাই 🏂 উত্তর দিলেন না। আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ দুবার অনুরোধ করল। রাসূল ﷺ নীরব হয়ে রইলেন। যখন সে তৃতীয়বারের মতো অনুরোধ করল, রাসূলুল্লাহ 🏂 তার বাই'আত গ্রহণ করলেন এবং আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ 選-এর কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর নবিজি তাঁর সঙ্গের লোকদের বললেন, তোমরা যখন দেখলে আমি চুপ রয়েছি, তখন তোমাদের মধ্যে কি জ্ঞানী এমন কেউ ছিল না, যে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে হত্যা করতে পারে? আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যদি সামান্য ইজ্ঞািত দিতেন, তাহলে আমরা তাকে হত্যা করতাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, নবিগণ ইজ্ঞিতের মাধ্যমে হত্যা করেন না। আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ একজন ভালো মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব ও উসমান ইবনু আফফানের সময়ে খিলাফাতের উঁচু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ফজর নামাজে সিজদারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

এ ঘটনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ সত্য ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতি তাঁর অজ্ঞীকার প্রদর্শন করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুর বিরুদ্ধেও গোঁপনে কোনো পদক্ষেপ নেননি।

শিক্ষা

একজন নেতার জন্য শারীরিক ও মানসিক সাহসিকতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে, মানুষ পদবিকে অনুসরণ করে না, সাহসকে করে। বর্তমান সময়ে, নিজের হাতে অন্যের জীবনের দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না বটে; কিন্তু নিজের বিশ্বাসের পক্ষে বা ঝুঁকি নিয়ে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো আনুগত্য তৈরিতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে এবং লক্ষ্যের প্রতি ব্যক্তির নিজের অজ্ঞীকার তুলে ধরে।

এ ধরনের ঘটনাগুলো পরিকল্পনা করে সংঘটিত হয় না। এ কারণে সাহসিকতার গুণটি নেতার মধ্যে সহজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে গড়ে ওঠা উচিত, যেন প্রয়োজনের সময়ে সাহসিকতা নিজে থেকেই প্রস্ফুটিত হয়। নেতৃত্ব সব সময় সামনে থেকে দিতে হয় এবং অনেকসময় এটি বিপজ্জনক জায়গায় পরিণত হয়। স্মরণ রাখা ভালো, কাপুরুষ নেতৃত্বের মতো হীন আর কিছু নেই।

আগেই বলেছি, মানুষ তাদের চোখ দিয়ে শোনে। আপনি কী করেন, তা না দেখা পর্যন্ত আপনি যা বলছেন তারা তার পান্তাই দেবে না। আপনার কথার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার তুলনায় আপনি কী করছেন, তা দেখার প্রতি অনুসারীদের মনোযোগ বেশি থাকে। যদি



নিজেকেও সারিতে রাখা

তারা দেখে যে আপনি তাদেরকে যা বলেন, তা থেকে ভিন্ন কিছু করছেন, তাহলে তারা আপনার উচ্চারিত শব্দকে নয়; বরং আপনার কর্মকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করবে। এভাবে আপনার নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কথা ও কাজের বৈপরীত্যে পড়ে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা নন্ট হয়, হারিয়ে যায়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ সব সময়ই এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তাঁর কথাকে নিজের জীবনে পালনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এ কারণে যখন কেউ সাইয়িদা আয়িশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, উত্তরে তিনি বলতেন, তুমি কি কুরআন পড়নি? তিনি বুঝাতে চাইতেন, রাসূল ﷺ-এর জীবন ছিল কাজের মাধ্যমে কুরআনের বহিঃপ্রকাশ।

সীরাত পাঠ বর্তমানে খুবই উপেক্ষিত। এ পর্যায়ে আমি সীরাত পাঠের গুরুত্বের ওপর জোর দিতে চাই। সীরাত হলো কুরআনের জীবন্ত তাফসীর। মহান আল্লাহ রাক্সল আলামীনের নির্দেশ পরিপালনের পম্বতি সীরাত। আল্লাহর নির্দেশনা কীভাবে অনুসরণ করতে হবে, তা জানার জন্য আমরা যদি সেখানে খোঁজ না করি, তবে কোথায় খুঁজতে চাই? পরিতাপের বিষয়, আমাদের অনেক ধর্মীয় স্কুলেও গুরুত্বের সঙ্গে সীরাত সৃতন্ত্র বিষয় হিসেবে পড়ানো হয় না। শিক্ষার্থীরা রাসূল ﷺ-এর জীবন সম্পর্কে জানতে পারে কেবল সিলেবাসে থাকা হাদীস থেকে, কুরআনের তাফসীর পড়তে গিয়ে শানে নুযুল থেকে। এটা যথেন্ট নয়। আমাদের সীরাত পাঠ করা উচিত। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহ্ন ওয়া তা আলা বলেছেন, অনুসরণের জন্য নবিজির জীবন সর্বোত্তম উদাহরণ। অথচ আমরা তাঁর মহিমান্বিত জীবন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। আমাদের এই মানসিক বৈকল্য কতটুকু মেনে নেওয়ার?

সফলতায় নিশ্চিত বিশ্বাস

মার্কায় সফল না হওয়ায় মুহাম্মাদ ﷺ তায়েফে যাওয়ার সিম্ধান্ত নিলেন। সেখানে হিজাজের আরেকটি বড় গোত্র বনু সাকিফ বসবাস করত। তিনি আশা করেছিলেন, তারা তাঁর আহ্বান অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে গ্রহণ করবে। বনু সাকিফকে কুরাইশদের মতোই আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোত্রগুলোর একটি হিসেবে সম্মান করা হতো। তাদের শহরেও একটি দেব-মন্দির ছিল।

তারা আরও খারাপ প্রমাণিত হলো। নবিজি বনু সাকিফের গোত্রপ্রধানদের নিকট দীনের দাওয়াত পেশ করলেন; কিন্তু শয়তানের প্ররোচনা এমন, যখন তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হলো, তারা তাদের আচার-ঐতিহ্য ভেঙে এমন আচরণ করল যে, ^বনু সাকিফ ও আরবের ইতিহাসে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে এমনভাবে লজ্জিত আর কেউ ^করেনি। আরবরা তাদের অতিথিদেরকে সম্মান জানানোর জন্য বিখ্যাত ছিল। আরবের ইতিহাসে এর অনেক বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হজরত যাইদ বিন হারিসাকে সঙ্গো নিয়ে তায়েফে গেলেন। বনু সাকিফের ^{তিন} গোত্রপ্রধান সহোদরের নিকট ইসলামের বাণী তুলে ধরতে চেম্টা করলেন।



লিডারশিপ লেজনজ

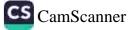
আরবের গোত্রীয় সমাজব্যবস্থায় মেহমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একটি খুবই স্বীকৃত সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেবেছিলেন, মেহমানের সজো সাধারণ সৌজন্যবোধের খাতিরে হলেও বনু সাকিফের নেতারা হয়তো তাঁর কথা খুনবে। সৌজন্যবোধের খাতিরে হলেও বনু সাকিফের নেতারা হয়তো তাঁর কথা খুনবে। বিশেষত তিনি নিজেও যখন অভিজাত কুরাইশ বংশের লোক; কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিশেষত তিনি নিজেও যখন অভিজাত কুরাইশ বংশের লোক; কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিশেষত তিনি নিজেও যখন অভিজাত কুরাইশ বংশের লোক; কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ বুর বিপরীত হলো। সাধারণ সৌজন্যবোধের ধার না ধেরে তারা আরবীয় ঐতিহাকে এর বিপরীত হলো। সাধারণ সৌজন্যবোধের ধার না ধেরে তারা আরবীয় ঐতিহাকে ভুলুষ্ঠিত করল। নিজেদের অপমানিত করে, বংশধারাকে লাঞ্ছিত করে তারা সভাতার ভূলুষ্ঠিত করল। নিজেদের অপমানিত করে, বংশধারাকে লাঞ্ছিত করে তারা সভাতার ভূলুষ্ঠিত করল। তাদের বুঙ্গাঞ্জুল দেখিয়ে আল্লাহের রাস্ললের সঞ্জো অসৌজন্যমূলক আচরণ সকল নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঞ্জুল দেখিয়ে আল্লাহের রাস্ললের সঞ্জো অসৌজন্যমূলক আচরণ তা আলা তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ীই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ তা আলা তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ীই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে পরাজিত হয়ে, বিজিত জনপদের বাসিন্দা হিসেবে তাদের সব সম্পদ মুসলিমদের হাতে এসেছিল। আল্লাহ তাঁর নবি-রাসূলদের সঞ্চো বেয়াদবি ক্ষমা করেন

সমূলুল্লাহ ﷺ বনু সাকিফের তিন গোত্রপ্রধান ভাইয়ের সঞ্জো সাক্ষাতের চেন্টা রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু সাকিফের তিন গোত্রপ্রধান ভাইয়ের সঞ্জো সাক্ষাতের চেন্টা করেছিলেন। দুজন নবিজির সঞ্জো সাক্ষাৎ করলেও একজন প্রত্যাখ্যান করে। তিন ভাইয়ের একজন বলল, আল্লাহ যদি তোমাকে নবি করে পাঠায়, তবে আমি কিসওয়াতুল ভাইয়ের একজন বলল, আল্লাহ যদি তোমাকে নবি করে পাঠায়, তবে আমি কিসওয়াতুল কা'বা ছিড়ে ফেলব। দ্বিতীয়জন বলল, আল্লাহ কি নবি হিসেবে পাঠানোর জন্য তোমার কা'বা ছিড়ে ফেলব। দ্বিতীয়জন বলল, আল্লাহ কি নবি হিসেবে পাঠানোর জন্য তোমার চয়ে ভালো কাউকে পাননি? তৃতীয়জন স্রেফ সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল, আমি তোমার সঙ্গো কথা বলব না, কারণ তুমি যদি সত্যি সত্যিই নবি হও, তবে আমি তোমার সঙ্গো কথা বলার মতো যোগ্য নই। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আমি কেন তোমার সঙ্গো কথা বলব?

সর্বশেষ প্রচেন্টা হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, যদি তোমরা আমার আহ্বান গ্রহণ করতে না পার, তবে অন্তত এই আলোচনাটুকু গোপন রেখো; কিন্তু তারা অস্বীকার করল এবং এর পরিবর্তে তাদের দাস ও অন্যান্যদেরকে লেলিয়ে দিল যেন তারা নবিজিকে গালিগালাজ করে ও পাথর নিক্ষেপ করে শহর থেকে বের করে তাড়িয়ে দেয়। সজ্গী যাইদ বিন হারিসা ఉ রাসূল ﷺ-কে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেন্টা করলেন; কিন্তু লোকেরা চারদিক থেকে পাথর ছুড়ছিল, তারা দুজনই জখম হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এতটা রক্তান্ত হলেন যে, তাঁর রস্ত জুতায় জমাট বেঁধে গেল। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার, মানুব তাঁকেই আক্রমণ করে, যে কেবল তাদের সাহায্য করতে চায়।

ভেবে দেখুন, যে মানুষ কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বিনস্র ও সম্ভ্রান্ত, গোটা সৃষ্টিকুলে আদি বর্তমান ও ভবিষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে গালিগালাজ ও নির্যাতন করার একমাত্র কারণ হলো তিনি এই বাণী প্রচার করছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই।

ম্মরণ রাখবেন, এই মহাবিশ্ব আর জানাত-জাহানামের স্রন্টা সবকিছু দেখছেন। তিনি এমনটি ঘটতে দিয়েছেন, যেন সব সময়ের সকল মানুষের কাছে রাসূলুলাহ ﷺ-এর কমিটমেন্ট প্র্ম্ব্য হয়ে ওঠে। এটা স্রন্টারই ইচ্ছা, মুহাম্মাদ ﷺ হবেন সর্বশেষ নবি এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর বাণী প্রচার করবে তাঁরই অনুসারীরা। এ কারণে অজ্ঞীকারের



নির্জেকেও সারিতে রাখা

এমন একটি মডেল স্থাপিত হওয়া জরুরি ছিল, যেন তা অসহিম্নু পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াতের কাজে নিয়োজিতদের জন্য অনুপ্রেরণার বাতিঘর হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। রাসূল ﷺ-এর জীবনী যে পড়েছে, সে কোনোদিনও বলতে পারবে না, তার কাজ আল্লাহর রাসূলের তুলনায় বেশি কন্টসাধ্য।

এ কারণেই এই বিশ্বজগতের যিনি স্রস্টা এবং সবকিছু যার নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি তাঁর রাসূলের দিকে নিক্ষেপকৃত একটি পাথরকেও আঘাত করা থেকে বাধা দেননি; বরং তাঁর নবি যে ইসলাম প্রচারের জন্য চেস্টার বিন্দুমাত্র কমতি করেননি, সেটার ইতিহাস তৈরি হতে দিয়ে নিজে সাক্ষী হয়ে রয়েছেন।

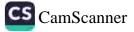
শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং যাইদ বিন হারিসা 🚲 মার্কার দুজন লোকের মালিকানাধীন একটি বাগানে আশ্রয় নিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা দেখে তাদের খ্রিস্টান দাস আদ্ধাসকে দিয়ে কিছু আঙুর এবং পানি দিয়ে তাদের নিকট পাঠালেন। ওই দু-লোক ছিল মূলত নবিজির শত্রুপক্ষ, তবু তারা আরবদের আতিথেয়তার ঐতিহ্য রক্ষার্থে নবিজিকে বিশ্রাম নিতে সুযোগ দিলো ও অন্য যোগাল। আদ্ধাস যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আঙুর দিলেন, নবিজি একটি তুলে নিলেন এবং বললেন, 'বিসমিল্লাহ'। আদ্ধাস বললেন, এ অঞ্চলের লোকেরা তো এই কথা বলে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোখেকে এসেছ এবং তোমার ধর্ম কী?

আদ্দাস বললেন, আমি ইরাকের নিনেভা থেকে আগত একজন খ্রিস্টান। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, মানে তুমি আল্লাহর নবি ইউনূস ইবনু মাত্তার ভূমি থেকে এসেছ। আদ্দাস বললেন, আপনি ইউনূস ﷺ সম্পর্কে কীভাবে জানলেন? রাসূল ﷺ বললেন—তিনি আমার ভাই, কারণ তিনি নবি ছিলেন এবং আমিও একজন নবি। আল্লাহ তাদেরকেই পথ দেখান, যারা সত্যের প্রতি আন্তরিক। আদ্দাস নিচু হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ে, হাতে এবং কপালে চুমু খেলেন। তার মালিকেরা এই দৃশ্য দেখে বলল—দেখেছ, সে কীভাবে সবাইকে বশ করে নেয়? আমাদের দাসও এখন তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে নিল।

আদ্দাস ফিরে এলে তারা জানতে চাইল, কেন তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাতে ও কপালে চুমু খেলেন। আদ্দাস বললেন, এই দুনিয়ায় তাঁর চেয়ে সুন্দর আর কেউ নেই। তিনি আমাকে এমন কিছু বলেছেন, যা একজন নবি ব্যতীত আর কেউ বলতে পারে না। তারা বলল, 'তাঁর কথায় নিজ ধর্ম ত্যাগ করো না। কারণ, তোমার ধর্ম তাঁর ধর্মের তুলনায় উত্তম।' এই আলাপে মজার বিষয় হলো, যারা তাকে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ না করার পরামর্শ দিচ্ছে, তারা নিজেরা মূর্তিপূজারি এবং খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না। তা সত্ত্বেও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল না।

শত্রুতা এক অদ্ভুত রোগ। যারা এ রোগে আক্রান্ত, তারা এমন অন্ধ হয়ে যায় যে, ভালো দ্বিনিসও তারা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না; যদি তা এমন কারও নিকট থেকে আসে, ^{যাকে} তারা ঘৃণা করে।

রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা কল্পনা করুন। তিনি তায়েফের লোকদের নিকট ইসলামকে ^{উপস্থা}পনের চেষ্টায় বিফল হলেন। মাক্বার অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও তাঁর সফলতা খুব



লিডারশিপ লেসন্য

সীমিত। এ ব্যর্থতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ক্ষেত্রে আজ তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে নিপীড়িত এবং নির্যাতিত হয়েছেন, এমন অবস্থায় তাঁর মানসিক অবস্থা কেমন হওয়া উচিত? তিনি সিজদায় নত হয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ করলেন, যা তাঁর সীরাতে বিখ্যাত হয়ে আছে।

তায়েফে নবিজির দু'আ

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আমার দুর্বলতা, রসদের স্বল্পতা এবং লোকদের দ্বারা আমি যেভাবে অপমানিত হয়েছি, তার ব্যাপারে আমার অপারগতা তোমাকেই জানাচ্ছি। হে পরম দয়ালু, হে দুর্বলের রব এবং আমারও রব, তুমি আমাকে কোন জাতির কাছে পাঠিয়েছ? এত দূর সম্পর্কের মানুযের কাছে, যারা আমাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করেছে! নাকি এমন শত্রুর নিকট, যাকে তুমি আমার ওপরে কর্তৃত্ব দান করেছ? তুমি যতক্ষণ আমার ওপর রাগান্বিত না হও, কোনো কিছুতে আমার কিছু আসে যায় না; তোমার করুণাতেই আমার শান্তি ও স্বৃস্তি। আমি তোমার চেহারার নূরের মধ্যে আশ্রয় চাই—যার আলোতে সকল আঁধার দূরীভূত হয়ে যায়, দুনিয়ার সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। তোমার অসন্তুন্টি ও গোস্বা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি তোমার সন্থুন্টি অর্জনে লেগেই থাকব যতক্ষণ তুমি সন্তুন্ট না হও। তুমি ছাড়া কারও কোনো শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নবির দু'আ শুনলেন এবং জিবরাইলকে পাঠিয়ে দিলেন। জিবরাইল আর আরকজন ফেরেশতাকে সঙ্গো নিয়ে আগমন করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আপনার রব আপনার দু'আ শুনেছেন এবং আমাকে নির্দেশ করেছেন এই ফেরেশতাকে আপনার অধীনে দেওয়ার জন্য। আপনি যা নির্দেশ দেবেন, সে তা পালন করবে। ফেরেশতা বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, আমি পর্বতের ফেরেশতা। আপনার রব আমাকে আপনার নির্দেশের জন্য নিজেকে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাকে নির্দেশ করুন, আমি তায়েফের দুই প্রান্তের দুই পাহাড় একত্র করে দিই, যারা আপনাকে নির্যাতন করেছে, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাকে মানুষকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেননি; বরং আমাকে আল্লাহ মানুষকে সেই পথনির্দেশ করার জন্য প্রেরণ করেছেন, যা তাঁকে সন্তুই্ট করে। আমার রবের নিকট আমি প্রত্যাশা করি, এ লোকগুলো যদি আজ্ব আমার বার্তা গ্রহণ নাও করে, তাদের বংশধরেরা একদিন করবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এমনই ছিলেন, তাঁর উদারতা এবং করুণা সকল যুগের জন্যই একটি উদাহরণ।

এ ঘটনার মধ্যে কমিটমেন্টের প্রধান শিক্ষা ছাড়া আরও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। একটি হলো, রাসূল ﷺ-এর প্রতি সাহাবিদের ভক্তি। যাইদ বিন হারিসা ఉ রাসূল ﷺ-এর নিরাপত্তায় নিজের শরীরকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। রাসূল ﷺ-এর প্রতি নিক্ষিপ্ত পাথর তিনি নিজের শরীরে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বদর ও উহুদের প্রান্তরে অন্যান্য সাহাবিরা নবিজিকে দুশমনের তির ও বর্শার আঘাত থেকে রক্ষার জন্য একই কাজ করেছিলেন। আবু তালহা আল-আনসারির ডান হাতে এত সংখ্যক তির



নিজেকেও সারিতে রাখা

বিন্ধ হয়েছিল, যারা তাকে দেখেছে, সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল, কীভাবে তিনি রাসূল স্ক্রুত্র জন্য মানববর্ম হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বর্তমান সময়ে তাঁর সুন্নাহকে রক্ষা করা আর রাসূল ﷺ-এর পবিত্র দেহকে রক্ষা করা সমার্থক। এই যুগে আমরা যখন সুনাহ পালনের মাধ্যমে একে রক্ষা করি, রাসূল ﷺ-এর সম্মান সংরক্ষণ করি এবং যারা তাঁর অসম্মান করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, তখন আমরা হয়তো যাইদ বা আবু তালহা যা করেছিলেন, সেরকম বিশাল কিছু করি না—তবুও আমরা যদি রাসূলের এবং তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুন্ট হবেন, তাঁর মহিমা ও অনুগ্রহে আমাদের পুরস্কৃত করবেন। অনুরূপভাবে সুন্নাত পরিত্যাগ করা, একে আক্রমণ করা, হাদীসের গুরুত্বকে অস্বীকার করার পর্ষা আর তায়েফের লোকদের মতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁর পবিত্র শরীরকে আঘাত করা একই রকম জঘন্য অপরাধ। কোন দলের সঞ্জো আমরা থাকব, সাহাবিদের দলে নাকি কাফির-মুনাফিকদের, জান্নাতিদের দলে নাকি জাহান্নামিদের—সেটা এখন আমাদের পছন্দ।

উল্লেখ্য, রাসূল ﷺ যখন তায়েফের লোকদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, খালিদ আল-উদওয়ানি আস-সাকাফি তখন ছোট বালক ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সূরা তারিক পাঠ করেন এবং আমি সূরাটি শুনে মুখস্থ করে নিই। পরবর্তী সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণের পর বলেন, এ সূরা যখন মুখস্থ করি তখন আমি মুসলমানই ছিলাম না।

এই দু'আর মধ্যে যে বিষয়টি পরিম্কার হয়ে ওঠে, তা হলো—রাস্ল ﷺ কীভাবে আল্লাহর সমীপে নিজের দুর্বলতা ও প্রভাবহীনতার কথা বলেছেন। যারা তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, অপমান বা নির্যাতন করেছে, তাদেরকে তিনি অভিশাপ দেননি। যারা তাঁর বাণী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর আযাব কামনা করেননি। তিনি নিজের দুর্বলতাকে মেনে নিয়ে আল্লাহর কাছে শক্তির প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহকে বলেছেন, যতক্ষণ তিনি (আল্লাহ) তাঁর ওপর সন্তুন্ট রয়েছেন, তিনি পৃথিবীর কোনো কিন্ধুর পরোয়া করেন না। এবং আল্লাহ যদি তাঁর ওপর সন্তুন্ট না হন, তবে তিনি তাঁর সক্ষমতার সম্পূর্ণটুকু দিয়ে কাজ করে যাবেন, যতক্ষণ না আল্লাহ সন্তুন্ট হন।

প্রশংসা আর স্তৃতিতে থেকে লক্ষ্যের প্রতি নির্দিন্ট হওয়া সহজ। যখন আপনার কাজের জন্য আপনি সমালোচিত হচ্ছেন, আপাতদৃন্টে আপনার কোনো সহায়তা নেই, তখন লক্ষ্যের প্রতি নিবিন্ট হওয়া ও নিবেদিত থাকা খুব কঠিন। বিশেষ করে এই সমালোচনা যদি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মতো নোংরা রূপ ধারণ করে, তবে লক্ষ্যে একনিন্ট এবং কর্মে নিবেদিত থাকা সাধারণ পর্যায়ে অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখতে হবে, নিজের পছন্দের পথে অবিচল থাকা, মানুষকে বোঝাতে ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েও সাফল্যের ব্যাপারে সন্দিথন না হওয়া যেকোনো নেতার জন্যই বিশাল এক পরীক্ষা। আঁধার রাতে যখন নিজ অন্ধরের অধকার রাতের অন্ধকারের চেয়েও বেশি স্পন্ট হয়ে ওঠে, যখন একজন ব্যক্তি দশ্যমান কোনো সাহায্য ছাড়া একাকী দাঁড়িয়ে থাকে, তখনই সে বুঝতে পারে, সত্যিকারের সহায়তা ভেতর থেকেই আসতে হবে এবং এটা আসে যখন সে তার সকল সমস্যা একমাত্র সমাধানকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই সমর্পণ করে সুস্তি বোধ করে।



লিডারশিপ লেজনজ

রাসূল ﷺ-এর জন্য তায়েফের ঘটনা ভীতিকর বা আশা হারানোর মতো কিছু ছিল না; বরং তাঁর সংকল্পের নবায়ন এবং উৎসাহের শক্তিবৃদ্ধির উপায় ছিল। তায়েফের এই ঘটনার পর অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটল। যে দুজন ব্যক্তির কাছ থেকে নবিজি সর্বাধিক সহযোগিতা পেতেন, চাচা আবু তালিব এবং স্ত্রী সাইয়িদা খাদিজা 🚓, খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তারাও মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মিশন, অনুসারী এবং নিজের জীবনের প্রতি হুমকি অনেক অনেক বেড়ে গেল। বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের এবং পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি মাক্বা ত্যাগ করতে হলো; কিন্তু এসব কিছুর মধ্যেও যে সত্যটি স্পন্ট হয়ে ওঠে, তা হলো—তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর বাণী প্রচার থেকে বিরত হননি। কেউ তাঁর কথা শুনতে আগ্রহী হোক বা অনাগ্রহী থাকুক—বিরতিহীনভাবে তিনি আল্লাহের একত্বাদের দাওয়াত প্রচার করে যেতে থাকেন। তিনি তাঁর প্রচেন্টায় ঘাটতি করেননি কিংবা আশা ত্যাগ করেননি।

নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী কাউকে শিক্ষাদানের জন্য এ দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কন্ট ভোগ করলেও যারা তাঁকে কন্ট দিচ্ছে, তাদের তিনি অভিশাপ দেননি; বরং এর পরিবর্তে তিনি আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন এবং ঘোষণা করলেন, সকল বাধা মোকাবিলা করে যতক্ষণ না স্রন্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব না হয়—অবিরত চেন্টা চালিয়ে যাবেন। অজস্র বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও প্রচেন্টায় একটুও কমতি না করে এগিয়ে চলা একজন ব্যতিক্রমী নেতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বাধাবিপত্তি তার কমিটমেন্টকে আরও মজবুত ও শানিত করে তোলে।

বিরোধিতার মানে এই নয় যে, আপনি ভুল পথে রয়েছেন; বরং আপনি সঠিক বলেই বিরোধিতার মুখোমুখি হচ্ছেন। এটা আপনাকে দুর্বল নয়; বরং আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

শিক্ষা

আপাতদৃষ্টিতে অবিচলতার দুটি ভিন্নমুখি বিষয় রয়েছে:

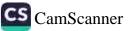
বাস্তবতাকে কোনোভাবে লুকানোর চেম্টা না করে ব্যর্থতার মুখোমুখি হওয়া এবং এ**কই** সঙ্গে সাফল্যের কোনোরকম চিহ্ন না দেখা সত্ত্বেও সফলতার ব্যাপারে গভীর বি**শ্বাস** স্থাপন করা।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী—মানুষ যখন বিশাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, তখন সে নিচের বিষয়গুলো অনুভব করে:

বিচ্ছিন্নতা: ঘৃণা ও অসমর্থনের সমুদ্রে দোদুল্যমান অবস্থা।

হতাশা: ভয় দেখানো, আক্রমণ, পরাজয় ইত্যাদির কারণে লুকানোর ইচ্ছা থাকলেও লুকানোর জায়গার অভাব।

উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলা: নেতৃত্বের অভাব বোধ করা, নির্দেশনার খোঁজে হাতড়ে ফেরা। নিশ্চিহ্ন হওয়ার ভয়: ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ভয় থেকে আডাল গোঁচ্বা।



নিজেকেও সারিতে রাখা

বর্তমানে মুসলমানদের কথা, লেখা ও কাজে যে ধরনের অচলাবস্থা দেখছি, সে মানসিকতা এরকম সময়েই তৈরি হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ দু ধরনের আচরণ করে—তারা ভীত হয়ে পড়ে এবং কুষ্ঠিতভাবে সমালোচনা ও প্রোপাগান্ডা; আত্মসমালোচনায় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথবা তারা শস্তু সিন্ধান্ত গ্রহণ করে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করে এবং তাদের সদস্যদের সকল কর্মকান্ডকে সমর্থন করতে শুরু করে—তা সে যা-ই হোক না কেন।

এ ধরনের সর্বনাশা ও ব্যাপক পরিবর্তনের সময়ে টিকে থাকার জন্য তিনটি উপায় রয়েছে:

- আশা না হারিয়ে নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া
- ২. কী ঘটছে তা অনুধাবন করা এবং
- ৩. এর মধ্য থেকেই পরিত্রাণের উপায় তৈরি করে নেওয়া।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দিদের ওপর চালানো গবেষণা থেকে দেখা যায়, যারা তাদের অবস্থার নির্মম বাস্তবতাকে কোনো রকম রং না লাগিয়ে অথবা কল্পনার রাজ্যে ডুবে না থেকে মেনে নিতে পারে, তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে যায় এবং বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়। তারা সাহায্য অতি নিকটে বলে নিজেদের সান্তনাও দেয় না, আবার কোনো উন্ধারকর্তা এসে উন্ধার করে নিয়ে যাবে বলে অপেক্ষাও করে না। তাদের গ্রেফতারকারী হঠাৎ নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে কিংবা তাদের পক্ষে অবস্থান নেবে, এমন চিন্তাও তারা করে না। সহজ কথায়, তারা নিজেদের বোকা বানায় না; বরং নিজেদের বলে—আমরা ভীষণ বিপদে আছি এবং আমাদের অস্তিতৃ হুমকির সন্মুখীন। এ কারণেই আমরা এখানে। নিশ্চিহ্ন হওয়াসহ এ সবই আমাদের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। তারা তাদের অপহরণকারীদের অভিযুক্ত করে, দোষ দিয়ে, নিজেদেরকে কন্ট দিয়ে, কিংবা আফসোস করে সময় কাটায় না। এর পরিবর্তে তারা নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতিকে গ্রহণ করে। সাহস্রিকতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে এর ভয়াবহতা ও গভীরতা বোঝার চেন্টা করে।

তারা তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কেও আশা ত্যাগ করে না। ঈমান ও আদর্শের জেরে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তারা বেঁচে যাবে এবং গ্রেফতারকারীদের কবল থেকে মুস্তি পাবে। তারা বিশ্বাস করে, প্রতিরোধ করা কিংবা যেকোনো ধরনের শাস্তি হজম করার সক্ষমতা তাদের আছে। এ আত্মবিশ্বাস অবিচলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি এই বোধও থাকতে হবে, সাময়িকভাবে হারলেও তারা অবশ্যই সঠিক পথে রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে।

সাদা চোখে দুটি আপাতবিরোধী আচরণ: নির্মম সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা; কিন্তু যত ক্ঠিনই মনে হোক না কেন, সফলতার আশা ত্যাগ না করা। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম কিছু কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দিদের সাফল্যের মূল চাবি ছিল এগুলো। ইতিহাস বলে, তারা সফল হয়েছিল।



লিডারশিপ লেজনজ একটু বিস্তারিতভাবে ধাপগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক: ১. নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হওয়া (কী ঘটেছে?) ক. রং না লাগিয়ে বা ফ্যান্টাসিতে না ডুবে প্রকৃত বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া খ. অন্তিম সাফল্য সম্পর্কে আশা ত্যাগ না করা গ. যা ঘটেছে তার জন্য নিজেকে বা অন্যদেরকে দোষারোপ না করা ঘ. প্রশংসাও নয়, দোষারোপও নয় ঙ. প্রশ্ন করা 'কী, কেন এবং কীভাবে?' ২. অর্থ উদ্ধার (এই তথ্যাদি কী নির্দেশ করে?) ক. যা ঘটেছে তার কারণ বিশ্লেষণ করা খ. ভেবে দেখা কীভাবে এর প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো গ. বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাগুলো কীভাবে খাপ খায় তা ভেবে দেখা ঘ. বর্তমানকে ছাপিয়ে উন্নততর ভবিষ্যতের খোঁজ করা ঙ. সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিকটবর্তী লক্ষ্য ঠিক করা ৩. কর্মপন্থা গুছিয়ে নেওয়া (কী করা হবে?) ক. বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ভবিষ্যতের কাজ ঠিক করা খ. 'আমিই কেন দুর্ভাগা' ধরনের সিন্ড্রোম থেকে বের হয়ে আসা গ. এখন কী করা সন্তব? ঘ. নিজের সুরক্ষা, রসদ সংগ্রহ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কীভাবে সম্ভব? ঙ. কর্মপ্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাফল্যের অনুপস্থিতিসত্ত্বেও কাজ করে যাওয়ার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায় দাঁডিপাল্লা দিয়ে। আমাদের দেশে শস্য ওজন করার জন্য সাধারণ যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হয়, সেগুলো দেখেছেন? ওপরের একটি দন্ডের দুই প্রান্তে সুতোয় বাঁধা ঝুলন্ত দুটো পাত্র থাকে, যার মাধ্যমে ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয়। একটি পাত্রে বাটখারা এবং অন্য পাত্রে যা ওজন করা হচ্ছে তা রাখা হয়। এর মধ্যে জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথমে সে একপাশে একটি বাটখারা দেয়। ধরা যাক, এর ওজন ২০ কেজি। তারপর সে একটি চামচ সদৃশ পাত্র ব্যবহার করে অন্যপাশের পাত্রে চাল দিতে শুরু করে। পাত্রটি

পরেরবার আপনি যখন চাল বা এই ধরনের কিছু কিনতে যাবেন, তখন বিক্রেতা কী

করে, সেটা খেয়াল করে দেখবেন।



নিজেকেও সারিতে রাখা

যখন পূর্ণ হয়ে যায়, এমনকি এর মধ্যে ১৯ কেজি চাল দেওয়া হয়ে যায়, তখন কী ঘটে? কিছুই না। অবস্থার মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যে পাত্রটিতে বাটখারা দেওয়া, সেটি কাউন্টারের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকে এবং চালভর্তি পাত্রটি শূন্যে ভাসতে থাকে। খেয়াল করে দেখবেন, দোকানদার চাল দেওয়া বন্ধ করে না; কারণ, সে তার চেন্টার ফলে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে না। সে জানে, ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে পাত্রগুলোর মধ্যে সামান্য পরিবর্তন না দেখে, চালের পাত্রটি নিচের দিকে নামতে শুরু না করে, সে চাল দিতে থাকে। দিতে দিতে যখন দাঁড়িপাল্লার পাত্র দুটি প্রায় সমান্তরালে পৌঁছে, তখন সে চাল দেওয়ার পম্বতি পরিবর্তন করে ফেলে। এবার চামচ সদৃশ পাত্রের পরিবর্তে সে হাত ব্যবহার করতে শুরু করে। হাতের মুঠো চাল ভর্তি করে নিয়ে খুব সামান্য পরিমাণে চালের পাত্রে ছাড়তে থাকে। একসময় চালের পাত্রটি কাউন্টারের কাছাকাছি নেমে আসে এবং বাটখারাসহ পাত্রটি চালের সমান সমান শূন্যে ভাসতে শুরু করে।

আমি যখন এটা দেখেছি, এ থেকে আমি জীবনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এর দুটোই সমানভাবে সত্যি:

শিক্ষা-১: ১৯ কিলোগ্রাম না হওয়া পর্যন্ত কিছু হবে না।

শিক্ষা-২: শেষের কিছু দানাই পার্থক্য সম্পন্ন করে।

এই জীবনের ক্ষেত্রেও যখন ১৯ কেজি পরিমাণ প্রচেম্টা চালানো হয়ে গেছে এবং কিছু ঘটছে না বলে আমরা হাল ছাড়তে শুরু করি, তখন আমাদের মনে রাখা ভালো, আসলে তো এতে কোনো কিছু ঘটার কথা নয়! সত্যিকারের কিছু ঘটাতে চাইলে পাল্লায় আমাকে আরও এক কেজি তুলতে হবে। এটা যে বুঝতে পারে, সে আশা বা শস্তি হারায় না; বরং শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষায় হাসতে শুরু করে। কারণ, সে জানে খুব শীঘ্রই পাত্রটি কাউন্টারের ওপর নেমে আসবে।

লক্ষ্যের অগ্রাধিকার

একজন নেতার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় সে কোন বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, নাকি চূড়ান্ত লক্ষ্যের সফলতা? বিষয়টি কঠিন পরীক্ষা হওয়ার কারণ হলো, প্রায়ই এমন প্রয়োজন উদ্ভূত হয়, যেখানে আপনাকে নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ পাশে রেখে আপনি এমন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও কাজ করতে হতে পারে—যাকে আপনি অতীতের কোনো কারণে অপছন্দ করেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এ বিষয়ে অসাধারণ উদাহরণ স্থাপন করেছেন। বিখ্যাত সামরিক কমান্ডার খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ প্রথম জীবনে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও ইসলামের শত্রু ছিলেন। উহুদযুদ্ধের দিন যে ঘটনার পরিণতিতে রাসূল ﷺ-এর চাচা হজরত হামজা বিন আবদুল মুন্তালিবসহ ৭০ জন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পেছনে তিনি দায়ী ছিলেন। হামজা 🐞 মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমবয়সি এবং



;

Contraction of the second s

লিডারশিপ লেজনজ

প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি রাসূল ﷺ-এর শক্তি ও সহযোগিতার অন্যতম উৎস ছিলেন। তার মৃত্যুতে নবিজি গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও খলিদ অন্যতম উৎস ছিলেন। তার মৃত্যুতে নবিজি গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও খলিদ অন্যতম উৎস ছিলেন। তার মৃত্যুতে নবিজি গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও খলিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আস যখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মাদীনায় গমন বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আস যখন ইসলামে গ্রহণের উদ্দেশ্যে মাদীনায় গমন করলেন, রাসূল ﷺ তাদের স্বাগত জানালেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সকল

শত্রতা ক্ষমা করে দেশেন। আমর ইবনুল আস বলেন, আমি বদরযুম্থে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুম্থে যুম্থ করেছি; কিন্তু আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি উহুদযুম্থে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুম্থে যুম্থ করেছি; কিন্তু আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি খন্দকের যুম্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুম্থে ফুথ করেছি; কিন্তু আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম, যা-ই যুম্থ করেছি; কিন্তু আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম, যা-ই হাক না কেন, মুহাম্মাদ ﷺ জয়লাভ করতে যাচ্ছেন। তাঁর বাহিনী দিনে দিনে শন্তিশালী হোক না কেন, মুহাম্মাদ ﷺ জয়লাভ করতে যাচ্ছেন। তাঁর বাহিনী দিনে দিনে শন্তিশালী হেছিল। তাঁর দু 'আ হচ্ছিল আরও শন্তিশালী। আর আমাদের অবস্থা দিন দিন আরও হচ্ছিল। তাঁর দু 'আ হচ্ছিল আরও শন্তিশালী। আর আমাদের অবস্থা দিন দিন আরও হচ্ছিল। তাঁর দু 'আ হচ্ছিল আরও শন্তিশালী। আর আমাদের অবস্থা দিন দিন আরও হাক্ষিণ হচ্ছিল। ফলে আমার হৃদয় ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ছিল। আমি মাক্কা তাগ করে গংকীর্ণ হচ্ছিল। ফলে আমার হৃদয় ধীরে ধীরে রুঁকে পড়ছিল। আমি মাক্কা তাগ করে করিও। তারপর হুদাইবিয়ার সন্থি হলো; যেখানে কুরাইশরা রাস্ল ﷺ-কে স্বীকৃতি ও তাঁর সঞ্জো চুন্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলো।

আমন বিদেশ হাত বিশেষ বিধান জানতেন যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর মার্কা বিজয় অনিবার্য। অপর দিকে আমর ইবনুল আস জানতেন যে, রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর মার্কা বিজয় অনিবার্য তিনি মার্কা ও তায়েফকে বিবেচনা থেকে বাদ দিলেন। কারণ, দুটো শহরই রাস্ল ছি-এর দখলে আসবে। কিছু বিশ্বস্ত লোককে ডেকে তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ৠ্ট-এর দখলে আসবে। কিছু বিশ্বস্ত লোককে ডেকে তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একসময় কুরাইশদেরকে গ্রাস করে নেবে। তাই আমার শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একসময় কুরাইশদেরকে গ্রাস করে নেবে। তাই আমার মনে হয়, আমাদের এখন মার্কায় থাকা উচিত হবে না; বরং চলো, আমরা আবিসিনিয়ায় খ্রিস্টান রাজা নাজাশির অধীনে বসবাস করতে শুরু করি। মুহাম্মাদ ﷺ যদি বিজয়ী হয়, তবে আমরা তাঁর থেকে দূরে; আর কুরাইশরা বিজয়ী হলে তারা জানবে আমরা তাদের সজ্জাই আছি। তিনি আরও বলতেন, যদি সকল কুরাইশও মুসলমান হয়ে যায়, আমি মুসলমান হব না।

সূতরাং তারা সবাই মিলে মার্কা ছেড়ে আবিসিনিয়ায় চলে যাওয়ার সিম্ধান্ত নিলেন। আবিসিনিয়ার তখনকার রাজা নাজাশির জন্য চামড়া দিয়ে হাতের তৈরি বিভিন্ন জিনিস উপহার হিসেবে সঙ্গো নিলেন। তারপর নৌকায় চড়ে আবিসিনিয়ায় পাড়ি জমালেন। পৌঁছার পর তারা দেখলেন, আমর বিন উমাইয়া আদ-দামারি নাজাশির দরবার থেকে বেরিয়ে আসছে। রাস্ল ﷺ তাকে তাঁর বার্তাবাহক করে আবু সুফিয়ানের মেয়ে উন্মে হাবীবাকে বিয়ে করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। উন্মে হাবীবা আবিসিনিয়ায় হিজরাত করেছিলেন, যেখানে তার স্থামী ইন্তিকাল করেন। রাস্ল ﷺ এবং নাজাশি এই বিয়ের আয়োজন করেন এবং আমর বিন উমাইয়া ছিলেন রাসূল ﷺ-এর প্রতিনিধি।

আমর ইবনুল আস তার বন্ধুবর নাজাশির দরবারে প্রবেশ করলেন। প্রথানুযায়ী নাজাশিকে সিজদা করলেন। নাজাশি তাকে উন্ন অভ্যর্থনা জানালেন। জানতে চাইলেন, তার জন্য কোনো উপহার এনেছে কি না। আমর ইবনুল আস তার সঙ্গো আনা চামড়ার তৈরি উপহারসামগ্রী পেশ করলেন। রাজা অত্যন্ত খুশি হলেন। অভ্যর্থনা শেষে আমর ইবনুল



নিজেকেও সারিতে রাখা

আস বললেন—হে রাজা, আমি এই মাত্র একজনকে আপনার দরবার থেকে বের হয়ে যেতে দেখলাম, যে আমাদের ওই শত্রুর লোক, যে শত্রু আমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে হত্যা করেছে। আপনি কি তাকে আমার নিকট হস্তান্তর করবেন, যেন আমি তাকে হত্যা করতে পারি? এই কথায় নাজাশি প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে আমর ইবনুল আসের মুখে এত জোরে আঘাত করলেন যে, তিনি পড়ে গেলেন। তার নাক দিয়ে এত রক্তপাত হতে লাগল, তিনি ভাবলেন তার নাক ভেঙে গেছে। কী করা উচিত, বুঝতে পারছিলেন না। তিনি একজন রাজার দরবারে দাঁড়িয়ে সবার সামনে অপমানিত হয়েছেন; অথচ প্রতিশোধ নেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলেন, যে লজ্জা ও ভয় আমি পেয়েছি, মাটি যদি আমাকে গিলে ফেলত।

নিজের মানসম্মান রক্ষার প্রচেন্টায় তিনি বললেন—হে রাজা, যদি জানতাম আমি যা বলেছি তা আপনি অপছন্দ করবেন, তবে তা বলতাম না। নাজাশি বললেন—হে আমর, তুমি আমাকে বলছ তাকে তোমার কাছে হস্তান্তর করতে, বলছ যার কাছে নামৃস আল আকবার (জিবরাইল) আগমন করে!

আমর ইবনুল আস বলেন, আমি তখনই অনুভব করলাম আমার হুদয় পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি নিজেকে বললাম, সকল আরব-অনারব এটা বুঝতে পারল, আর আমি পারলাম না? তাই তিনি নাজাশিকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি আপনার সাক্ষ্য? নাজাশি বললেন, আল্লাহর সামনে এটাই আমার সাক্ষ্য। তারপর নাজাশি বললেন, আমার কথা শোনো আমর, তুমি তাঁর অনুসারী হয়ে যাও। কারণ, আল্লাহর নামে বলছি, মুসা স্ট্র্য্য যেভাবে ফেরাউনের ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন, তিনিও সেভাবে তাঁর সকল শত্রুর ওপর বিজয়ী হবেন।

এ কাহিনিতে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশি কখনোই রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি, তবুও তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন, মুসলমান হয়েছেন। তখনো তার রাজ্য খ্রিস্টান ধর্মাবলাম্বী ছিল। রাসূলকে কখনো না দেখা, খ্রিস্টানদের মাঝে বসবাস করা বাদশাহ নাজাশি এমন এক ব্যক্তিকে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, যিনি ১৩ বছর রাসূল ﷺ-এর পাশেই বসবাস করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। দাওয়াহর ক্ষেত্রে কোনো যুক্তিই বাধা মানে না। আমর ইবনুল আস নাজাশির কাছে রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ এবং ইসলাম গ্রহণের বাই 'আত পেশ করলেন। নাজাশি আনন্দচিত্তে তার বাই 'আত গ্রহণ করলেন। আমর ইবনুল আসের পোষাক রক্তান্ত হয়ে গিয়েছিল বলে নাজাশি তাকে নতুন পোষাক দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। নাজাশির দরবার ত্যাগ করে আমর ইবনুল আস নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলেন।

তার বন্ধুরা তাকে নতুন কাপড় পরিহিত দেখে খুব খুশি হলো। তারা জানতে চাইল, আমর বিন উমাইয়া আদ-দামারিকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নাজাশি রাজি হয়েছে কি না? আমর ইবনুল আস 🖑 বললেন, আজ যেহেতু প্রথম সাক্ষাৎ, আমি তাকে চাইনি। আগামীকাল আবার দেখা হলে তাকে চাইব। তার সাথিগণ ভাবলেন, এটা ভালো বুন্ধি। তারপর তিনি তাদের কিছু কাজ আছে বলে নৌকা নিয়ে মাদীনার উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি তার বন্ধুদের কোথায় যাচ্ছেন তা না বলে, কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে, তাদেরকে আবিসিনিয়ায় রেখে মাদীনায় চলে গেলেন।



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft লিডারশিপ লেজনজ

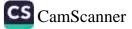
মাররাদ দাহরান নামক স্থানে পৌঁছে দুজন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, একজন তাঁবুতে অন্যজন উট বাঁধছে। তারা ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ ও উসমান ইবনু তালহা। তিনি তাদের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, তারা কোথায় যাচ্ছে? খালিদ বিন ওয়ালিদ জ্বাব দিলেন, আমাদের কোনো কিছুরই আর বিন্দুমাত্র মূল্য নেই; মুহাম্মাদ বিজয়ী হচ্ছেন, তাই আমি ভাবছি আমাদের তাঁর সঙ্গো যোগ দেওয়া উচিত। আমর ইবনুল আস বললেন, আমিও ঠিক তা-ই ভাবছিলাম। সুতরাং তারা একত্রে চলতে লাগল। কেউ তাদের আসতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবগত করলেন, এই দুলোকের আগমনের মধ্য দিয়ে মার্কা তার নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে তুলে দিলো। এরা দুজন ছিল ইসলামের শত্রুদের শীর্ষ দুই নেতা। তাদের পূর্বপুরুষ, ওয়ালিদ বিন মুগিরা, উতবা বিন রাবিয়া, উমাইয়া বিন খালাফ, আবু জাহল, আবু লাহাব ও অন্যান্যরা নিহত হয়েছিল। মুরক্বি প্রজন্মের একমাত্র আরু সুফিয়ান জীবিত ছিল। হয়তো বদরযুম্থে অংশগ্রহণ না করায়; নেককারদের কাতারে শামিল করার জন্য আল্লাহ তখনো তাকে হায়াত দিয়ে রেখেছিলেন। ফলে দ্বিতীয় প্রজন্ম তখন সমাজে ও সমরে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

রাসূল ﷺ তাদের আসতে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি মৃদু হাসছিলেন। উভয়ের দ্বারা কৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। এই তরুণ নেতাদেরকে নিজের সঙ্গো পাওয়া এবং ইসলাম প্রচারে তাদের ভূমিকার ভবিয্যৎ সম্পর্কে তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। আমর ইবনুল আস বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এই শর্তে, আপনি আল্লাহকে বলবেন—তিনি যেন আমার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমর। তুমি কি জানো না, ইসলাম গ্রহণ তার পূর্বের সব গুনাহ মুছে ফেলে, হিজরাত তার পূর্বের সব গুনাহ মুছে ফেলে, হাজ্জ তার পূর্বের সব গুনাহ মুছে ফেলে? আমর বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর জীবনের পুরোটা সময় আমাদের যত্ন করেছেন। আবু বাক্র ও 'উমারও আমাদের সঙ্গা দিয়েছেন। খালিদ বিন ওয়ালিদের সঙ্গো 'উমার ইবনুল খাত্তাবের সম্পর্ক এমন ছিল— 'উমার র্রু এমন কিছুকে অপছন্দ বা অমনোনীত করতেন না, যা খালিদ 🦛 পছন্দ কিংবা মনোনীত করেছেন।

মাক্বা বিজয়

এরপর রাসূল ﷺ দীর্ঘ আট বছর পর মার্কায় প্রবেশ করেন। তের বছর ধরে মুসলিমরা মার্কায় সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করেছেন, তারপর তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তাদের সহায় সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে; কিন্তু এখন যখন সাহাবিদের জামা'আত নিয়ে নবিজি মার্কায় প্রবেশ করছেন, তিনি সূরা ফাত্হ পাঠ করতে করতে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গো সামনে এগুচ্ছেন। মাথা তাঁর এত নিচু যে, পবিত্র শার্শ্রু উটের পিঠে বাঁধা জিন প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

তিনি কাবা ঘর তাওয়াফ করলেন। তারপর উসমান বিন তালহাকে ডেকে কাবার চাবি আনতে বললেন। আজ চৌদ্দশো বছর পরও উসমান বিন তালহার পরিবার বনু আবদিদ দার কা'বার চাবি সংরক্ষণকারী। উসমানের মা প্রথমে দিতে অস্বীকার করলেও



নিজেকেও সারিতে রাখা

পরে চাবি দেন। উসমান বিন তালহা রাসূল ﷺ-কে চাবি এনে দিলে তিনি কাবার দরজা খোলেন। কাঠের তৈরি একটি কবুতরের মূর্তি ছিল, তিনি ওটা ধ্বংস করেন। ফেরেশতাদের কাল্পনিক ছবি ছিল; একটি ছবি ছিল যেখানে হজরত ইবরাহীম ধ্র্য্য দ্রুশ্বরিক তির নিক্ষেপ করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা তাদের ধ্বংস করুন। তারা আমাদের পূর্ববর্তীদের এমন কিছু কাজকর্ম দেখাচ্ছে, যা তারা কখনো করেননি।

নবিদ্ধি হজরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে সব চিত্র মুছে ফেলার নির্দেশ দিলে তা পালন করা হলো। তারপর তিনি বের হয়ে এসে প্রবেশপথের উঁচু স্থানে দাঁড়ালেন। এবার সবাই শ্রুম্বার সঙ্গো তাঁর কথা শোনার জন্য এগিয়ে এলো। প্রথম ওয়াহি নাযিলের পরে যখন তিনি সবাইকে ডেকেছিলেন, তখন তারা যে ঔম্বত্য দেখিয়েছিল, তার তুলনায় এ এক বিশাল পরিবর্তন। তিনি যখন জমজমের নিকট গিয়ে অজু করলেন, সাহাবিরা তাঁর বাহু চুয়ে পড়া পানির বারকাহ লাভের জন্য ছুটে গেলেন। মার্কার লোকেরা এ দৃশ্য দেখে বলল, আমরা এর আগে কখনোই এরকম বাদশাহ দেখিনি। রাসুল ﷺ সে একই ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু আজ তাঁর এমন ক্ষমতা যে, সকলেই তাঁর কথা শুনতে এসেছে, তাঁর যেকোনো নির্দেশ পালনের জন্য অপেক্ষা করছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার শুরুতেই বললেন:

সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সকল শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন। এরপর তিনি বলেন, কাউকে দুর্ঘটনা কিংবা ভুলক্রমে হত্যা করা হলে তার পরিবারকে রক্তপণ বাবদ ১০০ উট প্রদান করা হবে। জাহিলি যুগের সকল বংশভিত্তিক সকল আভিজাত্য আজ সমাপ্ত হলো। এই সকল অহংকার আমার পায়ের নিচে। রাসূল ﷺ-এর হাতে কা'বা ঘরের চাবি ছিল। আলি ইবনু আবি তালিব বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, হাজিদের খাওয়ানো এবং কা'বা ঘরের চাবি সংরক্ষণের সম্মান আমাদের দান করুন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ উসমানকে ডেকে বললেন—এটা নাও, সারাজীবন তোমাদের কাছে রাখো, জালিম ছাড়া কেউ কখনো তোমাদের কাছ থেকে এটা নেবে না। আজ পর্যন্ত সেই একই পরিবার কা'বার চাবি সংরক্ষণ করে চলেছে। তাদের কাছ থেকেই সৌদি আরবের শাসক বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে চাবি সংগ্রহ করে নিয়ে আবার ফেরত দেয়। রাসূল ﷺ তাঁর উটে চড়ে কা'বার চারদিকে প্রদক্ষিণ করলেন। হাতের লাঠি দিয়ে কা'বায় স্থাপিত মূর্তিগুলোর দিকে ইক্সিত করলেন। অমনি সেগুলো ফেলে দেওয়া হলো। কা'বার চারদিকের ৩৬০টি মূর্তির ক্ষেত্রেই তিনি এ কাজ করলেন। তিনি পাঠ করলেন,

বিলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই [সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১]

তারপর তিনি কুরাইশদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী ধারণা, আমি তোমাদের সঞ্জো কীরূপ আচরণ করব? তারা বলল, আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই, আমাদের সম্মানিত ভাইয়ের সন্তান। তিনি বললেন, যাও তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত। তারা ছিল রাসূল

লিডারশি**ট জেন্দ্রিন্টা**essed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ﷺ-এর বন্দি। চাইলে তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করতে পারতেন; কিন্তু কোনোরকম মুক্তিপণ ছাড়াই তিনি তাদের মুক্ত করে দিলেন। এ কারণে মান্ধার যারা মান্ধা বিজ্ঞদ্বে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের বলা হতো আত-তুলাকা। আল্লাহর রাসূল ﷺ হজরত বিলাল বিন রাবাহকে আযান দেওয়ার জন্য নির্বাচন করে কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। একজন মুহাদ্দিস বলেছেন, তিনি মুশরিকদের ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্য এমনটি করেছিলেন। রাসূল ﷺ তৎকালীন সকল প্রকার বর্ণ ও গোত্র-প্রথা ধ্বংস করে শুধু ধার্মিক ব্যক্তির মর্যাদা যে সুউচ্চে, তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ কাজ করেছিলেন।

সাইয়িদ বিন মুসাইয়িব বলেন, মার্ক্বা বিজয়ের রাত সাধারণ বিজয়ের মতো উৎসবের ছিল না। সাহাবিরা কা'বা তাওয়াফ করছিলেন, সারা রাত ধরে তাকবীরে তাহলীল পড়ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার স্ত্রী হিন্দার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার কী ধারণা—এই ধর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে? তিনি উত্তর দিলেন—হাঁ, এটা আল্লাহর তরফ থেকে। পরে আবু সুফিয়ান আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাসূল ﷺ তাকে বলেন, তুমি হিন্দার কাছে জানতে চেয়েছ, এটা আল্লাহর তরফ থেকে কিনা! আবু সুফিয়ান বললেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মাক্তাকে 'হারাম বা পবিত্র নগরী' ঘোষণা করলেন; যেখানে মারামারি, শিকার এবং গাছ কাটা নিষিন্ধ। একই নিয়ম মাদীনায় মাসজিদে নববির আশেপাশেও প্রযোজ্য।

একটি ঘটনা দিয়ে সেই বর্ণনা শোনাই। মু'আবিয়া ক্রাইরাকে তার বাসায় নিমন্ত্রণ করতে চাইলেন। আবু হুরাইরা রেশি নিমন্ত্রণ করতেন এবং এই তাবেয়ি চাচ্ছিলেন আবু হুরাইরাকে নিমন্ত্রণ করতে। তাই তিনি খাদ্য প্রস্তুত করে আবু হুরাইরা ক্রেলেন, তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। অর্থাৎ আমি তোমাকে দাওয়াত করার আগেই তুমি আমাকে দাওয়াত করেছ।

সন্ধ্যায় খেতে এসে তিনি মেজবানকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলব, যা তোমার জন্য? উপস্থিতিরা তাকে বলার অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মাক্কায় এলেন, যুবাইর ﷺ একটি অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ আরেকটির এবং আবু উবাইদা ﷺ পদাতিক সেনাবাহিনীর। আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন তার ব্যাটালিয়নে। তিনি আমাকে দেখে বললেন—হে আবু হুরাইরা, আনসারদের আমার কাছে ডেকে পাঠাও, আনসাররা ছাড়া আর কেউ যেন না আসে। আমি আনসারদের ডাকলাম। তারা সবদিক থেকে এসে রাসূল ﷺ-এর চারদিকে জড়ো হলো। রাসূল ﷺ বললেন, আবু সুফিয়ানের গৃহে যে প্রবেশ করল, সে নিরাপদ। যে নিজের গৃহে প্রবেশ করল, সে নিরাপদ। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি বলেছ যে, আমি তোমাদের ছেড়ে এখন মাক্কায় অবস্থান করব? তারা বলল, জি। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা। আমি আল্লাহর দিকে এবং তোমাদের কাছে হিজরাত করেছি।



নিজেকেও সারিতে রাখা

আমার জীবন তোমাদের সঙ্গো এবং আমার মৃত্যুও তোমাদের সঙ্গো। তারা কাঁদতে শুরু করে বললেন, আমরা এ রকম বলার কারণ আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ সাক্ষী, তোমরা সত্য বলেছ।

শিক্ষা

যারা আপনাকে নির্যাতন করেছে, তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কাজ; বিশেষ করে যখন আপনার ক্ষমতা আছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে যারা নির্যাতন করেছে, ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা তাদের ওপরই তাঁকে ক্ষমতা দান করেছেন। প্রতিশোধ গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর ছিল; কিন্তু তিনি প্রতিশোধ নেননি; বরং ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে ঋণের বাঁধনে জড়িয়ে ফেললেন। রাসূল ﷺ মান্ধা বিজয়ের ফলে তারা যখন তাঁর ক্ষমতার অধীন, তখন নিজেদের অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অবগত ছিল, ফলে তাঁর ক্ষমাসুলভ আচরণে তারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিল।

রাসূল ﷺ যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন, তাহলে যে শত্রুতা তৈরি হতো, শত্রুদের একতরফা ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে সে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়াটাও একটি বিশাল উপকারিতা। যে সমাজে তুচ্ছ বিষয়েও দন্দ হয়, সেখানে শত্রুদেরকে হত্যা করলে তার প্রভাব কেমন হতো, ভেবে দেখা উচিত। বিচক্ষণতার সঙ্গে নবিজি ﷺ এদের সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়ার মাধ্যমে দয়া, মানবতা ও ক্ষমার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁর বদান্যতায় মুধ্য হয়ে শত্রুদের অধিকাংশ মুসলিম উদ্মাহর অন্তর্গত হয়ে গেল। অতি সূক্ষ এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি সারা জীবনের জন্য নিজের ঘরকে রক্ষা করলেন। ক্ষমা হলো আত্মার মলম, শুধু যাকে ক্ষমা করা হলো, তার জন্যই নয়, যে ক্ষমা করে, তার জন্যই; বরং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজের জন্য বড় হৃদয়ের অধিকারী হতে হয়; আল্লাহর নবি ছাড়া আর কার হৃদয় এত বড় হতে পারে?

মৃতি শক্তিশালী কিংবা দুর্বল হতে পারে। অনিষ্টের মৃতি সারাজীবন জাগরৃক থেকে প্রতিশোধ স্পৃহা আমাদের জীবন ও সম্পর্ককে ধ্বংস করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষমা এমন মলম, যা ক্ষতকে কার্যকরভাবে উপশম করে। মহান রাব্বল আলামীন দয়াপরবশ হয়েই ক্ষতিগ্রস্ত বা জুলমের শিকার অনেক ব্যক্তিকে এই গুণ দান করেন। একমাত্র সে-ই মন থেকে ক্ষমা করতে সক্ষম হয়। এই সক্ষমতার বাস্তবায়ন যদি সে ঘটায়, আল্লাহর জন্য যেমন শত্রুতা, আল্লাহর জন্যই তেমন ক্ষমা করে দেয়, তবে সে নিজেকে সুস্থ করে নেয়, পাশাপাশি যে তাঁর প্রতি অন্যায় করেছিল, তাকেও। আমাদের প্রতি কেউ অন্যায় করলে তাকে ক্ষমা করা খুব কঠিন মনে হতে পারে। তবে আমরা যদি বুঝতে পারতাম সেই অন্যায়ের মৃতি বহন করে বেঁচে থাকার চেয়ে ক্ষমা করে দেওয়া অনেক সহজ, তবে আমরা ক্ষমাকেই প্রাধান্য দিতাম। ক্ষমার মাধ্যমে কন্টের বোঝা অপসারণ করে নতুন ভোরের দিকে এগিয়ে যাওয়া অনেক সহজ। রাসূল ﷺ তা-ই করেছিলেন।



নিডরেশিপ নেজনাম

শত্রদের নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেওয়ার ফলে লাভ হয়েছিল যে, কেউ বিদ্রোহ করতে চাইলেও নৈতিক অবস্থানের কারণে তা করতে পারল না। যে ব্যক্তি আপনার ভালো করেছে, তার অনিষ্ট করার ব্যাপারে কে আপনাকে সহায়তা করবে? এই এক কাজের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ 🚖 তাঁর শাসন সংহত করলেন, নতুন বন্ধু ও সমর্থক বানালেন এবং তাঁর পিতৃভূমিতে ইসলাম প্রবেশের দরজা খুলে দিলেন। এর ফলাফল এতই সুদূরপ্রসারী ছিল যে, তাঁর ওফাতের পরে একমাত্র এই মাক্বা থেকে কোনো প্রকার বিদ্রোহ হয়নি। আবু বাক্র 🦛 যখন অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিদ্রোহ মোকবিলা করছেন, তখন মাক্বা সম্পর্কে তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না।



কথা ও কাজের মিল

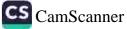
রাসূল ﷺ প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে শুধু প্রচারই করেননি, কর্ম দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিবেশীর কাছে সর্বোন্ডম ছিলেন। নারীর অধিকার সম্পর্কে কথা বলেছেন। এমন একটি আইন প্রণয়ন করেছেন, যেখানে নারীদের যথোপযুক্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমনকি টোদ্দশ বছর পরে বর্তমান সময়েও কোনো আইন ব্যবস্থায় এমন উন্নত বিধান নেই। তিনি সত্যবাদিতার মূল্য সম্পর্কে প্রচার করেছেন; নিরেট সত্যবাদিতার জন্য তাঁর শত্রু কুরাইশের কাফিররাও তাকে 'আস-সাদিক আল-আমিন' বা সত্যবাদী ও বিশ্বাসী নামে ডাকত। তিনি নিজের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করেছেন। সজ্ঞীদেরকেও নিজেদের জীবনে পালন করতে শিখিয়েছেন। এর ফলাফল হলো, ইসলাম গোটা পৃথিবিতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচার-প্রচারণার চেয়ে ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের অনুশীলন মানুষকে অনেক বেশি প্রভাবিত করতে সক্ষম। রাসল ﷺ তাঁর নিখুঁত উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনः যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে (কল্যাণের) আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাস্লুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। [সূরা আহযাব, ৩৩: ২১]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যুহরির একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছেন, মার্কা বিজয়ের পর ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটার কারণ হলো, প্রথমবারের মতো অমুসলিমরা সাধারণ মুসলমানদের জীবনযাপন পর্ম্বতি খুব কাছ থেকে দেখে সত্য ও সুন্দরকে অনুধাবন করতে পেরেছিল। এখানে মজার বিষয় হলো, ইমাম যুহরি ইসলামের উৎকর্ষতা বিষয়ে অন্যকে প্রভাবিত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হিসেবে একজন সাধারণ মুসলমান ব্যক্তির জীবনযাপন পর্ম্বতির উল্লেখ করেছেন। মানুষ তাদের চোখ দিয়ে শোনে। একটি জীবন পন্ধতিতে তারা তখনই প্রভাবিত হয়, যখন তারা এর প্রবক্তাদেরকে সেই মতো জীবনযাপন করতে দেখে। যদি তারা দেখে যারা এই মত প্রচার ক্রছে, তারা নিজেরাই তা পালন করছে না, তখন যত কথাই বলা হোক না কেন, মানুষ তাতে প্রভাবিত হয় না; বরং এই কথা-কাজের অমিল বার্তার সকল বিশ্বাসযোগ্যতা নন্ট করে দেয়। আল্লাহের রাসুল **#্র** এবং তাঁর সজ্ঞীসাথিরা তা কখনেই হতে দেননি।

রাসূল ﷺ মানবাধিকার এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে প্রচার করেছেন। মুসলমান ^{হোক} বা না হোক, প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। একবার

229



আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এটা ব্যক্তিগত পরিকল্পনা। তখন তিনি বললেন, আমাদের উচিত হবে তাদের সবচেয়ে কাছের কৃপ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করা। তারপর কৃপ বন্ধ করে দিয়ে একটি চৌবাচ্চা নির্মাণ করে সেটা পানি দিয়ে পূর্ণ করা এর ফলে তারা পানি পাবে না। রাসূল ﷺ তাঁর এই পরামর্শ পছন্দ করে গ্রহণ করলেন এবং সে অনুযায়ী নির্দেশ দিলেন।

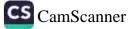
যুন্ধের রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি সুপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে তিনি শত্রুদলের সেনাবাহিনীকে প্রকৃত আকারের তুলনায় ছোট দেখলেন। পরের দিন সকালে বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির কারণ মুসলমানদের দিকের বালুমাটি ভিজে শক্ত ও সমতল হয়ে গেল। অন্যদিকে কুরাইশদের দিকে বৃষ্টির তোড়ে কাদামাটি পিচ্ছিল হয়ে গিয়ে তাদের চলাফেরা কঠিন হয়ে পড়ল। একই বৃষ্টি দু-দলের ওপরই পড়ল; কিন্তু ফলাফল হলো দুরকম। এটা বদরের যুদ্ধের অনেকগুলো অলৌকিক বিষয়ের একটি। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর এই দয়া সম্পর্কে বলেন,

যখন তিনি তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করে নেন, তা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের ওপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যেন তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন এবং যেন তোমাদের থেকে দূর করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পাগুলো। [সুরা আনফাল ৮: ১১]

মুসলিম সেনাবাহিনীতে ৩০০-৩১৭ জন সদস্য ছিলেন। যাদের ৮২-৮৬ জন মুহাজির, আওস গোত্র থেকে ৬১ জন এবং খাজরাজ গোত্রের ১৭০ জন। তারা সুসজ্জিত ছিলেন না এবং যথেন্ট মাত্রায় প্রস্তুতও ছিলেন না। কেবল যুবাইর বিন আওয়াম ও মিকদাদ বিন আসওয়াদের কাছে দুটি ঘোড়া ও প্রতি দুই বা তিনজনের মধ্যে একটি করে মোট ৭০টি উট ছিল। রাসূল ﷺ, আলি ইবনু আবি তালিব ও মারসাদ বিন আবিল মারসাদ আল-গানাওয়ির জন্য একটি উট ছিল। রাস্ল্লাহ ﷺ-এর বাকি দুই সজ্ঞী তাকে উটটি এককভাবে ব্যবহারের প্রস্তাব করলে নবিজি তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, তোমরা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও এবং তোমাদের মতো আমিও অধিক পুরস্কারের প্রত্যাশী।

তিনি নেতৃত্বের এমন একটি মান স্থাপন করেছিলেন, যেখানে নেতা তার অনুসারীদের সমান। কেবল পার্থক্য হলো, নেতা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এটা এমন এক বিষয়, যা অনুসারীদের তাদের নেতাকে ভালোবাসতে এবং দ্বিধাহীন চিন্তে অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে।

মাদীনার দায়িত্ব প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুমের ওপর ন্যস্ত করা হলেও পরবর্তী সময়ে আবু লুবাবা ইবনু আবদিল মুনযিরের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যুদ্ধে সামগ্রিক নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হলো মুস আব বিন উমায়ের আল-কুরায়েশি আল-আবদারির ওপর এবং তাদের পতাকার রং ছিল সাদা। ছোট সৈন্যবাহিনীটিকে দুভাগে ভাগ করা হলো। আলি ইবনু আবি তালিবের পতাকাতলে মুহাজিররা এবং সাদ বিন মু আজের পতাকাতলে আনসাররা। যুবাইর ইবনল আওয়ামকে ডান ভাগ, মিকদাদ ইবন আমরকে বাম.



ঝুঁকি গ্রহণ

আর সামনের সেনাদলের দায়িত্ব দেওয়া হলো কায়েস বিন আবু সা'সা এ৯-এর ওপর। রাস্লুল্লাহ ﷺ ব্যক্তিগতভাবে এই অংশের নেতৃত্ব দিলেন এবং প্রধান সড়ক ধরে মার্কার দিকে যাত্রা করলেন। তারপর তিনি বামে বদরের দিকে ফিরলেন। আস-সাফরায় পৌঁছে দুজনকে কুরাইশদের খুঁজে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন। অন্যদিকে আবু সুফিয়ান ছিলেন সর্বোচ্চ সতর্ক। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন, তিনি যে পথ ধরে যাচ্ছেন, সেটা খুবই বিপজ্জনক। রাস্ল ﷺ-এর লোকদের গতিবিধি জানার জন্য তিনি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। তার অনুচরেরা খবর দিলো, মুসলমানরা তার কাফেলাকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। নিরাপত্তার জন্য আবু সুফিয়ান দামদাম বিন আমর আল গিফারিকে কুরাইশদের কাছে সাহায্য চেয়ে সংবাদ পাঠানোর জন্য নিয়োজিত করলেন। সংবাদবাহক দুত এবং উন্মন্ত অবস্থায় মার্কায় পোঁছল। উট থেকে লাফিয়ে নেমে কা'বার সামনে নাটকীয় ভজ্জিতে দাঁড়াল। তারপর উটের নাক ও কান কেটে দিয়ে, উটের জিন উলটে দিয়ে, নিজের জামা সামনে-পেছনে ছিঁড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল—হে কুরাইশরা, তোমাদের সম্পদ আবু সুফিয়ানের কাছে। তোমাদের কাফেলা মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিদের দ্বারা আক্রান্ত। কী অবস্থা হবে, বলতে পারি না। সাহায্য চাই। সাহায্য

এই চিৎকার চেঁচামেচির ফল খুব দুতই হলো। খবরটি কুরাইশদের হতভম্ব করে দিলো। মুসলমানদের হাতে তাদের বাণিজ্য কাফেলা অবরুম্ব হওয়ার খবরে তাদের আহত অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। খুবই দুততার সঙ্গো তারা তাদের প্রায় সকল বাহিনী একত্র করল। আবু লাহাব ছাড়া আর কেউ বাকি রইল না। আবু লাহাব তার পক্ষ থেকে অন্য একজনকে নিযুক্ত করল। তার বক্তব্য হলো, সে নিশ্চিত রাসূল ﷺ-এর বিরুম্বে যুম্বে গেলে অবশ্যই সে নিহত হবে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুম্বে ঘৃড়া। কুরাইশরা আশপাশের অন্যান্য গোত্রকেও রাসূল ﷺ-এর বিরুম্বে হাড়া। কুরাইশরা আশপাশের অন্যান্য গোত্রকেও রাসূল ﷺ-এর বিরুম্বে য্যাপারে উৎসাহিত করেছিল। কুরাইশদের একমাত্র বনু আদি ব্যতীত সকল বংশই তাদের সন্মতি দিলো।

শিগ্গিরই ১০ ঘোড়সওয়ার এবং ৬০০ বর্ম পরিহিত বিপুল সংখ্যক উটসহ ১৩০০ আগ্রাসী সেনা মুসলমানদের বিরুম্ধে যুদ্ধ যাত্রা করল। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এভাবে বলেন,

তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা দান্তিকভাবে এবং লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়েছে [সূরা আনফাল, ০৮: ৪৭]

তারা দ্রুত উত্তরদিকে বদর অভিমুখে চলল। এসময় তাদের কাছে আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে আরেকটি বার্তা এল। আবু সুফিয়ান জানিয়েছেন, তিনি তার কাফেলা মুসলমানদের থেকে রক্ষা করে নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন, তাই তারা যেন ঘরে ফিরে যায়। মুসলমানদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে আবু সুফিয়ান তার ^{কাফেলাকে} প্রধান রাস্তা থেকে সরিয়ে লোহিত সাগরের তীর ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই পদক্ষেপের কারণে তিনি মুসলমানদের আক্রমণ এড়িয়ে তাদের নাগাল থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন।

130

লিডারশিপ লেজনৃজ

আবু সুফিয়ানের বার্তা পেয়েও মার্কা থেকে আগত বাহিনি যুন্ধে লিপ্ত হওয়ার গো ধরে বসল। আবু জাহল খুব জোর দিয়ে বলল, বদরের প্রান্তরে গিয়ে তাদের তিন রাত অবস্থান করে উদ্যাপন করা উচিত। বদর একটি মৌসুমি বাজার ছিল। তা ছাড়া আব জাহল কুরাইশদের শস্তি প্রদর্শনে আগ্রহী ছিল—যেন লোকেরা বুঝতে পারে, এ অঞ্চল তখনও তাদের আধিপত্য বিদ্যমান। আবু জাহলের হুমকি ও জোরাজুরি সত্ত্বেও আখনস বিন শুরাইকের পরামর্শে বনু জাহরা গোত্র দল থেকে বেরিয়ে মাক্বার দিকে ফিরে চলন। এরপর থেকে আখনাসকে বনু জাহরার সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো এবং সকল বিষয়ে অন্ধভাবে তার আনুগত্য করা হতো।

বনু হাশিমও দল ছেড়ে চলে আসার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল; কিন্তু আবু জাহলের হুমকিতে সে চিন্তা থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো। বাকি সৈন্যদল, যারা সংখ্যায় এক হাজার। তারা বদরের দিকে এগিয়ে গিয়ে উদ্ওয়াত আল-কুসওয়া নামক মরুদ্যানের পরে তাঁবু ফেলল। মুসলিমদের গুপ্তচর রাসূল ﷺ-কে জানালেন, কুরাইশদের সঞ্চো সংঘাত এড়ানো প্রায় অসম্ভব এবং এই পরিস্থিতিতে দুঃসাহসিক সিম্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবর্তিত পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে উপদেষ্টাদের সঙ্গে জরুরি সভায় বসে বাহিনীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিছু মুসলমান ব্যক্তি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন; তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

(এটা এমন) যেভাবে তোমার রব তোমাকে নিজ ঘর থেকে বের করেছেন যথাযথভাবে এবং নিশ্চয় মুমিনদের একটি দল তা অপছন্দ করছিল। তারা তোমার সঞ্জো সত্য সম্পর্কে বিতর্ক করছে তা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর। যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হচ্ছে, আর তারা তা দেখছে। (সূরা আনফাল ০৮: ০৫-৯৬)

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর অনুসারীদের ডেকে অবস্থার গভীরতা তুলে ধরে তাদের পরামর্শ চাইলেন। আবু বাক্র ﷺ প্রথমে মুখ খুলে রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বের প্রতি নিঃসংকোচে আনুগত্যের নিশ্চয়তা ঘোষণা দিলেন। তারপর 'উমার ইবনুল খান্তাব উঠে দাঁড়িয়ে তার বন্ধুর মতামতের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করলেন। এরপর মিকদাদ বিন আমর দাঁড়িয়ে বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে যেদিকে নির্দেশ করেছেন, আপনি সেদিকেই চলুন, আমরা আপনার সংগ্রো আছি। বনু ইসরাঈলের মতো আমরা বলব না যে, আপনি আর আপনার রব গিয়ে যুশ্ব করুন, আমরা এখানে বসে থাকলাম। আল্লাহর কসম, আপনি যদি আমাদেরকে বারকুল গামাদেও নিয়ে যান, আমরা এর প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করব, যতক্ষণ না আপনি তা জয় করে নেন।

রাসূল ﷺ তাকে ধন্যবাদ দিয়ে তার জন্য দু'আ করলেন। যে তিনজন নেতা কথা বললেন, তারা সকলেই মুহাজির এবং মুহাজিররা সৈন্যদলের ছোট্ট একটি অংশ মাত্র। আল্লাহর রাসূল ﷺ আনসারদের মতামত শুনতে চাচ্ছিলেন। কারণ, সৈন্যদের বড় অংশ তারাই ছিল এবং এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির বড় অংশ তারাই বহন করবে। উপরস্থু মিনায়



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বুঁকি গ্ৰহণ

আকাবার শপথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনসাররা কেবল রাসূল 選-কে মাদীনার সীমার মধ্যে সুরক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সীমানার বাইরে লড়াই করার ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি সে শপথে ছিল না। আমি পরবর্তী সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ শপথের ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। তবে আলোচনার সুবিধার্থে আমাদের অনুধাবন করা উচিত, রাসূল 紫 তাঁর সকল অনুসারীদের, এমনকি আনসারদের মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অনুসারীদের সমর্থনের ব্যাপারেও কতটা সতর্ক ও যত্নবান ছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আনসারগণ কী অবস্থান গ্রহণ করছে, বিশেষ করে যা তাদের আনুষ্ঠানিক চুক্তি দ্বারা বাধ্য ছিল না, তা জানার জন্য রাসূল ﷺ আগ্রহী ছিলেন। তাই রাসূল ﷺ পুনরায় বললেন, আপনারা পরামর্শ দিন, এর মাধ্যমে তিনি আনসারদের বোঝাতে চাচ্ছিলেন।

এবার সাদ বিন মু'আজ 🐡 উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আল্লাহর কসম, আমার মনে হচ্ছে আপনি চাচ্ছেন আমরা (আনসারগণ) কথা বলি। রাসূল ﷺ সরাসরি বললেন, হাাঁ। সাদ বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনি আমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন, আমরা তার সাক্ষী। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। আমরা আপনার প্রতি আমাদের আনুগত্য ও ত্যাগের দৃঢ় অজ্ঞীকার ব্যক্ত করছি। আপনি আমাদেরকে যা-ই আদেশ করুন না কেন, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তা মান্য করব। মহান আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমরা ঝাঁপ দেবো। আমাদের একজনও পিছপা হবে না। আমরা শত্রুর সঙ্গো লড়াই নিয়ে ভাবি না। আমরা যুদ্ধে অভিজ্ঞ এবং লড়াইয়ে বিশ্বস্ত। আমাদের আশা, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নেবেন যা দেখে আপনার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। দয়া করে আল্লাহর নামে আমাদেরকে যুম্বক্ষেত্রের দিকে নিয়ে চলুন।

বাকি ইতিহাস আমাদের জানা। মুসলমানরা যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। দান্তিক কুরাইশরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। আবু জাহলসহ তাদের প্রায় সত্তরজনের অধিক নেতৃবৃন্দ মৃত্যুবরণ করল। মহান রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের সাহায্যার্থে ফেরেশতাদের পাঠিয়েছিলেন। এই দিন সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেন,

আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায়, তোমরা শোকরগুজার হবে। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১২৩]

শিক্ষা

এই পুরো ঘটনা থেকে নেতৃত্বের তিনটি প্রধান শিক্ষা হলো

১. উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও সম্ভাব্য কল্যাণ দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা: একজন নেতাকে অবশ্যই ঝুঁকি বিবেচনা করে তা গ্রহণ করা উচিত হবে কি না—তা বোঝার ক্ষমতা থাকতে হবে। ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে কী কী অর্জন করা যাবে এবং এর বিনিময়ে কী কী হারাতে হতে পারে, তা বিবেচনায় নিয়ে দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে কী কী হারাতে হতে পারে, তা বিবেচনায় নিয়ে দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে

130



লিডারশিপ লেজনৃজ

হবে। সুবিধাগুলো চিহ্নিত করা এবং সফলতার সম্ভাবনা সঠিকভাবে যাচাই করার ক্ষমতা একজন নেতার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।

২. পরামর্শমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ: আপনি যদি আপনার লক্ষ্য অর্জনে অনুসারীদের প্রতিশ্রুতি আশা করেন, তবে তাদের আস্থা অর্জন খুবই জরুরি। নেতাকে অবশ্যই প্রাসঞ্জিক নানা বিষয় অন্যদের জানাতে হবে, নিজের লোকদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে এবং নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যেকোনো সময় পরীক্ষার জন্য প্রস্তৃত থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, তিনি তার অনুসারীদের সবার আন্তরিক সমর্থন পাচ্ছেন। যেকোনো প্রকার দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের সমাধানে তিনি যত দুত সম্ভব, যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছেন। খুবই বিধ্বংসী পদক্ষেপ হবে—যদি তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নেওয়ার পর আবিক্ষার করেন যে, তার প্রধান লোকদের সমর্থনই তিনি পাচ্ছেন না। একই সঞ্চো সফলতার নিশ্চয়তা এবং এ থেকে সম্ভাব্য লাভের ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে। সবকিছুর নিকাশ করে একটি উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ইতিবাচক শক্তি ভেসে গিয়ে সেখানে ভয় ও জড়তা অবস্থান নেবে। সফলতা লাভের ব্যাপারে আস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. অন্তরে গভীর বিশ্বাস ও আল্লাহর সঞ্জো সম্পর্ক: প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব হলো রাবুল আলামীনের সামনে একাকী দাঁড়িয়ে মিশন অর্জনের জন্য তাঁর সাহায্য কামনার্থে কাকুতি-মিনতি করা। এ জন্য তাকে স্রন্টার সঞ্জো এমন সম্পর্ক তৈরি করতে হবে, যেন তিনি এই আত্মবিশ্বাস উপলম্বি করতে পারেন যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার আবেদন শুনতে পান এবং তিনি এর উত্তর দেবেন। আমি মনে করি, এ বিষয় প্রায়ই বাদ পড়ে যায়, যা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘাটতি।

বৃহৎ উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের কোনো ঘটনাকে যদি ব্যাপক বিজয়ের সূচনা হিসাবে বর্ণনা করা যায়, তবে সেটি হলো হুদাইবিয়ার সন্ধি। রাসূল ﷺ এবং কুরাইশদের মধ্যে সম্পাদিত এই সন্ধি কল্পনাতীত একপেশে ছিল। আমার ধারণা, এ পর্যায়ে কী কী ঘটনা এই বিখ্যাত সন্ধিচুন্তিকে প্রভাবিত করেছিল এবং এর ফলাফল কী, তা ব্যাখ্যা করা উচিত। এ ঘটনা রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের জন্য গ্রাজুয়েশন পরীক্ষার মতো ছিল, যেখানে তারা সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এটি ছিল তাদের ঈমানের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা, যার মাধ্যমে এমন বিষয়ে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপার ছিল—যা বুম্বিবৃত্তিকভাবে তাদের ইচ্ছাধীন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি কা'বা ঘর তাওয়াফ করছেন। তাওয়াফ শেষে মস্তক মুন্ডন করছেন। মাক্কা ছেড়ে আসার পর ৬ বছর পার হয়ে গিয়েছিল, তাই সাহাবিরা সকলেই মাক্কায় যাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ঘরকে বলেছেন—মাসাবাতান লিন নাস--এমন ঘর যেখানে বারবার ফিরে যেতে মন চায়। নবিজির সাহাবিরা সেখানে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উদ্গ্রীব ছিলেন। এমনিতেই ঈমানদারদের যেকেউ যখন প্রথমবারের মতো কা'বা শরীফ দেখে, দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। এ পবিত্র হারাম শরীফকে নিজের ঘর বলে মনে করেও প্রশান্তি বোধ করে।

রাসূল ﷺ-এর সুপ্নও ওয়াহি। তাই রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে উমরাহ পালনের আহ্বান জানালেন। সব মিলিয়ে ১৪০০ মুসলমান তাঁর সঙ্গো যাত্রা করলেন। জুল হুলাইফায় গিয়ে তারা ইহরাম বাঁধলেন, কুরবানির পশু সঙ্গো নিলেন এবং তালবিয়া বলতে শুরু করলেন। পবিত্র হাজ্জযাত্রীরা মার্কার দিকে চলতে থাকলেন। তারা বেশ শান্ত ছিলেন। আরবরা সাধারণভাবে সব সময় যে অস্ত্র বহন করে, তা ছাড়া আর কোনো অস্ত্র তাদের সঙ্গো ছিল না। তারা যুম্থ করার জন্য কোনো প্রস্তুতি নিয়ে আসেননি; তবে আব্বাদ বিন বিশ্রের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি স্কাউট দল ছিল, যারা রাসূল ﷺ-এর নিরাপত্তা ও পথ পরিক্ষারের জন্য যোড়ায় চড়ে সামনের দিকে ছিলেন। বিশ্র ইবনু সুফিয়ানকে মাক্কায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। 'উমার ইবনুল খাত্তাব 🐗 বললেন---



হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি বিনা অস্ত্রে সে সকল লোকদের মধ্যে প্রবেশ ক্রুতে চান, যারা আপনার বিরুদ্ধে যুম্ধরত? চলুন, আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকি; যদি তারা তা-ই চায়। রাসূল ﷺ একমত হলেন। মাদীনা থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন; তবে সেগুলো আলাদা রাখা হবে—যেন এই শান্তিপূর্ণ যাত্রায় বিঘ্ন না ঘটে।

বিশ্র ইবনু সুফিয়ান মার্কা থেকে ফিরে বললেন, কুরাইশরা আল-আহাবিশ (তিন বা তার অধিক বেদুঈন গোত্র)-এর সঙ্গো জোট বেঁধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এই খবর নিয়ে। এটা খুবই গুরুতর বিষয় ছিল, কারণ আরব সমাজে হাজ্জ ও উমরাহ পালনে কাউকে বাধা দেওয়া হারাম ছিল। এটা সম্পূর্ণ সামাজিকভাবেই অগ্রহণযোগ্য কাজ হিসেবে গণ্য হতো। তা সত্ত্বেও কুরাইশরা এই কাজ করার পরিকল্পনা করেছিল এবং কিছু গোত্র তাদের সঙ্গো যোগ দিয়েছিল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এ সংবাদ জানার পর সাহাবিদের পরামর্শ চেয়ে বললেন, আমরা কি আদিবাসী গোত্রগুলোর ওপর বাড়িঘরে আক্রমণ করব, যেন তারা কুরাইশদের ত্যাগ করে এবং তারপর আমরা কুরাইশদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের সঙ্গো মোকাবিলা করতে পারি? আবু বাক্র ﷺ বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কারও সঙ্গো লড়াই করতে আসিনি। তাই আজকে আক্রমণ করব না। চলুন আমরা উমরাহ পালনের জন্য অগ্রসর হতে থাকি। কেউ যদি আমাদের থামাতে চায়, তবে আমরা তাদের মোকাবিলা করব; কিন্তু যদি তা না হয়, তবে আমরা প্রথমে আক্রমণ করব না। রাসূল ﷺ একমত হয়ে বললেন—আল্লাহর নামে এগিয়ে চলো।

কুরাইশরা খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইকরিমা বিন আবু জাহলের নেতৃত্বে তাদের বাহিনী পাঠাল। রাসূল ﷺ জানতে চাইলেন, কুরাইশদের বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে মান্নায় পৌঁছানোর কোনো রাস্তা কেউ চেনে কিনা। আসলাম গোত্রের একজন একটি খুবই রুক্ষ ও বিস্তৃত প্রান্তর পেরিয়ে পথ দেখিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করল; কিন্তু তারা হুদাইবিয়ার সমতলে পৌঁছুলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ এই সংবাদ জানতে পেরে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুত মান্ধায় ছুটে গেলেন। কুরাইশরা জানল, মুহাম্মাদ ﷺ মাত্র একদিনের পথ দূরতে অবস্থান করছেন। হুদাইবিয়ায় পৌঁছানোর পর রাসূল ﷺ-এর উটনী 'কাসওয়া' বসে পড়ল। সবাই তাকে তাড়া দিলেও সে নড়ল না। লোকেরা বলল, কাসওয়া বিদ্রোহী হয়ে গেছে; কিন্তু রাসূল ﷺ বললেন, বিদ্রোহ করা কাসওয়ার সুভাব নয়। তাকে তিনিই থামিয়ে রেখেছেন, যিনি হাতিকে থামিয়ে রেখেছিলেন। ইবনু হাজার আসকালানি বলেন—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানতেন যে, মান্ধার অধিবাসীরা মুসলমান হয়ে যাবে, তাই তিনি আবরাহার হাতিকে এবং নবিজির কাসওয়াকে রন্তুপাত প্রতিরোধ করার জন্য ধরে রেখেছিলেন। আবরাহার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে এবং তার সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। রাসূল ৠ্র-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে থামিয়ে রেখেছিলেন যেন রন্তুপাত ক্ষ করা যায়।

রাসূল ﷺ কুরাইশদের সঙ্গো যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন না। তাদের মাঝে তাঁর নিজ পরিবার ও পুরনো বন্ধুরা ছিল। তিনি উমরাহ পালন করতে এসেছেন, যেমনটি স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং তা সম্পন্ন করেই ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, যার হাতে



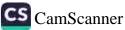
বৃহৎ উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ

আমার প্রাণ তাঁর কসম, পবিত্র স্থানের সম্মান রক্ষা করা ও রক্তপাত বন্ধে তাদের যেকোনো প্রস্তাবই আমি মেনে নেব। তিনি সকলের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করলেন যে, তিনি যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটাতে চান না।

হুদাইবিয়ায় একটি কৃপ ছিল; কিন্তু সাহাবিরা গিয়ে দেখেন কুয়াটি শুকনো। বিষয়টি তারা রাসূল ﷺ-কে জানালে তিনি তাঁর তৃণীর থেকে একটি তির কৃপে ফেলতে বললেন। তিরটি কৃপে ফেলা হলে তা পানিতে ভরে গেল। কাফেলা যতক্ষণ সেখানে ছিল, এ পানি দিয়ে প্রয়োজন মিটল।

পরিম্থিতি জটিল এবং উত্তেজনাকর হয়ে উঠেছিল। রাসূল ﷺ মাক্বার কুরাইশদের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে জানাতে চাইলেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে নয় শুধু উমরাহ পালন করতে এসেছেন। তাই তিনি খুজা'আ গোত্র থেকে খারাস বিন উমাইয়াকে বাছাই করলেন। খারাস মার্কায় প্রবেশ করলে কুরাইশরা তার উটটাকে মেরে ফেলে। তাকেও প্রায় হত্যা করে ফেলছিল, এমন সময় জোটের অন্যরা বাধা দিয়ে তাকে উদ্ধার করলেন। বিপর্যস্ত ও হতাশ হওয়ায় রাগে ক্ষোভে অপমানবোধে কুরাইশরা রাসল ﷺ-এর প্রতিনিধিকে কৃটনীতির সাধারণ সৌজন্যতাও প্রদর্শন করেনি। খারাস ফিরে এলে রাসূল 🏂 আরেকজন প্রতিনিধি পাঠাতে চাইলেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে ডেকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোর ব্যাপারে মতামত জানতে চাইলে 'উমার 🚙 বললেন, আপনি নির্দেশ দিলে আমি যাব; তবে মার্ক্কায় আমার পরিবারের (বনু আদি) কেউ নেই এবং কেউ আমাকে নিরাপত্তা দেবে না। আর কুরাইশরা তাদের প্রতি আমার শত্রুতা সম্পর্কে বেশ জানে। রাসূল 🎉 নীরব হয়ে আছেন দেখে 'উমার 🚓 হজরত উসমান ইবনু আফফানের নাম প্রস্তাব করলেন। কারণ, তিনি ছিলেন কুরাইশদের অন্যতম বড় গোত্র বনু আবদু মানাফের অংশ বনু উমাইয়ার সন্তান। কুরাইশদের দুটি প্রধান শাখা হলো বনু মাখজুম এবং বনু আবদু মানাফ। আবু জাহল, ওয়ালিদ বিন মুগিরা এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ বনু মাখজুম গোত্রের সদস্য। বনু আবদু মানাফের দুটি প্রধান শাখা হলো বনু হাশিম (রাসূল ﷺ-এর পরিবার) ও বনু উমাইয়া। উসমান ইবনু আফফান 🐗 যেতে সম্মত হলেন। তিনি মাৰ্ক্ষায় পৌঁছামাত্র আব্বান বিন সাঈদ ইবনুল আস তাকে নিরাপত্তা দিলেন। আবু সুফিয়ান তখন মাক্তার বাইরে ছিলেন, তাই আব্বান বিন সাঈদ তার স্থানে নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন। আব্বান উসমানকে তার উটের পিঠে তুলে নিলেন এবং তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করলেন। উসমান 🐗 কুরাইশদের নেতৃস্থানীয়দের প্রতি উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহর রাসূল 🏂 তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি, আল্লাহর প্রতি, ও আল্লাহর দীনে প্রবেশের আহ্বান জানাতে পাঠিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ-কে সম্মানিত করবেন। দ্বিতীয়ত, তোমরা না করে অন্য কোনো জাতিকে তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করতে দাও; যদি তারা তাঁকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়, তাহলে তো তোমাদের চাওয়াই পূরণ হলো; আর যদি তা হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের সিম্বান্ত নিতে পারবে। এই সময়ের মধ্যে তোমরা কিছুটা বিশ্রাম পাবে; কারণ, যুম্ব তোমাদেরকে বেশ পরিশ্রান্ত করে ফেলেছে এবং তোমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা নিহত হয়েছে। আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাকে এই বলার জন্য পাঠিয়েছেন যে, আমরা এখানে কারও সঙ্গো লড়াই করতে আসিনি; বরং

أهدد



লিডারশিপ লেসনস

উমরাহ পালন করতে ও আমাদের পশু কুরবানি করতে এসেছি। তারপর আমরা চলে যাব। উসমান 🚓 তাদেরকে সরাসরি ও সুম্পফ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দিলেন।

আব্বান বিন সাঈদ সাইয়িদুনা উসমানকে বললেন, আপনি যদি তাওয়াফ করতে চান, তাহলে আমার নিরাপত্তায় করতে পারেন। আপনাকে কেউ থামাবে না। উসমান ইবন আফফান বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করব না। কিছু সাহাবি বলছিলেন, উসমান ఉ তাগ্যবান। কারণ, তিনি তখন তাওয়াফ করছেন; কিন্তু তাদের কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, উসমানের প্রতি আমার বিশ্বাস হলো, সে যদি মাক্কায় অনির্দিন্ট সময়কালও অবস্থান করে, আমি তাওয়াফ না করা পর্যন্ত সে তাওয়াফ করবে না। এবং সত্যি সত্যি তা-ই ঘটেছিল।

কুরাইশরা খুজা'আ গোত্রের বুদাইর বিন ওয়ারাকাকে রাসূল 蹇-এর সঙ্গো সাক্ষাতের জন্য পাঠাল। বুদাইর তার গোত্রের কিছু লোককে নিয়ে গেল। গোত্রটি রাসূল 蹇-এর প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাদের মধ্যকার মুসলমান ও মুশরিক উভয়েই রাসূল 蹇-এর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। খুজা'আ গোত্র বনু হাশিমের মিত্র; এবং যেহেতু রাস্ল ऋ বনু হাশিমের সন্তান, তাই তারা নিজেদেরকে তাঁর মিত্র মনে করত এবং তাদের মধ্যকার পুরনো গোত্রীয় সম্প্রীতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। ফলে রাসূল 蹇 কুরাইশ ও তাদের লোকদের সম্পর্কে ভিতরের তথ্য পেলেন। বুদাইর ইবনু ওয়ারাকা রাসূল ﷺ-কে বলল, কুরাইশরা যুন্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তারা বাঘের চামড়া পরিধান করেছে, দুগ্বব্যী উটগুলোকে নিয়ে এসেছে এবং দীর্ঘ সময় অবস্থানের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমি কারও সঙ্গো যুম্থ করতে আসিনি। যুম্থ কুরাইশদের শেষ করে দিলো। আমি কুরাইশদেরকে কিছু অবকাশ দিতে চাই। আমাকে একাকী তাদের মধ্যে যেতে দাও। আমি যদি তাদের বুঝাতে পারি, তাহলে তারা সঠিক সিম্বান্ত নিতে পারবে। আমি হেরে গেলে তারা কিছুটা বিশ্রাম ও সময় পেত। যদি তা না হয়; বরং তারা যদি যুম্ধই করতে চায়, তাহলে আমি শপথ করছি, রক্তের শেষ বিন্দু নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি হাল ছাড়ব না এবং আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। বুদাইর ইবনু ওয়ারাকা ফিরে এসে কুরাইশদেরকে সবিস্তারে বলল। কুরাইশরা তা পছন্দ করল না। উপেক্ষা করল। এবার কুরাইশরা মিকরাজ বিন হাফসকে পাঠাল। রাসূল 🎉 বললেন, সে এমন একজন, যাকে বিশ্বাস করা যায় না। মিকরাজ ৫০ জনকে সজো নিয়ে এসে মুসলমানদের বন্দি করার উদ্দেশ্যে পুরো ক্যাম্প চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল। উলটো মুসলমানরা তাদের সবাইকে আটক করে ফেললেন, একমাত্র মিকরাজ পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো; কিন্তু রাসূল 🏂 সবাইকে বিনা শর্তে মুক্ত করে দিলেন। তিনি যে যুম্ব করতে আসেননি, সকলের কাছে স্পন্টভাবে এই বার্তা দিতে চাইলেন। তারপর আহাবিসদের প্রধান হুলাইস বিন আলকামাকে রাসূল ﷺ-এর সজ্ঞো সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তাব করা হলো। রাসূল 🏂 বললেন, সে ধর্মপ্রাণ লোকদের প্রধান। তাই কুরবানির পশুগুলোকে বের করে দাও, যেন সে দেখতে পারে আমরা কেবল উমরাহ পালনের জন্য এসেছি। মুসলমানগণ তাই করলেন। হুলাইস এ দৃশ্য দেখে এতটাই প্রভাবিত হলেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর সজ্যে সাক্ষাৎ-ই করলেন না। সরাসরি করাইশদের নিকট



বৃহৎ উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ

ফিরে গিয়ে বললেন—মহান আল্লাহর প্রশংসা, এই লোকগুলোকে কা'বায় আসতে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের সংস্কৃতিতে এর অনুমতি নেই এবং আমরা কা'বায় হাজ্জ করা থেকে কাউকে বিরত রাখতে পারি না। আল্লাহর কসম, আমরা জিদাম, কিনদাহ, হিমায়ার লাহাম গোত্রের লোকদেরও আল্লাহর ঘর ভ্রমণের অনুমতি দিই; অথচ আবদুল মন্তালিবের ছেলেকে (বংশধরকে) বাধা দিচ্ছি!

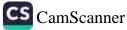
কুরাইশরা তাকে বলল, বসে পড়ো। তুমি হলে জ্ঞানহীন বেদুঈন। হুলাইস ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বললেন, যারা আল্লাহর ঘরে আসতে চায়, তাদেরকে এখানে আসতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। যদি তোমরা না থামো, তাহলে আমি সকল আহাবিসকে তোমাদের বিরুদ্ধে শেষ মানুষটি জীবিত থাকা পর্যন্ত চালিত করব। শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা তাকে শান্ত করতে সক্ষম হলো এবং তিনি নিশ্চুপ থাকলেন।

তারপর উরওয়া বিন মাসউদ আস-সাকাফি রাসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে সমঝোতা করার প্রস্তাব করলেন। তার মা কুরাইশ বংশের ছিলেন এবং তিনি ছিলেন তায়েফের সাকিফ গোত্রের। আরবের একজন মহান ব্যস্তি হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। সমাজে তিনি খুবই প্রভাবশালী এবং বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদের সন্তান নই? তোমরা কি চাও যে আমি যাই এবং এই মানুষটির সঞ্জো কথা বলি? তারা একমত হলো। তিনি বললেন, আমি দেখলাম তোমরা দৃত পাঠাও। তারপর তারা যখন ফিরে আসে, তখন তোমরা যা চাও, তেমন ফলাফল না নিয়ে এলে তোমরা তাকে অপমান করো। আমি এর অংশীদার হতে চাই না। তাই এ ব্যাপারে আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করো, তবেই আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঞ্জো কথা বলতে যাব। তারা উরওয়ার এই অভিব্যক্তিতে সন্মত হলো।

উরওয়া বিন মাসউদ খুব দান্তিক প্রকৃতির ছিলেন। আরব সমাজে তার সমুচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন—এই যে মুহাম্মাদ, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, তুমি তোমার নিজের লোকদের নন্ট করছ? কখনো শুনেছ, কোনো আরব তার নিজের লোকদের নন্ট করেছে? আমি তো এখানে উল্লেখযোগ্য কোনো মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো কতগুলো জ্যাখিচুড়িমার্কা লোক দেখতে পাচ্ছি, যারা তুমি হেরে গেলে দৌড়ে পালাবে। রাসূল ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে সজ্যে থাকা আসলাম, গিফার ও জুহায়ান গোত্রগুলোকে কুরাইশ, সাকিফ, আসাদ ও গাতফানের লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণির গোত্র হিসেবে গণ্য করত। রাসূল ﷺ বললেন, শেষ বিচারের দিনে দাঁড়িপাল্লায় এই ক্ষুদ্র গোত্রগুলো আজকের সম্মানিত বড় গোত্রগুলোর তুলনায় অনেক ভারী হবে।

আবু বাক্র 🚲 উরওয়া বিন মাসউদের কথায় খুব অপমান হিসেবে নিয়ে শক্ত ভাষায় প্রতিবাদ করলেন। তার কথায় উরওয়া বিন মাসউদ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে বললেন, তুমি যদি অতীতে আমার উপকার না করতে, তাহলে আমি এই অপমানের জবাব দিতাম। নীরবতার মাধ্যমে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিলাম। হিজরাতের পূর্বে আবু বাক্র তার হয়ে রক্তপণ বাবদ ১০টি উট দিয়েছিলেন, যা উরওয়াহ তখনও পরিশোধ করেননি। আবু বাক্র 🦛-এর জ্বাব থেকেই বোঝা যায়, সাহাবিরা রাসূল ﷺ-কে

Sinst



নিডারশিপ নেজনজ

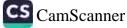
কী পরিমাণ ভালোবাসতেন। রাসূল ﷺ-এর প্রতি কোনো কুৎসা, অপমান বা অঞ্চন্ধ প্রতিবাদ না করে মুখ বুজে সহ্য করতেন না। তারা যেকোনো মূল্যে রাসূল ﷺ-এর পাশে থেকেছেন। তাদের সার্বক্ষণিক উক্তি 'আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক' শুধু কথার কথা ছিল না। রাসূলের জন্য তাদের ভালোবাসা, প্রতিগ্রুতির প্রমাণ তারা বারবার দিয়েছেন।

ইবনু হাজার আসকালানি বলেন—উরওয়া তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির কারণে দুটি অপশনকেই অপছন্দ করছিলেন। নিজের লোকদের বিরুম্বে যুব্ব করা অথবা পরাজিত হওয়ার কোনোটাকেই তিনি গ্রহণ করতে পারছিলেন না। অথচ শরী আর দৃষ্টিতে দুটোই প্রশংসনীয়। ইসলামের জন্য নিজের লোকদের বিরুদ্বে পর্যন্ত যুব্ব করা ও জয়ী হওয়া যেমন প্রশংসনীয়, আবার এরকম যুন্বে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়াও প্রশংসনীয়। সুতরাং ইসলাম আমাদের বিচারের মানদণ্ড পরিবর্তন করে জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভজ্ঞা—কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, জয় বা পরাজয় কী, তার ধারণা পালটে দিয়েছে।

সে যুগের রীতি অনুযায়ী উরওয়া কথা বলার সময় আল্লাহর রাসূল 幾-এর পবিত্র দাড়ি মুবারক ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল 幾-এর পাশে নিরাপত্তার দায়িত্বে দাঁড়িয়ে থাকা মুগিরা বিন উকবা তরবারির বাঁট দিয়ে উরওয়ার হাত সরিয়ে দিয়ে বললেন—তোমার হাত তোমার কাছেই রাখো, না হয় তোমার হাত তোমার কাছে ফিরবে না। উরওয়া তার এই ব্যবহারে খুব কন্ট পেলেন; কারণ তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং এ রকম অপমান সইতে অভ্যস্ত ছিলেন না। জানতে চাইলেন, এই লোকটি কে? তিনি বর্মে ঢাকা মুগিরাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। জানতে চাইলেন, এই লোকটি কে? তিনি বর্মে ঢাকা মুগিরাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। রাসূল 紫 বললেন, এ তোমার ভাতিজা মুগিরা। নিজের ভাতিজার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পেয়ে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। কারণ, আরবরা তাদের চাচাকে বাবার মতোই সম্মান করত। এর মাধ্যমে বুঝা যায়, ইসলাম বিশ্বস্ততার দৃষ্টিভক্তিা কীভাবে পরিবর্তন করে দেয়। রাসূল ﷺ-এর প্রতি সাহাবিদের বিশ্বস্ততা অন্য সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

উরওয়া আল্লাহর রাস্লের কাছ থেকে ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে বললেন, আমি অনেক রাজার নিকট গিয়েছি। আমি সিজার, খসরু এবং নিগাসের দরবারে গিয়েছি; কিন্তু আমি কখনো মানুষকে তাদের রাজাকে এত ভালোবাসতে ও শ্রুম্বা করতে দেখিনি, যেমনটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীরা করে। যদি সে থুতু ফেলে আর তা কারও হাতে পড়ে, তবে সে তা নিজের মুখ বা শরীরে মাখিয়ে নেয়। সে কথা বললে তারা তা পালন করার জন্য ছুটে যায়। নিজেদের মধ্যে তারা নিচু সুরে কথা বলে। গ্রুম্বা ভস্তির কারণে কখনোই তাঁর চোখের দিকে তাকায় না। তারা কখনোই তাঁকে ত্যাগ করবে না। সে তোমাদের একটি প্রস্তাব দিয়েছে, তোমরা তা গ্রহণ করে নাও। উরওয়া বিন মাসউদ পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবানদের একজন হন।

এদিকে উসমান 🚓 তখনও মাক্কায় ছিলেন। এমন সময় গুজব রটে গেল যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বনু নাজ্জার গোত্রের তাঁবুর দিকে চললেন। উম্মু আম্মারা 🚓 বলেন, আমি তাঁকে আমাদের তাঁবুর দিকে আসতে দেখে ভাবলাম—তাঁর কোনো কিছর



প্রয়োজন হয়তো। সেখানে পৌঁছে তিনি বসে বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে বাই'আত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

বনু নাজ্জার গোত্র খাজরাজের শাখা গোত্র এবং তারা রাসূল ﷺ-এর মায়ের দিকের আত্মীয়। তিনি মাদীনায় আসার পর প্রথমদিকে তাদের সঙ্গো ছিলেন। এবারও তিনি তাদের তাঁবুর দিকেই প্রথমে গেলেন। তারা ছিল তাঁর নিকটতম ও ব্যক্তিগত রক্ষী। তাদের তাঁবুতে শপথ গ্রহণ করা হলো। শপথটি ছিল এমন—আমরা মৃত্যুবরণের শপথ করছি। আমরা যুম্বক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার শপথ করছি। আপনার অন্তরে যা-ই থাকুক না কেন, আমরা সে অনুযায়ী শপথ করছি। একে 'বাই'আতে রিজওয়ান' বলা হয়। দেখুন, রাসূল ﷺ-এর প্রতি সাহাবিদের বিশ্বাস ও আনুগত্য কোন স্তরের ছিল। তাঁর—অন্তরে যাই থাকুক—বলে শপথ গ্রহণ করছেন; অথচ তারা জানেন না তাঁর অন্তরে কী আছে। শুধু এতটুকু জানেন, প্রয়োজনে তাঁর জন্য তাদের জীবনও বিলিয়ে দিতে হতে পারে।

উম্মু আম্মারা 🚓 বলেন, আমি তাঁবু থেকে একটি লাঠি নিলাম। কোমরবন্ধনীর খাপে একটি খঞ্জর গেঁথে নিলাম—যেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর কোনো আক্রমণ হলে প্রতিরোধ করতে পারি। আমার স্বামী হাতে তরবারি নিয়ে বাই'আত গ্রহণ করলেন। সাহাবিরা ছিলেন স্পেশাল এবং আনসাররা ছিলেন সাহাবিদের মধ্যেও স্পেশাল।

রাসূল ﷺ সালামা ইবনু আল-আকওয়াকে ডেকে বাই'আত গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তিনি বাই'আত গ্রহণ করলেন। রাসূল ﷺ দেখলেন, সালামার কোনো বর্ম নেই। তাই তিনি তাকে ছোট একটি ঢাল দিলেন। তারপর তিনি তাকে পুনরায় ডেকে নিয়ে বললেন—এসো, শপথ নাও। সালামা বললেন—হে রাসূলাল্লাহ, আমি ইতোমধ্যেই শপথ গ্রহণ করেছি। রাসূল ﷺ বললেন—এসো, আবার গ্রহণ করো। তারপর রাসূল ﷺ তাকে জিঞ্জেস করলেন, তোমাকে যে ঢালটি দিলাম, সেটি কী করেছ? তিনি বললেন, আমার চাচার কিছু নেই বলে তাকে দিয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার উদাহরণ হলো তার মতো—যে বলে, হে আল্লাহ, আমাকে এমন কাউকে দাও, যে আমাকে তার নিজ্বে চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তারপর রাসূল ﷺ তাকে পুনরায় ডেকে বললেন—এসো, বাই'আত গ্রহণ করো। সালামা তৃতীয়বারের মতো বাই'আত গ্রহণ করলেন।

শিয়ারা হজরত উসমানকে এই বাই'আত গ্রহণ না করা এবং তার পূর্বে বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা নিয়ে দোষারোপ করে। এটা মিথ্যা অভিযোগ। প্রথমত সাইয়িদুনা উসমান ক্র বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, কারণ রাসূল ﷺ তাকে তার মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীর পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যিনি রাসূল ﷺ-এর আদরের কন্যা। বাই'আতে রিজওয়ানের ক্ষেত্রে বিষয়টি হলো, প্রথমত এ বাই'আত তার শাহাদাতের খবর শুনেই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, রাসূল ﷺ তাঁর এক হাতের ওপর অন্য হাত রেখে বললেন—এটি হলো উসমানের হাত, আমি তার পক্ষ হয়ে বাই'আত গ্রহণ করলাম। সুতরাং উসমানের বাই'আত সর্বাপেক্ষা উত্তম। কারণ রাসূল ﷺ নিজের হাতকে উসমানের হাত বলে অভিহিত করে তার হয়ে বাই'আত পেশ করে গ্রহণ করেছিলেন।



লিডারশিপ লেজনুজ

এ প্রসঞ্জো আল্লাহ বলেন,

নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন, তাকে সাহায্য ও সন্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর। আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর; অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গা করলে তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই উপর। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন। (সূরা ফাত্হ, ৪৮: ০৮-১০)

তারপর এই বাই আত সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা বলেন,

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে। [সূরা ফাতহ ৪৮: ১৮]

যে সাহাবিরা এই বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাদের এই বাই'আত প্রত্যক্ষ করে বলেছেন, রাসূল 紫-এর হাতের ওপর তাদের হাত ছিল। বাই'আত গ্রহণ শেষ হলে রাসূল 紫 বললেন, তোমরা এই পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম।

পরে জানা গেল, উসমান 45 - কে হত্যা করা হয়নি, তার মৃত্যুর খবরটি গুজব ছিল। বাই আত ঈমানদারদের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল এবং কোনো যুদ্ধ না করা সত্ত্বেও তারা এজন্য পুরস্কৃত হলো। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা একমাত্র লাল উটের মালিক ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ ব্যক্তিটি ছিল আর্জ আদ বিন খায়েস, যে শপথ গ্রহণ করেনি; বরং শপথ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিজের লাল উটের পেছনে লুকিয়ে ছিল।

এ পর্যায়ে কুরাইশরা সুহাইল ইবনু আমরকে রাসূল ﷺ-এর সঞ্জো আলোচনা করার জন্য পাঠাল। সুহাইল রাসূল ﷺ ও সাহাবিদেরকে মাক্কায় প্রবেশে সম্মতি দেওয়ার ব্যাপারে তীব্র বিরোধী ছিল। বিষয়টাকে সে চুক্তির একটি শর্ত বানিয়ে নেয়। এটা জাহিলিয়াতের সময় কুরাইশদের গোত্রীয় অহংকারের একটি চিহ্ন, যার ফলে হাজিদের মাক্কায় প্রবেশে বাধা দেওয়া যে একটা অন্যায় কাজ, সেই সত্যটুকুও তারা অনুধাবন করতে দেয়নি। রাসূল ﷺ এ নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তবুও রাসূল ﷺ মত দিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন চুক্তিটি হোক। রাসূল ﷺ যা করেছিলেন, তা নিশ্চিতভাবেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলার নির্দেশক্রমে করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এটা তাঁর ও সাহাবিদের জন্য খুবই কঠিন এক পরীক্ষা ছিল। সর্বোপরি, তারা সকলেই রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে কেবলই উমরাহ করতে এসেছেন; অথচ তাদেরকে সেক্ষেত্র অন্যায়ভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে।



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft বৃহৎ উদ্দেশো ক্ষুদ্র স্থার্ণ ত্রাদ

'উমার ইবনুল খাত্তাব 💩 এসব কথাবার্তায় খুবই হতাশ হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি রাসন ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন? তিনি বললেন, হ্যা। "উমার 🐇 প্রশ্ন করলেন, আমরা কি মুসলমান নই? তিনি জ্বাব দিলেন, হা। 'উমার 🚓 জানতে চাইলেন, তারা কি মুশরিক নয়? রাসূল ﷺ 'হ্যাঁ' বললেন। এবার 'উন্নার 🚋 প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমরা কেন আমাদের ধর্মকে হেয় করছি? আল্লাহর রাসুল 🔹 বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা। আমি তাঁর অবাধ্যচারিতা করব না এবং তিনিও আঁমাকে পরিত্যাগ করবেন না। 'উমার 🚙 এবার আবু বাক্র 🚙-এর নিকট গিয়ে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। আবু বাক্র 🐗 বললেন, তাকে অনুসরণ করুন। তিনি আল্লাহর রাসূল, তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করবেন না। 'উমার ইবনুল খাত্তাব 📿 পরে এই আপত্তির জন্য আফসোস করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহর রাসুল 💥 যা করেছিলেন, তা তাঁকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাইয়িদুনা 'উমারের আপত্তি করার কারণ ঠিকই ছিল। তিনি ইসলাম ও তাঁর সম্মানের ব্যাপারে খুবই সংবেদনশীল ছিলেন; কিন্তু যখন তিনি রাসূল 😕 এর সঞ্জো তর্ক করার ভুল বুঝতে পারলেন, বলে—আমি রোজা রেখেছি, সালাত আদায় করেছি, সাদাকা করেছি এবং দাস মুক্ত করেছি; যেন সেদিন আমি যা বলেছিলাম ও করেছিলাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা আমাকে তার জন্য ক্ষমা করে দেন।

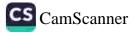
আল্লাহর রাসূল ﷺ একে একে চুক্তির শর্তসমূহ বললেন। আলি ইবনু আবি তালিব সেগুলো লিখলেন। রাসূল ﷺ বললেন—লিখো, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলি ালিখলেন। কুরাইশদের পক্ষ থেকে সমঝোতাকারী সুহাইল বিন আমর আপত্তি করে বলল, আমরা আল্লাহকে জানি; কিন্তু আর-রাহমান ও আর-রাহীম সম্পর্কে জানি না। সুতরাং বিসমিকাল্লাহুম্মা লিখো। আল্লাহর রাসূল ﷺ আলিকে তেমনটিই লিখতে বললেন; কিন্তু আলি ﷺ যা লিখেছিলেন, তা মুছতে ইতস্তত করছিলেন। তাই রাসূল ﷺ নিজে মুছে দিলেন। তারপর তিনি বললেন—লিখো, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ এবং মার্কার কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি। আলি ﷺ লিখলেন; কিন্তু সুহাইল আপত্তি করে বলল, আমরা মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহকে চিনি; কিন্তু কোনো রাস্ল্ল্লাহকে চিনি না। যদি আমরা তোমাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকার করেই নিই, তাহলে আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া থাকে না। তাই মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ লিখো। আল্লাহর রাস্ল ¾ এই পরিবর্তনের নির্দেশ দিলে আলি ﷺ আবারও লিখতে ইতস্তত করছিলেন। তারপর রাস্ল ৠ নিজেই পরিবর্তন করে দিলেন। সাইয়িদুনা আলি ইবনু আবি তালিবের জন্য এই পরিবর্তনগুলো করা অসন্তব ছিল; কারণ এসবের ওপরই ছিল তার ঈমানের ভিণ্ডি। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নাম মুছে ফেলা ছিল তার চিন্তার বাইরের অসন্তব কিছু।

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ

১. উভয়পক্ষ ১০ বছরের জন্য সম্পূর্ণ যুম্ধবিরতিতে সম্মত। এ সময়ে সকলে শান্তি ও নিরাপত্তা উপভোগ করবে, একে অপরকে আব্রুমণ করবে না।

২. অভিভাবক বা নেতার অনুমতি না নিয়ে কুরাইশদের কেউ মুহাম্মাদের দলে যোগ

500



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft লিডারশিপ লেমনুম

দিলে তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত পাঠানো হবে।

৩. মুহাম্মাদের দল থেকে কেউ যদি কুরাইশদের সঙ্গে যোগ দেয়, তবে তারা তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য নয়।

৪. দুপক্ষই একমত যে, তারা একে অপরের প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করবে।

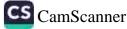
৫. চুরি অথবা বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করা হবে না।

৬. কেউ যদি মুহাম্মাদের সঙ্গো জোট বাঁধতে চায়, তবে সে তা করতে পারে। আবার কেউ যদি কুরাইশদের সঙ্গো জোট বাঁধতে চায়, তবে সেও তা করতে পারে।

৭. আরও একমত যে, মুহাম্মাদ এ বছর মার্ক্কায় প্রবেশ না করেই ঘরে ফিরে যাবেন। এক বছর পর আমরা মার্ক্কা খালি করে দেবো, তখন মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মার্ক্কায় প্রবেশ করে মাত্র তিনদিন অবস্থান করতে পারবেন। কেবল ভ্রমণকারীর প্রয়োজনীয় অস্ত্র তথা কোষবন্ধ তরবারি বহন করতে পারবেন, অন্য কোনো অস্ত্র বহন করবেন না।

এই অসম শর্তে সন্মত হয়ে রাসূল ﷺ শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারের দরজা তৈরি করে নিলেন। শত্রুতা স্থগিত হলে মুসলমানরা মুক্তভাবে চলাচল করা ও ইসলামের বার্তা প্রচার করার সুযোগ পেল। এর ফল হলো, আরবের প্রায় সমগ্র অংশই এ সুযোগে ইসলাম গ্রহণ করল। দীর্ঘমেয়াদী জয়ের জন্য অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী বা সুল্পমেয়াদী প্রাপ্তি ত্যাগ করতে হয়। এটা অনেক সময় বেশ বেদনাদায়ক। বিশেষ করে যখন এর জন্য ব্যক্তিগত অহংকারে আঘাত দাঁতমুখ খিঁচে সহ্য করতে হয়।

এই পরীক্ষা চুন্তির মাধ্যমেই শেষ হয়নি। তারা যখন চুন্তিতে স্বাক্ষর করতে যাবেন, তখন আবু জানদাল ﷺ উপস্থিত হলেন। তিনি কুরাইশের এই দৃত সুহাইল বিন আমরেরই পুত্র ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করায় কুরাইশরা তাকে বন্দি করেছিল। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। তিনি চুন্তি সম্পর্কে বা চলমান ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। রাসূল ﷺ-এর কাছে পৌঁছতে পরে তিনি যারপরনাই আনন্দিত ছিলেন। সুহাইল বিন আমর তাকে দেখতে পেয়ে বলল, এ হলো এই চুন্তির আওতায় প্রথম ব্যক্তি। তাকে আমাদের নিকট হস্তান্তর করো, না হয় আমরা এই চুন্তি মেনে নেব না। তাকে কোনো প্রস্তাবেই টলানো গেল না, ফলে রাসূল ﷺ অবশেষে আবু জানদালকে সুহাইল বিন আমরের সঙ্গে যেতে বললেন। আবু জানদাল ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমার ঈমানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তাদের কাছে ফেরত পাঠাচ্ছেন? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ধৈর্য ধরো, আল্লাহ



বৃহৎ উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাকে এবং তোমার কারণে যারা যন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের সহায়তা করবেন।

এই ঘটনা ছিল সাহাবিদের জন্য আরেকটি খুবই কঠিন পরীক্ষা এবং তাদের নৈতিক অবস্থানের প্রতি বিশাল আঘাত। তারা যা পরিক্ষারভাবে ঘৃণা ও অপছন্দ করতেন, এমন বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাদের আনুগত্যের পরীক্ষাও ছিল এই ঘটনা। সাহাবিদের মধ্যে যাদের প্রবল সম্মানবোধ ছিল এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলার প্রতি ছিল দৃঢ় আস্থা, তাদের পক্ষে তাদেরই এক মুসলমান ভাইকে কাফিরদের হাতে তুলে দেওয়ার দৃশ্য বেশ কঠিন ছিল। তার চেয়েও কঠিন ছিল রাসূল ﷺ-কে এ ব্যাপারে সম্মত হতে দেখা এবং প্রতিহত করতে কিছু করতে না পারা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা উচিত, রাসূল ﷺ নিজেও ব্যাপারটিকে খুবই অপছন্দ করেছিলেন। তবু তিনি এটা করেছিলেন, কারণ মহান রাব্বল আলামীনের কাছ থেকে তিনি মুসলমানদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। বর্তমানে হুদাইবিয়ার সন্ধির এই ঘটনা দেখিয়ে মুসলমানদেরকে কাফিরদের হাতে তুলে দেওয়ার দলিল কিংবা সিম্বান্ত গ্রহণ করা যাবে না; বরং কোনো মুসলমানকে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হারাম। যে এই গর্হিত কাজ করবে, সে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে জাহান্নামি হবে।

আবু জানদালকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, হজরত 'উমার 🚲 তার কাছে গিয়ে নিজের তরবারি দেওয়ার চেস্টা করলেন; যেন তিনি সুহাইল বিন আমরকে আক্রমণ করে পালাতে সক্ষম হন; কিন্তু আবু জিনদাল 🚓 তা গ্রহণ করলেন না। তাই 'উমার 🚓 বললেন, সে তার পিতাকে রক্ষা করল এবং তাকে আক্রমণ করল না।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাওয়ার পর সুহাইল বিন আমর চলে গেলে আল্লাহর রাসূল 🎉 সাহাবিদেরকে মাথা মুন্ডন করা এবং কুরবানি সম্পন করার নির্দেশ দিলেন; কিন্তু সাহাবিদের কেউই সঙ্গো সঙ্গো তা করলেন না। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের এই আচরণে খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি তার নির্দেশ পুনরায় উচ্চারণ করলেন না; কারণ তিনি জানতেন, নবিজি ফের নির্দেশ করলে যদি সাহাবিরা সঙ্গো সঙ্গো তা না করেন, তবে তাদের ঈমান অস্বীকার করা হবে। তিনি তাদের থেকে সরে গিয়ে নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করে বললেন, মুসলিমরা তো নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেললা আমি নির্দেশ করলাম অথচ তারা তা পালন করল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা 🏂 এ যাত্রায় তাঁর সঙ্গো ছিলেন। তিনি বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, এই চুক্তি করতে গিয়ে আপনি যত সমস্যার মোকাবিলা করেছেন, তার কারণে মুসলমানেরা অনেক চাপের মধ্যে রয়েছে। আপনি যদি তাদেরকে এই নির্দেশ মান্য করাতে চান, তাহলে আপনি বাইরে গিয়ে নিজে পালন করুন, তাহলেই সবাই অনুসরণ করবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার পরামর্শ গ্রহণ করে তাঁবু থেকে বের হয়ে নিজ মাথা মুন্ডন করে দিতে ও উট কুরবানির জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁর দেখাদেখি সকল সাহাবি একই কাজ করলেন। তারা অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন। সন্ধিতে শাদা চোখে পরাজ্রয়ের পর কুরবানি ও মাথা মুন্ডন তাদের জন্য অনেক কঠিন ছিল; তবু তারা রাসূল 🏂-এর নির্দেশ পালন করলেন। একে অপরের মাথা মুন্ডনের



সময় তারা কাঁদছিলেন। কারও কারও মাথা কেটে গিয়েছিল। রক্ত আর চোখের পানি মিশে একাকার। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা কাঁদছেন; অথচ বিনা বাক্যব্যয়ে নেতার নির্দেশ মেন নিচ্ছেন; কী অভূতপূর্ব দৃশ্য! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই দৃশ্য এত পছন্দ করলেন যে, কুরআনে এর উল্লেখ করেছেন।

'উমার 🚓 ও অন্যান্যদের মতো যোম্থাদের কাছে এই সন্ধি খুবই অবমাননাকর ছিল। একই সঙ্গো রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাদের আনুগত্যের পরীক্ষাও ছিল এটি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলার পরিকল্পনা সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। সাহাবিরা যখন হাজ্জ সম্পন্ন করতে না পারার রাগ-ক্ষোভ-হতাশা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা মেনে নিলেন, মহান রাব্বুল আলামীন একে সুপ্পন্ট বিজয় হিসেবে অভিহিত করলেন।

| নিশ্চয় (হে মুহাম্মাদ) আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।[সূরা ফাতহ | ৪৮: ১]

শিক্ষা

এ ঘটনায় দুটি প্রধান শিক্ষা রয়েছে।

১. একজন নেতার সর্বদা তার লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকা জরুরি। এজন্য যা করা প্রয়োজন, সব করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। এমনকি যদি লক্ষ্য অর্জনে তার ব্যক্তিগত অহংবোধকেও ত্যাগ করতে হয়, তবু সামগ্রিক স্বার্থ দেখতে হবে। নেতা যদি তার ব্যক্তিগত তৃপ্তি অর্জনের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাহলে পরিণামে তা উদ্দেশ্যের হানি ঘটাতে পারে। নেতার সব সময় মনে রাখা উচিত—তার সাফল্য, খ্যাতি, মৃল্য ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি সবই তার মিশনের সফলতার ওপর নির্ভর করে। এ কারণে বাকি সবকিছু সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই হওয়া উচিত। যদি তার মিশনের দরজা খুলে যাওয়ার জন্য সাময়িকভাবে পিছু হটার প্রয়োজনও হয়, মিশনের স্বার্থে তা করার মানসিক ও সার্বিক প্রস্তুতি থাকা উচিত। তির ছোড়ার জন্য হাতকে পেছনে টানতেই হয়। যত পেছনে টানা সম্ভব, তত বেশি দূরে তির নিক্ষিপ্ত হবে।

যে নেতা এই বিষয় না বুঝে নিজের অহংবোধকে বেশি গুরুত্ব দেয়, সে শেষ পর্যন্ত সাফল্যকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ইতিহাসে সে এ ব্যর্থতার কারণেই স্মরিত হয়, সাফল্যের জন্য নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ সারা জীবন তাঁর নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে এতটাই নিঃসংশয় ছিলেন যে, তার মিশনের সফলতার জন্য তিনি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি যে চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছেন, তা তাঁর অনুসারীদের পছন্দনীয় ছিল না, তবু তারা কোনো বাধা দেননি। নীরবে মেনে নিয়েছেন। সাময়িক মনঃক্ষুণ্ণতার প্রকাশ ঘটালেও নবিজিকে ছেড়ে যাননি, পাশে থেকেছেন। এটাই তাঁর প্রতি অনুসারীদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ। শুধু ভালো নেতার কারণে বিজয় অর্জিত হয় না, তালো অনুসারী পাওয়াও অধিকতর জরুরি।

২. নেতার অনুসারীদেরকে সব সময় তাদের নেতাকে বিশ্বাস করা এবং পাশে থাকতে সৃতঃস্ফূর্ত হতে হবে। এমনকি নেতা যদি এমন কোনো কাজ করে, যা তারা সেসময়



বৃহৎ উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ

পছন্দ করতে পারছে না বা বুঝতে পারছে না—তখনও এই মনোভাব বজায় থাকতে হবে। নেতা নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে নিঃসংকোচে বিশ্বাস করতে হবে। রাসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রে এটা তাদের ঈমানের অংশ ছিল, কারণ তারা জানতেন— তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ﷺ এবং তাঁর কাছে ওয়াহি নাযিল হয়। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি যদি কিছু করেন, তবে তা আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারেই করেন। ফলে আপাত পছন্দ না করলেও বা বুঝতে সক্ষম না হলেও তারা তাঁকে অনুসরণ করেছেন, সহায়তা করেছেন।

পরবর্তী ঘটনাবলি প্রমাণ করেছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে নবিজি সঠিক কাজই করেছিলেন।

যাহোক, সাধারণ নেতা যিনি আসমানি নির্দেশনাপ্রাপ্ত নন, তার ক্ষেত্রেও অনুসারীদের মধ্যে বিনা প্রশ্নে অনুসরণের মতো বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে হবে। এর মানে এই নয় যে, অনুসারীরা কখনো প্রশ্ন করবে না বা তাদেরকে কখনো প্রশ্ন করতে দেওয়া হবে না। প্রশ্নের ধরনটা গুরুত্বপূর্ণ—বোঝার জন্য প্রশ্ন নাকি তার কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন?

যদি বোঝার জন্য হয়, তবে একে উৎসাহিত করা উচিত; কিন্তু প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি হয় নেতার নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, তাহলে এটি একটি বিপদসংকেত। নেতার উচিত, সময়ের আগেই তা সংশোধন করে নেওয়া। অনুসারীদের সঙ্গে প্রায়শই খোলামেলা এবং নিঃসংকোচে কথাবার্তা বলার এটাও একটি কারণ। একজন নেতা যত বেশি সহজগম্য হবেন, তার অনুসারীরা তত বেশি বুঝতে পারবে---তিনি কী কাজ করছেন এবং কেন করছেন। তার অনুসারীদের প্রতি তিনি যত শ্রন্ধা পোষণ করবেন, অনুসারীরা তাকে রোল মডেল হিসেবে তত বেশি বিবেচনা করবে, বিশ্বাস করবে। একজন নেতার মধ্যে এ সকল গুণাবলি গড়ে তোলা খুবই জরুরি।



মহানুভবতা ও ক্ষমাপরায়ণতা

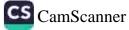
রাসূল ﷺ-এর জীবন থেকে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাটি নিতে চাই, তা হলো উদারতা ও ক্ষমা। বিজয়ী হিসেবে মাক্বায় প্রবেশের পর তাঁর আচরণ সমগ্র মানবজাতির জন্য ব্যক্তিগত নম্রতা, উদার হুদয় ও দয়ার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যে কুরাইশরা তাঁকে নির্যাতন করেছে, ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে; তাঁর স্ত্রী, চাচা, কন্যা—যাদেরকে তিনি সর্বাধিক ভালোবাসতেন—তাদের মৃত্যুর জন্য যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী, যারা তাঁকে অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে, তারা এখন তাঁর দয়ার প্রত্যাশী।

তিনি কী করলেন? তাদের সবাইকেই ক্ষমা করে দিলেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বললেন, কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না। আরবে বহু বছরের পুরাতন প্রথা ছিল, প্রতিশোধের জন্য সম্পদ লুট করা হতো, পুরুষদের হত্যা করা হতো এবং নারী ও শিশুদের দাসবৃত্তিতে বাধ্য করা হতো। মাক্বার লোকেরাও একই আচরণের কথা ভেবে তটস্থ ছিল।

অনন্য ক্ষমার ঘোষণায় লোকেরা হতভদ্ব হয়ে গেল। তারা তাদের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। প্রথমে তারা নিজেদের ঘরে গিয়ে লুকিয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল, বিজয়ী দল সাধারণত যা করে, বিজয়ী মুসলমানেরাও সেরকমভাবে তাদের বাড়িঘর ভেঙে লুটপাট করবে ও তাণ্ডব চালাবে; কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। অবশেষে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা কী ঘটেছে, তা দেখার জন্য বেরিয়ে এল। হিন্দা ছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চরম শত্রু। উহুদযুদ্ধে ওয়াহশি কর্তৃক রাসূল ﷺ-এর চাচা হজ্বত হামজা বিন আবদুল মুন্তালিবকে হত্যা এবং তার মৃতদেহ বিকৃত করার পেছনে হিন্দাই দায়ি ছিল। এ ঘটনা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে খুব কন্ট দিয়েছিল। হিন্দা কী দেখল? সে দেখল, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবিরা মাসজিদুল হারামে নামাজ আদায় করছেন, আল্লাহর দয়া কামনা করছেন এবং সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

এটা সত্যি যে, বিজয়ী হিসেবে আল্লাহর রাসৃল ﷺ প্রতিশোধ নিতে পারতেন; কিন্তু এর ফলে নতুন ক্ষত তৈরি হতো যা পরবর্তী সময়ে নতুন সংঘর্ষের সূচনা করত। অথবা তাঁর মিশনের সাফল্যের পথে বা তাঁর দাওয়াত প্রচারে বাধা হয়ে দাঁড়াত। যারা তাঁর ক্ষতি করেছিল, তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি সকলের কাছে এক শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দিলেন। খুব সৃক্ষ্ম ও গাঢ়ভাবে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর মিশন সকল

282



ব্যক্তিগত বিবেচনার উধ্বে। পূর্বে যারা তাঁর ও সাহাবিদের সজ্যে অন্যায় করেছিন, তাদের সকলকে তিনি কঠিন ঋণের বাঁধনে জড়ালেন। তাঁর সজ্যে লড়াই করা বা তাঁক ঘৃণা করার পরিবর্তে এবার শত্রুরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তাঁকে সভুন্ট করতে চেষ্টা করতে লাগল। এই এক ঘোষণার মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ভবিষ্যতের সকল বিবাদের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিলেন। এই অনন্য ক্ষমার গুণ ও নজির ছাড়া তাঁর নির্দিষ্ট মিশন ব্যর্থ হতে পারত। নেতাকে মিশনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবশাই নিজের ব্যক্তিগত লাভ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে; বরং ত্যাগ, ক্ষমা, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের ব্যক্তিগত উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। অনুসারীরা তখনই নেতাকে অনুসরণ করে, যখন তার মধ্যে এই আচরণগুলো দেখতে পায়। মিশনের সাফল্য হলো এর ফলাফল। ক্ষমা এই সফলতার ভিত্তি।

ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির চেয়ে আন্দোলনের উদ্দেশ্য বৃহত্তর

আন্দোলনের উদ্দেশ্যের প্রতি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অজ্ঞীকার এবং এর জন্য ব্যক্তিগত আবেগ বিসর্জনের সম্ভবত সর্বোত্তম ও সবচেয়ে তীক্ষ্ণ উদাহরণ হলো তাঁর প্রিয় চাচা ও সাহায্যকারী হজরত হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবের হত্যাকারী ওয়াহশির প্রতি তাঁর আচরণ।

উহুদ যুদ্ধের ৭০জন শহীদ সাহাবির মধ্যে হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব এক-কে শহীদদের নেতা উপাধি দেওয়া হয়। রাসূল ﷺ-এর জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনাগুলোর একটা এটা। তিনি তাঁর চাচার মৃতদেহ দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন তার পাকস্থলী উন্মুক্ত করে ভেতরের অজ্ঞাপ্রত্যজ্ঞা বের করে ফেলা হয়েছে। নবিজিকে যে লোকটি পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সে বলল 'আমি তাকে এভাবে পাইনি। তাকে বিকৃত করা হয়েছে।' আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবাহ হামজা এক-এর কলিজা খাওয়ার শপথ নিয়েছিল, তাই সে তার কলিজা ছিড়ে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। হামজা এক-এর মৃতদেহের প্রতি এই আচরণ রাসূল ﷺ-এর কন্টকে আরও বাড়িয়ে দিলো। তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

ওয়াহশি বলেন, আমি মাক্কায় ফিরে গেলাম এবং আল্লাহর রাস্ল ﷺ মাক্কায় না আসা পর্যন্ত সেখানেই থাকলাম। তারপর আমি তায়েফে পালিয়ে গেলাম। সেখানকার প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আল্লাহর রাস্ল ﷺ-এর কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত থাকলাম। এরপর আমি কোথায় যাব, জানতাম না। আমি লোকেদের বললাম, আমি সিরিয়া অথবা ইয়েমেন বা অন্য কোনো দেশে চলে যাব। তখন কেউ একজন বলল, যে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধর্ম গ্রহণ করে, তাকে তিনি হত্যা করেন না। তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এই কথা শুনে আমি মাদীনায় গিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সাক্ষ্য দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওয়াহশি? আমি বললাম— জি, হে আল্লাহর রাস্ল ﷺ। নবিজি বললেন—বসো, আমাকে বলো কীভাবে তুমি আমার চাচা হামজাকে হত্যা করলে? তারপর আমি তোমাদেরকে যেভাবে বললাম, সেভাবেই তাঁকে পুরো ঘটনা বলেছি। বলা শেষ হলে তিনি বললেন, ওয়াহশি, দয়া করে আমার সামনে থেকে তোমার মুখ সরাও। যাও, আল্লাহর রাস্তায় সেভাবে লড়াই করো. যেভাবে



3

মহানুভবতা ও ক্ষমাপরায়ণতা

আল্লাহর বিরুম্খে লড়াই করেছিলে। তাই আমি নবিজিকে এড়িয়ে চলতাম যেন আমার মুখ তাকে দেখতে না হয়। এভাবেই এক সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে তাঁর নিকট নিয়ে গেলেন।

ওয়াহশি পরে মুসাইলামাতৃল কাজ্জাবের বিরুম্থে লড়াইয়ের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। প্রতারক মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল ﷺ বেঁচে থাকতেই নিজেকে নবি দাবি করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসাইলামার সজ্জো সাক্ষাৎ করে এ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন; কিন্তু মুসাইলামা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং মাদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার বিরুম্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তারা যুম্বে বিজ্ঞয়ী হয় এবং মুসাইলামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করা হয়। ওয়াহশি যুন্বে তার ভূমিকা বর্ণনা করে বলেন, যে বর্শা দিয়ে আমি হামজা ক্র-কে হত্যা করেছিলাম, সেটি তুলে নিলাম। দেখলাম মুসাইলামা তার তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার দিকে বর্শা তাক করে লক্ষ্য স্থির করলাম, সময় নিয়ে নিখুঁত নিশানা করে ছুড়ে মারলাম। একই সময়ে আরেকজন মুসলমান তাকে অন্যদিক থেকে তরবারি দিয়ে আক্রমণ করে। প্রথমে আমার বর্শা এবং তারপর তার তরবারি তাকে আঘাত করে। অন্য ব্যক্তিটি ছিলেন আবু দুজানা, যাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর তরবারিটি দিয়েছিলেন। ওয়াহশি ক্র বলেন, যদি আমি সেই লোক হই, যে মুসাইলামাকে হত্যা করেছে, তবে এই বর্শা দ্বারা আমি সর্বোত্তম মানুযকে এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।

মিশনের সফলতার বৃহত্তর স্বার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে পাশ কাটিয়ে গেছেন: এমন আরেকটি উদাহরণ হলো, হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনি।

খালিদ বিন ওয়ালিদ 🚓 বলেন, আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুম্থে বহু যুম্থে অংশগ্রহণ করেছি। প্রত্যেক যুথ্থের শেষে আমার মনে হতো, আমি আমার সময় নন্ট করেছি। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ ﷺ-ই জয়ী হবেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে একদিন আমি ২০০ লোকের বাহিনী পরিচালনা করছিলাম। আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুখোমুখি হলাম, তিনি তখন তার লোকদেরকে নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করছিলেন। সালাতের মধ্যেই তাদেরকে আক্রমণ করে শেষ করে দেওয়ার একটা বিশাল সুযোগ ছিল; কিন্থু কিছু একটা আমাকে টেনে রেখেছিল এবং আমি আক্রমণ করিনি। আমি তাদেরকে পরের সালাতের সময় আক্রমণের সিম্থান্ত নিলাম; কিন্থু তখন তারা ভিন্নভাবে সালাত পড়ছিল; আমি বুঝতে পারলাম, তাকে সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। সালাতুল খাওফের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং সাহাবিরা এমনভাবে সালাত পড়ছিল, তাদেরকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না।

খালিদ বিন ওয়ালিদ 🚓 খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। আক্রমণোদ্যত অবস্থা থেকেও তিনি বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন।

হুদাইবিয়ার চুন্তির বছরে আল্লাহর রাসূল ﷺ যে উমরাহ পালন করতে পারেননি, তার কাজা আদায় করার জন্য যখন হুদাইবিয়ার চুন্তির পরের বছর মান্ধায় এলেন, তখন খালিদ বিন ওয়ালিদের ছোট ভাই ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ—যিনি মুসলমান ছিলেন



CamScanner

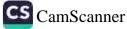
Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft লিডারশিশ লেমনস

এবং রাসূল ﷺ-এর সঙ্গো ছিলেন, তার ভাইয়ের সঙ্গো দেখা করতে গেলেন। খালিদ তখন অন্যান্য কাফির সহযোগীদের সঙ্গো মাক্বা খালি করে অন্যত্র গিয়েছিলেন, তাই ওয়ালিদ তার ভাইয়ের জন্য একটি চিঠি রেখে এলেন। চিঠিতে লিখলেন—বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইসলামের প্রতি আপনার বিদ্বেযের চেয়ে অদ্ভুত আর কিছুকে আমি জানি না। আপনার মতো বুম্বিমান কেউ কি ইসলামের মতো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনার কথা জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছেন 'খালিদ কোথায়?' আমি বলেছি 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা তাকে ইসলামে নিয়ে আসবেন। তারপর তিনি বললেন 'তার মতো কেউ কীভাবে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? যদি সে তার শক্তি ও বীরত্বকে ইসলামের জন্য ব্যয় করত, তবে তার জন্য তা অনেক ভালো হতো! আমরা তাকে অবশ্যই অন্যদের চেয়ে প্রাধান্য দিতাম।' কী ভালো জিনিস হারাচ্ছেন সে ব্যাপারে একটু খেয়াল রাখবেন ভাই!

খালিদ 🚲 বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, একথা আমাকে খুব প্রভাবিত করল এবং তাঁর কাছে যেতে বাধ্য করল। মানুষের সত্যিকারের কল্যাণকামিতা হলো তার আখিরাতে মুক্তির জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করা। এটাই দাওয়াহর আসল তাৎপর্য।

খালিদ ఉ একদিন স্বপ্নে নিজেকে সংকীর্ণ একটি স্থানে দেখতে পেলেন, যেখান থেকে তিনি হেঁটে বের হয়ে একটি বিস্তীর্ণ ও খুবই চমৎকার স্থানের দিকে যেতে দেখলেন। পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হজরত আবু বাক্র 🚓-কে স্বপ্নের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আবু বাক্র 🚓 বললেন, এর অর্থ হলো তিনি শিরকের সংকীর্ণতা ত্যাগ করে ইসলামের বিশালতায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ 🚜 তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গো মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য সাক্ষাৎ করলেন। তিনি সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছে গিয়ে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাফওয়ান বলল, আমি ছাড়া সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেও আমি করব না। তারপর তিনি ইকরিমা বিন আবু জাহলের কাছে গিয়ে বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঞ্জো আমাদের অবস্থা এখন গর্তের শিয়ালের মতো। গর্তে এক বালতি পানি ঢেলে দিলে এটি দৌড়ে বেরিয়ে আসবে। ইকরিমা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে খালিদ তাকে তার কথা কাউকে না জানানোর জন্য বললেন। তারপর তিনি গেলেন উসমান বিন তালহার কাছে, যে উহুদযুন্ধে তার পরিবারের সাতজন সদস্যকে হারিয়েছে। প্রথমে খালিদ তার সঞ্জো কথা বলতে ইতস্তত করছিলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, উসমান অবশ্যই এর বিরোধিতা করবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কথা বলার সিম্ধান্ত নিলেন। তাকে বিস্মিত করে দিয়ে উসমান নিজেও তার সঙ্গো তখনই যাওয়ার ব্যাপারে একমত হলেন। দাওয়াহর ব্যাপারে তাই আমাদের অবশ্যই পূর্ব থেকে ধারণা করা উচিত নয়। যে চায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা তাকে পথ প্রদর্শন করেন। খালিদ, আমর এবং উসমান 🞄 মাদীনার কাছাকাছি পৌঁছে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গো সাক্ষাতের জন্য উত্তম পোশাক পরলেন। তারা ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর রাসূল 🏂 বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, যিনি তোমাদের ইসলামের দিকে অসিনান



মহানুভবতা ও ক্ষমাপরায়ণতা

তোমরা বুন্ধিমান বলে আমি আশা করেছিলাম, তোমাদের বুন্ধিমত্তা তোমাদেরকে কেবল কল্যাণের দিকেই পরিচালিত করবে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষের ক্ষমতা বুঝতে পারতেন এবং তাদেরকে সে অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ করতেন। বুম্ধিমত্তা, যোগ্যতা ও নেতৃত্বগুণের বিবেচনায় তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ খালিদ বিন ওয়ালিদকে তার চেয়ে সিনিয়র সাহাবিদের ওপরে সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ ঘোষণা করে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারি উপাধি দিলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদও তার তেজস্বীতার চমক প্রদর্শন করে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সিম্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেন।

অনেক বছর পর খালিদ বিন ওয়ালিদ 🚓 যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তার এক বন্ধু সাক্ষাৎ করতে এলেন। খালিদ 🚓 কে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তিনি বন্ধুকে বললেন, আমার শরীরের মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে তির-বর্শা কিংবা তরবারির আঘাত নেই। এর সবগুলোই আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে গিয়ে পেয়েছি। তা সত্ত্বেও আমাকে আমার বিছানায় উটের মতো অক্ষম মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে, যুন্ধের ময়দানে শাহাদাত নয়।

বন্ধু তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, নিজেকে যন্ত্রণা দিয়ো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাকে তোমার প্রচেন্টার জন্য পুরক্ষার দেবেন। তোমার ভাগ্য তখনই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমাকে সাইফুল্লাহ উপাধি দিয়েছিলেন। আল্লাহর তরবারি কী করে যুন্ধের ময়দানে ভেঙে পড়বে?

শিক্ষা

এটা সুপন্ট, নেতার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের তুলনায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে। প্রিয় চাচার মৃত্যুতে শোকাহত এবং হত্যাকারীর প্রতি ক্রুম্থ হলেও রাসূল ﷺ চেয়েছেন ওয়াহশি যেন সঠিক পথে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে নেতার উচিত তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ যেন দীন বা মানবতার সাধারণ উদ্দেশ্যকে ক্ষতি না করে—সেদিকে লক্ষ রাখা। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আমাদের তীব্র ভালোবাসা থাকে, তার জন্যও বৃহত্তর কল্যাণ থেকে ছিটকে পড়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। এ ধরণের দোদুল্যমান পরিস্থিতি অনেক সময় নতুন দরজা খুলে দেয়। এ রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে মানুযের হৃদয়ের দরজা খুলে যায়। নেতা নিজের স্বার্থকে পাশে রেখে উদ্দেশ্যের কল্যাণ লাভের প্রচেষ্টাকে জনগণ ভালোভাবে গ্রহণ করে। এ ধরনের পরীক্ষা যেন প্রশ্ন ছুড়ে দেয়—তোমার উদ্দেশ্যের বিজয় তুমি সত্যিকারে কত্যটক চাও?

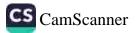
আমাদের কাজই এর উত্তর দেবে।

ক্ষমা করার চেয়ে বলা সহজ; কিন্তু এটিই সম্ভবত উদ্দেশ্যের প্রতি নেতার অজ্ঞীকারের সবচেয়ে শক্তিশালী ও পরিষ্কার নির্দেশক। উদ্দেশ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবম্ধ হওয়া এবং ব্যক্তিগত আবেগ ও লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা নেতার কর্তব্য। নেতার নিজসু



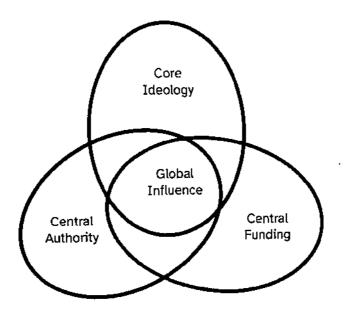
লিডারশিপ লেসন্য

অঞ্জীকার সকল বাধাকে ছাপিয়ে গিয়ে সমস্ত হতাশা ও বিপত্তি সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে যেতে সক্ষম করে তোলে। উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে এ আবেগকে কখনো কখনো আত্মত্যাগ করতে হয়। সকল নবিই নিজের লোকদের দ্বারা নির্যাতিত ও বাধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং দেখা যায় সর্বাপেক্ষা বেশি নির্যাতিত হয়েছেন মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি আল্লাহর বাণী বহনের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন এবং এর পুরস্কারস্বরূপ চরম শত্রুকেও তাঁর আন্দোলনের সঞ্চো যুক্ত করতে পেরেছিলেন।



ব্যক্তি-পরিচালনা থেকে প্রক্রিয়া-পরিচালনায় স্থানান্তর

যে নেতা তার নেতৃত্বের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব দেখতে আগ্রহী। যিনি মৃত্যুর পরও তার বার্তাগুলো ছড়িয়ে যেতে দেখতে চান, তাকে অবশ্যই ব্যক্তি কেন্দ্রিক নেতৃত্ব থেকে সরে গিয়ে প্রক্রিয়া কেন্দ্রিক নেতৃত্বে আসতে হবে। সুতরাং, একটি আন্দোলনের বৈশ্বিক প্রকৃতি অর্জন, এর প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরেও টিকে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার শর্তগুলো কী কী? আমার দৃষ্টিতে তিনটি শর্ত পূরণ করলে আন্দোলনটি বৈশ্বিক রূপ লাভ করতে সক্ষম হবে।



মূল ভাবাদর্শ

যেকোনো বৈশ্বিক আন্দোলনের প্রথম শর্ত হলো, এর একটি মূল ভাবাদর্শ থাকবে। সহজ, প্পন্ট; কিন্তু শক্তিশালী কনসেন্ট। সাধারণ মানুষ ও বিশ্বাসীদেরকে আকৃষ্ট করবে এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়া ও অনুসরণ করা সহজ হবে। নেতারা হবেন আদর্শিক, তারা আদর্শ শিক্ষা দেবেন, সময়ে সময়ে সংশোধন করবেন, ব্যাখ্যা করবেন, প্রচার করবেন এবং সর্বোপরি সততা বন্ধায় রাখবেন। এর মধ্যে স্কুল-কলেজ, লেখক, শিক্ষক,

. ...!



গবেষক-পণ্ডিতরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা এই আদর্শ পড়াশোনা করবেন এবং আজীবন <mark>এর</mark> প্রবক্তা হবেন।

অনুসারীরা সাধারণত বিভিন্ন ধরণের বৈচিত্রতম শ্রেণি-পেশা থেকে আসে। ফলে নেতাকে দ্রুত এমন কিছু তৈরি করতে হয়, যা তাদের সকলকে নিজের ব্যক্তিগত গণ্ডি ছাপিয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। ঐক্যে সকল মানুষকে একজন মানুষে পরিণত করতে পারে, এমন এক পর্দ্বতিই নেতাকে তৈরি করে নিতে হবে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন ইসলামের প্রচার শুরু করলেন, তখন আরবের লোকেরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। কেবল নিজ গোত্রের পরিচয়ে পরিচিত ছিল। নিজেদের গোব্রের প্রতি আনুগত্য তাদের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য বিষয় ছিল। এ কারণে কিছু গোত্র ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সমর্থন করেছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ঠিক একই কারণে তাঁর নিজ গোত্র কুরাইশের লোকেরা প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করেছিল। গোত্রীয় আনুগত্যের কারণেই আরবে প্রাক-ইসলাম যুগে আরবরা তাদের ব্যক্তি বিবাদকে সমগ্র গোত্রের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। এমনকি খুব ক্ষুদ্র বিষয়েও বিবাদ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলত, পিতা থেকে পুত্রের মাঝে এই বিবাদ স্থানান্তরিত হতে থাকত।

মাদীনায় এই পরস্পর বিধ্বংসী যুদ্ধ এতটা প্রকট আকার ধারণ করেছিল যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন হিজরাত করেছেন, ততদিনে মাদীনার দুটি প্রধান গোত্র আওস ও খাজরাজের প্রধান নেতৃবৃন্দ সংঘর্ষে নিহত হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য প্রধান কাজ ছিল এই সকল বিশৃঙ্খল উপজাতিকে এক ছায়াতলে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে একটি সাধারণ পরিচয় দান করা, যা তাদেরকে একডোরে বেঁধে রাখতে সাহায্য করবে। এই ঐক্য ব্যাপারটা এমন এক বিষয়, যা সেসময় অজানা ছিল এবং অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে আবারও সেই বিতণ্ডার পুরোনো ঘটনাই ঘটে চলেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব

মজার ব্যাপার হলো, হিজরি বর্ষের গণনা আল্লাহর রাসূল 幾-এর জন্ম বা মৃত্যু থেকে শুরু হয়নি; বরং আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন ধর্মীয় বিশ্বাস ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বোধ তৈরি করে 'মুসলিম উন্মাহ' গঠন ও ইসলামি রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে মাদীনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন, তখন থেকে শুরু হয়।

কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটি আচরণকে প্রভাবিত করে।

নির্দিষ্ট কাঠামো ব্যতীত আচরণ ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, যা যেকোনো সময় পালটে গিয়ে এক প্রজন্মের পরিশ্রম মুহুর্তে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যদি শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করা যায়, যা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে পরিবেশন করবে, তাহলে যে মূল ভাবাদর্শ মানুযকে নতুন জীবন দিয়েছে, তা সদা স্পন্দনশীল ও শক্তিশালী থাকবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। আগেই বলেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বংশ পরম্পরায় শত্রু—এমন লোকদেরকে একত্রিত করা। কেবল একটি প্লাটফরমে



ব্যক্তি-পরিচালনা থেকে প্রক্রিয়া-পরিচালনায় স্থানান্তর

একত্রিত করাই নয়, তাদেরকে একে অপরের ভাই বানিয়ে দেওয়া এবং এমনভাবে পরম্পরকে ভালোবাসতে শেখানো যে—একসময়ের শত্রুর নিরাপত্তার জন্যও যেন নিজের জ্রীবনকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে। এটি এমন এক চ্যালেঞ্জ ছিল, আল্লাহর রাসূল স্ট্র ছাড়া আর কেউ কখনো গ্রহণই করেনি। এটি আল্লাহর রাসূল স্ট্র-এর রিসালাতের আরেকটি প্রমাণ। সরাসরি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া যে চ্যালেঞ্জে সাফল্য অর্জন করা কখনোই সম্ভব হতো না।

জাতি-গোত্র-বংশের গণ্ডিতে চিন্তা ও বৈষম্য রচনা করতে অভ্যস্ত মানুষগুলোকে কোন সে ধাতু, যা সকল বিবাদ ও মতানৈক্যের উধ্বে উঠিয়ে তাদেরকে একত্রে বাঁধতে সক্ষম হলো? এখানেই মূল ভাবাদর্শ—ইসলামের ভূমিকা; যা তাদেরকে এক সূত্রে বাঁধার ভূমিকা পালন করেছে। একজন মানুষ অন্যের ভাই হয়ে গেল, গোত্র বা জাতের কারণে নয়; বরং তাদের হৃদয়ে আলো ফেলা বিশ্বাসের কারণে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' ঘোষণার সুতোয় তারা পরম্পরে গেঁথে গিয়ে হয়ে গেল এক মালার হাজার গব্ধের ফুল। এটা এমন বিশ্বাস, যা কেবল আরব গোত্রীয়দের সঞ্জো তাদের ভাষা বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষকেই এক করেনি, সারা বিশ্বের সাদা-কালো-তামাটে সকল মানুষকে একত্রিত করেছে। আজকের এই দিনে এসব কিছু অদ্ভুত মনে হতে পারে, কারণ আমরা এই মহাগুণ হারিয়ে ফেলেছি এবং ইসলামপূর্ব যুগের অজ্ঞানতার অন্ধকার, বৈষম্য আর সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনার যুগে ফিরে গিয়েছি। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা রাসূল ﷺ-এর অলৌকিক এ কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব ,তোমরা আমার ইবাদাত করো। [সূরা আম্বিয়া, ২১: ৯২]

তোমাদের এই দীন তো একই দীন। আর আমি তোমাদের রব, অতএব, তোমরা আমাকে ভয় করো। [সূরা মু'মিনুন, ২৩: ৫২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদেরকে তাদের অতীত স্মরণ করিয়ে দিলেন। ইসলামপূর্ব রীতিনীতির কারণে তারা নিজেদের ওপর যে যন্ত্রণা ও অনিশ্চয়তা চাপিয়ে নিয়েছিল, তা নিয়ে তারা নিজেরাও অসুখী ছিল। ইসলাম এসে তাদেরকে অজ্ঞতা ও পথভ্রন্টতার দাসতৃ থেকে মুক্তি দান করে। তিনি বলেন,

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাইভাই হয়ে গেল। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। [সূরা আলে ইমরান ৩: ১০৩]



আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন,

। আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। যদি তুমি যমিনে যা



লিডারশিপ লেসন্স

আছে, তার সবকিছু ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। [সূরা আল-আনফাল ৮: ৬৩]

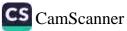
আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মাদীনায় একজন মুহাজিরের সজো একজন আনসারের ভাতৃত্ববোধের সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন, তখন কী ঘটেছিল, তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আনসার সাহাবিগণ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—দয়া করে খেজুরের বাগান আমাদের ও মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দিন। রাসূল ﷺ সম্মত হলেন না। তখন তারা বললেন, তাহলে মুহাজিরদেরকে আমাদের বাগানে কাজ করার অনুমতি দিন, এতে আমরা উৎপাদিত শস্য তাদের সজো ভাগ করে নেব। আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্মতি দিলেন; কিন্তু আনসারগণ নিজেরা বেশিরভাগ কাজ করে ফেলতেন এবং ফসল মুহাজিরদের সজো সমান ভাগ করে নিতেন। এবার মুহাজিরগণ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, আমরা এদের মতো মানুষ কখনো দেখিনি। তারা যখন দরিদ্র, তখনও তারা আমাদের সুন্তি দেয়। আর যখন সচ্ছল, তখন একেবারে দিলদরিয়া। তারা তাদের নিজেদের খামারে কাজ করে, তা সত্ত্বেও ফসল আমাদের মাঝে ভাগ করে দেয়। আমরা আশজ্কা করছি, তারা নিজেরা আল্লাহর কাছ থেকে সকল পুরস্কার নিয়ে যাবে, আমাদের জন্য কিন্থুই থাকবে না। রাসূল ﷺ বললেন—না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কৃতজ্ঞ থাকবে এবং তাদের জন্য দু'আ করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা তোমাদেরকেও পুরস্কৃত করবেন।

উম্মাহর নতুন আইন—পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করা

মাদীনায় অনেক সম্প্রদায় ও তাদের মধ্যকার নানাবিধ চুক্তির কারণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ জটিল ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ ঈমানের ভিত্তিতে অভিনব বন্ধনের মাধ্যমে তাদের পুরাতন ঐতিহ্যগত বন্ধন ছিন্ন করে একটি নতুন জাতি গঠন করেছিলেন। পুরাতন সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলামের ভিত্তিতে নতুন সম্পর্ক গড়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেন,

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরিকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম। বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসম্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। [সূরা তাওবা ৯: ২৩-২8]

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে



ব্যক্তি-পরিচালনা থেকে প্রক্রিয়া-পরিচালনায় স্থানান্তর

তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্থুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে ক্ধুরূপে গ্রহণ করো না) তোমরা গোপনে তাদের সঞ্জো বন্ধুত্ব প্রকাশ কর, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। তারা যদি তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। তারা যদি তোমাদেরকে বাগে পায় তবে তোমাদের শত্রু হবে এবং মন্দ নিয়ে তোমাদের দিকে তাদের হাত ও যবান বাড়াবে; তারা কামনা করে যদি তোমারা কুফরি করতে। কিয়ামাত দিবসে তোমাদের আত্নীয়তা ও সন্তানসন্থতি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। [সূরা মুমতাহিনা ৬০:১-৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের পুরনো গোত্রীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে ঈমানের ভিত্তিতে নতুন সম্পর্ক গড়ার নির্দেশ দিলেন। ঈমান ও ভ্রাতৃত্ব গঠনে সাহচর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই দিকটিই স্পষ্ট করে দিলেন। এটা অত্যস্ত জরুরি ছিল। কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তাদের গোত্রীয় ক্বন অনেক বছরের পুরানো ছিল এবং তা পরিচালিত হতো ভুল প্রথা অনুযায়ী। ঈমানের ভিত্তিতে গড়া এই নতুন সম্পর্ক নিয়ে আরবদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তবু পুরনো সকল কুসংস্কার ত্যাগ করে ঈমানের ভিত্তিতে সবাই একে অপরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এই বন্ধন তাদের জন্য ঈমানের পরীক্ষা ছিল। কারণ এই বিশ্বাসের ফলে তারা তাদের অবিশ্বাসী পরিবারবর্গকে ত্যাগ করতে হয়েছে। ভাই আপন ভাইকে এবং ছেলে বাবাকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। রক্তের ভাইয়ের পরিবর্তে ধর্মের ভাই আপন হলেন। এর মাধ্যমে কুরআন ও আল্লাহর রাস্ল ্র্র্ছ-এর নবিত্বে তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা করা হচ্ছিল। বিশ্বাসের সত্যিকারের পরীক্ষা কাজের মাধ্যমেই হয় এবং সাহাবিরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে প্রমাণিত হন।

বন্ধুত্বের নতুন পম্ধতি

পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করে এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা পরস্পরের সম্পর্ক স্থাপনের নতুন উপায় বাতলে দিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা জানিয়ে দিলেন, মুসলমানদের সত্যিকারের বন্ধু কারা এবং কিসের ভিত্তিতে বন্ধুতৃ স্থাপন করতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যেকোনো মানুষকে একজন বন্ধুই ভালো পথে নেয় আবার পথভ্রষ্টও করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা মুমিনদের পরিচয় এবং গুণাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করলেন—যেন তাদের চেনা সহজ হয়। কোথেকে সাহায্য ও নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা তাঁর উৎস দেখিয়ে দিলেন। মুসলমানদের আগে যারা কিতাব পেয়েছিল, তাদের ভুলগুলো আল্লাহ বুঝিয়ে দিলেন। তাদের ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিলেন—যেন এ সকল ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়। তিনি নিশ্চয়তা দিলেন, যদি তারা সত্যবাদী হয়, ধর্মের প্রতি অনুগত থাকে, তাহলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয়ী হবে।

202



লিডারশিপ নেডান্য

তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে। আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী। আর যখন তোমরা সালাতের দিকে ডাক, তখন তারা একে উপহাস ও খেল-তামাশারুপে গ্রহণ করে। তা এই কারণে যে, তারা এমন কওম, যারা বুঝে না। [সূরা মায়েদা, ৫: ৫৫-৫৮]

কুরআনের এ সকল আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল ﷺ সুপ্রুটভাবে ভালোমন্দ ও ভুল-শুদ্ধের মধ্যকার পার্থক্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হলেন। যারা তাঁকে অনুসরণ করেছে, তাদেরকে জাতিগত ও গোত্রীয় চিন্তা-ভাবনার মূল্যবোধ থেকে মুক্ত করে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি গড়ে দিলেন। এটা তাদের নতুন পরিচিতি, যা তাদেরকে একত্রিত রেখেছিল।

শিক্ষা

একটি বৈশ্বিক আন্দোলন শুরু করার জন্য কী কী প্রয়োজন, সেগুলো আগেই বলা হয়েছে। তাই পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেটি হলো শুরুর দিকে নেতার ব্যক্তিত্ব মানুষকে আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করতে বিশাল ভূমিকা পালন করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব, আচরণ, কূটনীতি, দয়া ও মহত্ত মানুষকে তাঁর ও ইসলামের দিকে টেনে এনেছে। এমন একজনও ছিল না, যিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে পছন্দ করতেন না; কিন্তু আধ্যাত্মিক বিবেচনায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সাহাবিরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিজেদেরসহ অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা এর সাক্ষী এবং তিনি বলেন,

নবি মুমিনদের কাছে তাদের নিজদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর। আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতাস্বরূপ। আর আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরদের তুলনায় আত্নীয় স্বজনরা একে অপরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভালো কিছু করতে চাও (তা করতে পার)। এটা কিতাবে লিপিবন্ধ আছে। [সূরা আহযাব ৩৩: ০৬]

সুতরাং আনুগত্য পেতে হলে নেতাকে অবশ্যই ভালো লাগা এবং ভালোবাসার মতো একজন হতে হবে। কারণ, শুরুতে এই কারণেই মানুষ কারও আনুগত্য করে। বিশেষ করে যখন অনুসারীরা নেতার সঙ্গে একমত হয় না বা নির্দিন্ট কোনো সিম্থান্ত সমর্থন করতে পারে না, তখন লক্ষ্যে টিকে থাকার জন্য দল ও শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে এটি খুব জরুরি হয়ে পড়ে। এর স্পন্ট উদাহরণ পাওয়া যায় হুদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর। যেখানে সাহাবিরা চুক্তির শর্তসমূহ পছন্দ না করলেও আল্লাহর রাসুল ﷺ-কে অনুসরণ করেছেন শুধু তাঁকে ভালোবাসার জন্য, তাঁর প্রতি বিশ্বাস থাকার জন্য। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও দ্বিধাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।



ব্যক্তি-পরিচালনা থেকে প্রক্রিয়া-পরিচালনায় স্থানান্তর

সিম্ধান্ত গ্রহণে কঠোরতা অবলম্বন না করা

с.с

উহুদযুন্ধের সময় যখন কুরাইশরা মাদীনা আক্রমণ করতে যাবে, তখন মাদীনাকে রক্ষা করার জন্য দুটি উপায় ছিল।

একটি ছিল মাদীনায় থেকেই যুম্থ করা, যেন মাদীনার নারী-শিশুরাও যুম্থে অংশগ্রহণ করতে পারে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ভিন্ন ভিন্ন কারণে এই মত পোষণ করেছিলেন।

জন্য আরেকটি মত ছিল মাদীনার বাইরে গিয়ে লড়াই করা। যুবকরাসহ বেশিরভাগই এ মতের পক্ষে ছিলেন। এরা বদরযুম্থে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাদের ধারণা ছিল, শত্রু মাদীনায় প্রবেশের সাহস করবে না। ফলে তারা যদি যুদ্ধে না যান, তাহলে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন। তারা বললেন, শত্রুকে মাদীনায় প্রবেশের সুযোগ দেওয়া লজ্জাজনক হবে; বরং তারা নিজেরা বাইরে গিয়ে লড়াই করতে আগ্রহী। আল্লাহর রাস্ল ৠ্র-কে বাইরে যাওয়ার সিম্ধান্ত নেওয়ার জন্য তারা ক্রমাগত যুক্তি ও আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন বলে নবিজি ঘরের ভিতরে গেলেন যুদ্ধের সাজ নেওয়ার জন্য।

রাসূল ﷺ তাঁর মর্যাদা, তাঁর প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসা, মুগ্ধতা এবং শ্রুম্বা থেকে সহজেই তাদের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে পারতেন। কেউ তাঁর বিরোধিতা করত না; তবু তিনি বেশিরভাগের মতামত অনুযায়ী সিম্বান্ত নিলেন। সেদিন ছিল জুমাবার, রাসূল ﷺ খুতবায় যুম্বের ময়দানে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিলেন। নামাজের পর কিছু সাহাবি বুঝতে পারলেন যে, তারা সন্তবত নিজেদের মতামতের ওপর বেশি জোর দিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উন্নততর দৃষ্টিভজ্গি ও বিবেচনাবোধের বিরুম্বে সিম্বান্ত নিতে বাধ্য করেছেন। আনসারদের দুজন প্রভাবশালী নেতা সাদ ইবনু মু'আয ও উসায়েদ বিন হুদাইর ﷺ সবার পক্ষ থেকে নবিজির কাছে এই বার্তা নিয়ে গেলেন যে, তারা তাঁর ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি যেমনটি চান, তারা সবাই তা করতে আগ্রহী। আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজের ব্যক্তিগত কক্ষে ছিলেন। হামজা 🚓 তাঁর কাছে এই বার্তা নিয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল স্থ বের হয়ে এসে বললেন, একজন নবির পক্ষে বর্ম পরিধান করার পর খুলে ফেলা শোভা পায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা তাঁর এবং শত্রুর মাঝে ফায়সালা করে না দেন।

অন্যান্য শিক্ষা

১. যিনি নেতৃত্বে আছেন, তার নিজের ইচ্ছা অনুসারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। সিম্থান্ত গ্রহণে নেতাদের কঠোর হওয়া উচিত নয় এবং তার অধীনদের মতামত, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি শোনা ও গ্রহণ করার প্রস্তুতি থাকা উচিত। এ কারণে নয় যে, নেতা কী করা উচিত তা জানেন না; বরং এ কারণে যে, সিম্থান্তের সফল বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব—যখন এর সজ্যে জড়িত সকলের দৃঢ় অজ্ঞীকার থাকে। নেতা যদি তার অনুসারীদের কথা না শোনেন বা তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলো



গ্রহণ না করেন—তাহলে বিশেষ করে যাদের অজ্ঞীকারে ঘাটতি রয়েছে, তারা সিন্ধান্ত বাস্তবায়নে মনোযোগী না হওয়ার বা পুরোপুরি উপেক্ষা করার যথেষ্ট আশজ্জা থেকে যায়। অন্যদের মতামত শোনা মানেই যে সে অনুযায়ী সিন্ধান্ত গ্রহণ করা—তা নয়; বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধু তাদের কথা ধৈর্য ধরে ও মন দিয়ে শোনা উচিত, যেন তারা নিশ্চিন্ত হয় যে, নেতা সিন্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাদের ভয়, আকাজ্জা, উদ্কো ইত্যাদিকে বিবেচনায় নেবেন।

সহকারীদের কথা শোনা এবং নিজ সিম্থান্ত চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকার আরেকট কারণ হলো, অনুগতদের কাছে এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে—যা নেতার গৃহীতব্য সিম্থান্তের ফলাফলকে প্রভাবিত করবে। এই তথ্য যদি নেতার কাছে না থাকে কিংবা লোকেরা যদি 'তিনি শুনবেন না' বলে মনে করে, অথবা নেতার ব্যক্তিগত পছন্দের বিপরীত বলে নেতাকে জানাতে ভয় পায়—তাহলে নেতার সিম্থান্ত ভুল হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। যারা এই তথ্য জানত; কিন্তু নেতাকে জানায়নি, নেতার সিম্থান্তের প্রতি তাদের কমিটমেন্ট কেবল কম থাকবে তা-ই নয়, ভুল সিম্থান্তের কারণে যদি কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তবে তা ভবিষ্যতে নেতার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও সন্দেহ তৈরি করবে।

সহযোগিদের সঞ্চো পরামর্শ করা উচিত। কেননা পরামর্শের কারণে সিম্বান্তে বরকত লাভ হয় এবং সবার মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। পরামর্শের কারণে নেতা সম্ভাব্য দ্বন্দের প্রাথমিক পর্যায়েই সংকেত পান, যা দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে জটিল আকার ধারণ করে। সর্বোপরি, পরামর্শ একজন নেতাকে তার অনুসারীদের কমিটমেন্ট কতটুকু, তা পরিমাপ করতে সহায়তা করে। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল ﷺ ওয়াহি লাভ করলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা তাঁকেও শুরা বা আলোচনার পরামর্শ দিয়েছেন। এ কারণে ভুল জানা বা ভুল করার বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। শুরা সন্দেহাতীতভাবে নেতাকে উপকৃত করে; তবে এর সবচেয়ে বড় উপকার হলো এটা ঐকমত্য তৈরি করতে বড় ভূমিকা পালন করে।

আর যারা তাদের রবের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, তাদের কার্যাবলি তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। [সূরা আশ-শুরা ৪২: ৩৮]

২. একবার সিম্বান্ত হয়ে গেলে সর্বোচ্চ চেন্টা করতে হবে তা পালন করার জন্য। সিম্বান্তের পক্ষ-বিপক্ষ সকলকেই শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেন্টা চালানো উচিত। এটাই টিমওয়ার্কের সারমর্ম। দলের সদস্যরা যখন একবার তাদের মতামত প্রকাশ করে ফেলে, তারপর তাদের কর্তব্য হলো নেতার চূড়ান্ত সিম্বান্ত নিজেদের মনমতো না হলেও এর বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ়ভাবে পাশে থাকা। এটা আন্দোলনের প্রতি কমিটমেন্ট প্রকাশ করে। আন্দোলনের উদ্দেশ্যের প্রতি এই অজ্ঞীকারাবন্ধ থাকা আনুগত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। বর্তমান সময়ে আমরা নেতৃত্বের অভাব সম্পর্কে কথা বলছি; কিন্তু আমরা আনুগত্যের গুরুত্ব ভুলে গেছি। রাস্লুল্লাহ ৠ্র-এর সীরাত এবং



ব্যক্তি-পরিচালনা থেকে প্রক্রিয়া-পরিচালনায় স্থানান্তর

সাহাবিদের থেকে অসংখ্য ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যাবে, যেখানে নেতার সিন্ধান্তের সঞ্জো মতনিক্য হয়েছে এবং তারা তা প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও নেতার পাশে দ্যভাবে অবস্থান করে নেতার প্রতি তাদের অজ্ঞীকার ব্যক্ত করেছেন। এমনকি এজন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন। হুদাইবিয়ার ঘটনা, যাইদ বিন হারিসার সেনাবাহিনীকে মুতার উদ্দেশে প্রেরণের ঘটনা, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ---সবই এই আনুগত্যের উদাহরণ। আল্লাহর রাসূল 🎉 ও তাঁর খলীফা হজরত আবু বাক্র সিদ্দীক 🚕-এর সাফল্যের গোপন সূত্রও এটিই। সিম্ধান্ত গ্রহণের পর দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগা কখনোই কাম্য নয়। সংকটপূর্ণ সময়ে একাধিক মতের দোলাচলে থাকা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

৩. নেতার সংস্পর্শে যে-ই আসুক না কেন, তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। নেতার আবশ্যকীয় গুণাবলির মধ্যে একটি হলো, তার অনুসারী ও সহকর্মীদের আশ্বস্ত করা যে, তারা নেতার কাছে অবহেলিত নয়: যেকোনো প্রসঞ্জো তাদেরকে গুরুত্ব কম দেওয়া হচ্ছে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি ছিল—তিনি সাহাবিদের সঙ্গো এমনভাবে আচরণ করতেন, প্রত্যেক সাহাবিই মনে করতেন-তিনিই নবিজির সবচেয়ে কাছের মানুষ। যে ব্যক্তিই রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতেন, নবিজি সরাসরি তার দিকে ফিরে চেহারায় তাকিয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এমনকি জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময়েও তিনি এভাবে কথা বলতেন। শ্রোতাদের দিকে সরাসরি তাকাতেন, যেন তারা মনে করে তার উদ্দেশেই তিনি কথা বলছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস 🚜 একদিন রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন— হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে নিকটবর্তী কে?

আল্লাহর রাসূল 🏂 উত্তর দিলেন, আয়িশা 🚓। আবদুল্লাহ ইবনু আমর 💩 জানতে চাইলেন, আর পুরুষদের মধ্যে? রাসূল ﷺ বললেন, তার পিতা। এই উত্তর শুধু এ কারণে নয় যে, হজরত আবু বাক্র সিদ্দীক 🐗 তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী সহযোগী ও বন্ধু ছিলেন; বরং এর একটি ধর্মীয় দিকও রয়েছে, মর্যাদায় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পর খলীফা হিসেবে আবু বাক্র 🚙 অনুসরণীয়। রাসূল ﷺ-এর এই উত্তর সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে সকল সাহাবিই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতা ও পূর্ণ মনোযোগ পাওয়ার কারণে মনে করতেন—তিনিই তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী। নবিজিকে সবকিছুর ঊধ্বের্ব ভালোবাসা, তাঁর জন্য যেকোনো কিছু ত্যাগ করার ইচ্ছার পেছনে এটি অন্যতম কারণ।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ

. **u**

বৈশ্বিক আন্দোলনের দ্বিতীয় নিয়ামক হলো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ; যা এর আদর্শ প্রচার ও পালনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত তৈরি করবে। তিনটি পৃথক ভাগের সমন্বয়ে এটি তৈরি হবে।



লিডারশিপ লেসন্স

আইনবিধি

অনুমোদিত ও অননুমোদিত কাজ এবং এর সঙ্গো যুক্ত পুরস্কার ও শাস্তি বর্ণনাসম্বলিত আইন। এ আইন আবশ্যিকভাবে জীবনের সকল দিক আবৃত করবে। এতে অবশ্যই এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে—যা সকল স্থান ও সকল সময়ে উদ্ভৃত পরিস্থিতিতেও যেকোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারবে।

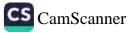
বিচারকবর্গ

যারা আইনের ব্যাখ্যা করবেন, বিধি-লঙ্ঘন, প্রশ্নের উত্তর, জটিলতা নিরসন ও স্পইতা তৈরি সংক্রান্ত কাজ করবেন। বিচারকবর্গকে একই সঙ্গো আইন বিষয়ে পণ্ডিত এবং আধুনিক বিষয়াদি ও মানুষের জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকতে হবে। কেবল তখনই তারা এমনভাবে আইনের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন, যে আইন গতান্দীর পর শতান্দী ধরে যেকোনো রকম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও প্রয়োগযোগ্য থাকবে।

নিৰ্বাহী বিভাগ

বেসামরিক প্রশাসন (সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) নিশ্চিত করবে যে, আইন অনুসরণ করা হচ্ছে। যারা এর অনুসরণ করছে, তারা সুবিধা পাবে। যারা আইনের লঙ্ঘন করছে, তারা শাস্তি পাচ্ছে। নির্বাহীগণ হলেন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাত, যারা নিশ্চিত করবেন যে, ব্যক্তিগত গোঁড়ামি যেন মূল আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে। নৈরাজ্য এবং সুেরতন্ত্রের মধ্যবর্তী পথ নিশ্চিতের জন্য নির্বাহীদের মধ্যে অবশ্যই চূড়ান্ত সততা, প্রজ্ঞা, কূটনীতি ও দৃঢ়তা থাকতে হবে। নৈরাজ্য এবং সুৈরতন্ত্র—এই দুটি বিষয় মূল আদর্শের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নন্ট করে দেয়।

মাদীনায় আল্লাহর রাস্ল ﷺ-এর বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বহুত্বাদী ও বহু ধর্মের একটি রাফ্টে ইসলামিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। হিজরাতের সময় মাদীনায় দুটি বড় গোত্র ছিল আওস ও খাজরায। এই দুই গোত্রেই মুসলমান ও মুশরিক সদস্য ছিল। এছাড়া আল্লাহর রাস্ল ﷺ-এর সঙ্গো যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মাক্বা ও অন্যান্য জায়গা থেকে আগত মুহাজির ও মুসলমানরা ছিলেন। তিনটি বড় ইয়াহুদি গোত্র ছিল—বনু নাযির, বনু কুরাইযা ও বনু কায়নুকা। এছাড়াও ছিল বিবিধ গোত্রের লোকজন, যেখানে মুসলমান এবং মুশরিক উভয়েই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণে এমন আইন প্রণয়নের দরকার ছিল, যা সকলের অধিকার সমুন্নত রাখবে এবং সকলের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। রাসূল ﷺ সম্ভবত তৎকালীন সময়ে রাস্ট্রের প্রথম সংবিধান তৈরি করেছিলেন।



চুক্তি

রাসূল ﷺ মুহাজির এবং মাদীনার অধিবাসীদের মধ্যে একটি চুক্তি করে দিলেন। এর মধ্যে মুসলমানগণ এবং মাদীনায় বসবাসরত ইয়াহুদিগণও ছিল। দুপক্ষই এ চুক্তিতে আবম্ব ছিল এবং এ চুক্তি লঙ্ঘন করার দরুন শেষ পর্যন্ত ইয়াহুদিরা মাদীনা থেকে বিতাড়িত হয়। এ চুন্তিকে রাসূল ﷺ-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক রাষ্ট্রের সংবিধান বলা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের দলিল এটিই প্রথম—যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস যাই হোক না কেন—সকল মানুষকে সমান নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল। যত কিছুই বলা হোক না কেন, একটি ধর্মের নেতার জন্য এরকম একটি দলিলের লেখক হওয়া বিশ্বায়কর। এটা সত্যি যে, ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম ছিল না; কারণ এটি পৃথিবীতে মানুষের (তার আগে জিনদেরও) শুরু থেকে সকল নবিরই ধর্ম ছিল; কিন্তু তৎকালীন লোকদের কাছে এটি নতুনই ছিল এবং মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। আর তিনিই কিনা সকলের জন্য সমান নাগরিক অধিকার প্রস্তাব করছেন—হোক তারা তাঁর ধর্মের অনুসারী কিংবা না...।

মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে চুক্তি

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ চুক্তি উদ্মি নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে, কুরাইশ ও ইয়াসরিবের বিশ্বাসী মুসলমান ও তাদের অনুসারীগণ, মিত্র ও সমর্থকদের মধ্যে, সকল কিছুর উধ্বের একটি একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য।

শনবকদের মধ্যে, পদতা নির্দ্ধন তর্তমান প্রথা মেনে চলবে এবং নিজেদের মধ্যে রক্তপণ চুক্তি মাক্কার অভিবাসীগণ তাদের বর্তমান প্রথা মেনে চলবে এবং নিজেদের মধ্যে রক্তপণ চুক্তি পালন করবে। তাদের দুর্বলতর সদস্যদের প্রতি দয়া ও ন্যায়বিচার করবে। বনু আওফ তাদের বর্তমান প্রথা চালু রাখবে, তাদের পূর্বেকার রক্তপণ চুক্তি পালন করবে এবং সকল বিশ্বাসীদের মধ্যে তাদের দুর্বলতর সদস্যদেরকে দয়া ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করবে। সকল বিশ্বাসীদের মধ্যে তাদের দুর্বলতর সদস্যদেরকে দয়া ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করবে।

সকল বিশ্বাসাদের মধ্যে তাদের দুর্বন্তর নানেচনের নির্মানের কথা উল্লেখ করেন।) (এরপর তিনি তাদের আনসার ও অন্যান্য সকল পরিবারের কথা উল্লেখ করেন।) বিশ্বাসীগণ তাদের নিজেদের সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে: ঋণ, মুক্তিপণ বা রক্তপণ

পরিশোধ করবে। কোনো মুমিন (দাস) অন্য কোনো মু'মিনের সঞ্চো তার মুনিবের অনুমতি ব্যতীত চুক্তিবন্ধ হবে না। ধর্মনিষ্ঠ বিশ্বাসীগণ তাদের নিজেদের কেউ যদি অনিন্টের চর্চা করে বা ফুক্তি, পাপ, আগ্রাসন ও দুর্নীতি করতে চায়, তবে তা প্রতিহত করবে। তারা নিকটজন ১৫৭



হলেও বিশ্বাসীগণ একত্রিত হয়ে প্রতিহত করবে। কোনো মুমিন কোনো কাফিরের বদলায় কোনো মুমিনকে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফিরকে মু'মিনের বিরুদ্ধে সহায়তা করবে না। মু'মিনরা অন্য সকল মানুষের বিপরীতে নিজেরা একে অপরের মিত্র। ইয়াহুদিদের মধ্যে যারা আমাদের অনুগামী হবে, তারা সাহায্য ও সমতা পাবে। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না, তাদের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে সাহায্যও করা হবে না। আল্লাহর পথের যুদ্ধে মুমিনরা অন্য মুমিনদের বাইরে রেখে কোনো সন্ধিতে আবন্ধ হবে না। তাদের মধ্যে অবশ্যই সমতা ও ন্যায়বিচার বজায় থাকবে। আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে পরস্পরকে সাহায্য করবে। নিষ্ঠাবান বিশ্বাসীগণ শুম্বতম ও সুন্দরতম আচরণে প্রতিষ্ঠিত।

কুরাইশদের মুশরিক ব্যক্তি বা তাদের সম্পত্তিকে সুরক্ষা প্রদান করা যাবে না। যার সম্পর্কে নিরপরাধ বিশ্বাসীকে জেনে বুঝে হত্যা করা প্রমাণিত হয়, তাকে ওই কারণে হত্যা করা হবে—যদি না নিহতের সুজনরা রক্তপন পেয়ে সন্তুন্ট হয়। বিশ্বাসীরা একত্রিত হয়ে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যে মুমিন এই দলিল গ্রহণ করেছে এবং আলাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, তার জন্য বৈধ নয় কোনো দুম্কৃতিকারীকে সাহায্য করা বা আশ্রয় দেওয়া। বিশ্বাসীদের যে এমনটি করবে, তার ওপর কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর গযব ও লা'নত পতিত হবে। তার নিকট থেকে না তাওবা কবুল করা হবে, না ফিদ্ইয়া। কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের মাঝে মতভেদ হয়, তবে অবশ্যই তা আল্লাহ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমীপে উপস্থাপন করবে।

যুন্ধের সময় মিত্র ইয়াহুদি ও মুসলিমরা প্রত্যেকে তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বহন করবে। বনু আউফের ইয়াহুদিরা মুমিনদের সঙ্গে একই দলভুক্ত—ইয়াহুদিদের জন্য ইয়াহুদিদের ধর্ম, মুসলিমদের জন্য মুসলিমদের ধর্ম। এটি তাদের মুক্তদাস ও নিজেদের জন্য প্রযোজ্য; তবে যে জুলুম করে ও পাপ করে—তার জন্য নয়। সে তো কেবল নিজেকে ও পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বনু আওফের জন্য যা প্রযোজ্য—তা বনু নাজ্জার, বনু হারিস, বনু সা'দ, বনু জুসান, বনু আওস, বনু ছালাবা, জুফনা ও বনু সুতাইবার জন্যও প্রযোজ্য হবে। ইয়াহুদিদের নিকটতম সহযোগীরাও তাদের একজন হিসেবে গণ্য হবে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত কেউ কোনো যুদ্ধে জড়াতে পারবে না; তবে আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণে তাকে বাধা দেওয়া হবে না।

পরিবারকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছাড়া কেউ কারও ওপর আক্রমণ করবে না। আল্লাহ এ ধরনের কাজের নিন্দা করেন। যারা এই চুক্তি গ্রহণ করেছে, তাদের সজ্জা যারা যুম্থ করে, তাদের বিরুম্থে প্রত্যেকে একে অপরকে অবশ্যই সহায়তা করবে। তারা অবশ্যই একে অপরকে উত্তম পরামর্শ দেবে, ভালো করবে এবং মন্দ পরিহার করবে। একজন ব্যক্তিকে তার মিত্রের পরিবর্তে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। যারা ভুল করেছে, তাদেরকে সহায়তা করা উচিত।

যারা এ চুক্তিতে সম্মত হয়েছে, তাদের জন্য ইয়াসরিব নিরাপদ আশ্রয়ম্থল। একজনের প্রতিবেশীকে কোনো ক্ষতি বা অন্যায় না করে নিজের মতো একজন হিসেবে ভাবতে হবে।





ছন্তি

কোনো সম্পত্তির মালিকের অনুমতি ব্যতীত সেখানে প্রবেশ করা হবে না। যারা এ চুক্তির সঙ্গে একমত, তাদের মধ্যে যেকোনো বিবাদ বা ঘটনার ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্যই আল্লাহ ও মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করা হবে। এই দলিলে যা কিছু ভালো এবং পবিত্র আল্লাহ তার স্বীকৃতি দান করেছেন।

কুরাইশ এবং তাদের সহায়তাকারীগণ কোনো আশ্রয় পাবে না। এ চুক্তিতে সম্মত সবাই ইয়াসরিবের বিরুম্থে যেকোনো আক্রমণের বিরুদ্ধে একে অপরকে অবশ্যই সহায়তা করবে। যদি তাদেরকে শান্তি স্থাপনে আহ্বান জানানো হয়, আর তারা তা গ্রহণ করে এবং বজায় রাখে—তাহলে তারা শান্তিতে থাকবে। যদি তারা একই রকম (কোনো যুম্ধের দিকে আহ্বান) করে, তাহলে সম্মত হওয়া না হওয়া মুসলমানদের ওপর নির্ভর করবে। যদি যুম্ধটি কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে না হয়।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী যুম্ধলম্ব সম্পদ থেকে তার জন্য বরাদ্দকৃত অংশ পাবে।

পাপী বা অন্যায়কারী কাউকে এই চুক্তিপত্র নিরাপত্তা প্রদান করবে না। যারা যুদ্ধে যাবে, তারা নিরাপদে থাকবে এবং যারা শহরে থাকবে, তারাও নিরাপদে থাকবে। কেবল যারা পাপ বা অন্যায় করেছে, (তারা নয়)। আল্লাহ তা আলা ভালো এবং ধার্মিকদের নিরাপত্তা দেন।

চুন্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ

১. আইনপ্রণেতাই নেতা। আল্লাহর রাসূল ﷺ পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি দলিল প্রস্তুত করলেন, এর মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি বিচারক হলেন। সকল মতানৈক্য অবশ্যই আল্লাহ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হবে। একমাত্র উচ্চারিত নামটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর। এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলার সঞ্চো আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সম্পর্ক পরিক্ষারভাবে সংজ্ঞায়িত হলো এবং এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত হলো যে, রাসূল ﷺ-এর কর্তৃত্ব আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে এসেছে এবং আল্লাহর শাসনই এখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

২. মুসলিম উন্মাহ একটি একক গোষ্ঠী। মুসলমানদের সৃতন্ত্র পরিচয় এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৩. ইয়াহুদিদের অংশিদারিত্ব ছিল, নিজেদের ধর্ম পালন করার অনুমতি ছিল এবং তারা মুসলমানদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তাদেরকে মুসলমানদের সহায়তা ও পরামর্শ দিতে হতো। মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত কেউ মাদীনা ত্যাগ করতে পারত না, যেভাবে বর্তমানকালে পাসপোর্ট ছাড়া কেউ দেশ ত্যাগ করতে পারে না।

 মাদীনাকে আল-হারাম ঘোষণার মাধ্যমে ইয়াসরিবের কেন্দ্রকে একটি পবিত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে ঘোষণা করা হলো, যেখানে শিকার, গাছ কাটা বা মারামারি নিষিন্ধ।



শিক্ষা

নতুন পরিস্থিতিতে নেতার জন্য নিজের অবস্থান সুসংহত করা গুরুত্বপূর্ণ। সকলের জন্য নিরপেক্ষ আইন প্রণয়ন করা ও নেতাকে মধ্যস্থতাকারী বানানোর মাধ্যমে কোনো গোষ্ঠীর দৃষ্টি ব্যক্তিকেন্দ্রিক থেকে প্রক্রিয়াকেন্দ্রিকের দিকে স্থানান্ডরিত করতে সহায়তা করে। ফলে মানুষ ব্যক্তি নয়, আইন ও ব্যবস্থার অনুগামী হয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সব মানুষই একদিন নিঃশেষ হবে; কিন্তু আইনব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বলবৎ থাকে। যে নেতা তার বার্তাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে চায়, তার জন্য এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। মুহান্মাদ ﷺ-এর নেতৃত্বের সফলতা কেবল জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবিদের মধ্যে জনপ্রিয়তার কারণে নয়; বরং এমন প্রক্রিয়া তিনি চালু করে গিয়েছেন, সে বহতায় বিগত ১৪০০ বছর ধরে শত নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁর বার্তা বিশ্বের দরবারে প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে।

আইনী ব্যবস্থা প্রণয়নের আরেকটি উপকারিতা হলো—যারা রাসূল ﷺ-এর চেইন অব কমান্ডকে সফল করবে, ভবিয্যত প্রজন্মের যারা তাঁর আনীত দীনের অনুসরণ করবে—তাদের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করা। আবু বাক্র ঊ-এর খিলাফাতকালে এর ফলাফল প্রথম স্পন্টভাবে টের পাওয়া গেল। তিনি তার উদ্বোধনী বস্তৃতায় বললেন—হে লোকসকল, আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করি, ততক্ষণ আমার আনুগত্য করো। আর আমাকে শুধরিয়ে দিয়ো—যদি আমি সেখান থেকে বিচ্যুত হই। তিনি নিজের এবং মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে দেওয়া অজ্ঞীকার—আইনের প্রতিনিধি যেই হোক না কেন, তার অনুসরণ করা—নবায়ন করে নিলেন। এই কথার মাধ্যমে তিনি এটাও পুনর্ব্যক্ত করলেন যে, যিনি আইনের প্রতিনিধি, তিনিও একই আইনের আওতায় আছেন, বাইরে নয়। পৃথিবীতে এটা এক অদ্বিতীয় উদাহরণ। কারণ ধরেই নেওয়া হতো যে, রাজাদের বিশেষ অধিকার রয়েছে এবং তারা সকল আইনের উর্ধ্বে। সুয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবি, মুহাম্মাদ ﷺ নিজেকেও এ আইনের অধীন হিসেবে ঘোষণা করলেন। একটি আইন প্রবর্তন করে নিজেই সে আইনের অধীন হয়ে গেলেন। উর্ধ্বে থাকার কল্পনাও করলেন না! আইনের শাসনের এটাই সত্যিকারের অর্থ, যা সভ্য সমাজকে সামন্তবাদ বা মানুযের শাসন থেকে পৃথক করেছে।

তহবিল

বিষয়টি হয়তো এখানে উপস্থাপন করা যথার্থ হবে না; কিন্তু একটি প্রবাদের কথাও মনে পড়ছে—অর্থ দুনিয়াকে পরিচালনা করে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নিজ ক্ষমতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য থেকে আমাদেরকে দান করেন; তবে এর জন্য আমাদের অবশ্যই জাগতিক সকল উপায়-উপকরণকে কাজে লাগিয়ে প্রচেন্টা চালাতে হবে। রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেখানে দেখা যায়, তিনি সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, সব ধরনের জাগতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন এবং সকল শারীরিক প্রচেন্টা চালিয়েছেন। তারপর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন, দু'আ করেছেন। কী পরিমাণ উপার্জন করা





চুক্তি

যাবে, ইসলাম সে ব্যাপারে কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি বটে, কী উপায়ে এ অর্থ উপার্জন করা যাবে—তা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করেছে। কী উপায়ে সম্পদ আহরিত হয়েছে এবং কোন পথে এর ব্যয় হয়েছে, তা ইসলামের বিবেচনার বিষয়, সম্পদের পরিমাণ কতটুকু তা নয়।

ইসলাম বলে, সম্পদ আহরণ করতে হবে বৈধ উপায়ে, কোনো প্রকার ছলচাতুরীর আশ্রয় ব্যতিরেকে, সুদবিহীন পন্থায়, শ্রমিক ও সমাজকে শোষণ না করে। ইসলাম অন্যের ক্ষতি না করার মাধ্যমে সম্পদ আহরণে জোর দেয়। এ কারণে নিত্য প্রয়োজনীয়; বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের মজুদ নিষিম্ব করেছে। ইসলাম চায়, সম্পদ সমাজের কল্যাণে ব্যয় হবে। এ কারণে দান (যাকাত, ফিতরা) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং প্রয়োজন পূর্ণ করার পর অতিরিস্ত সম্পদ থেকে দান করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল <u>স্</u> কখনোই কাউকে ব্যবসা করা থেকে বিরত করেননি; বরং বলেছেন—আল্লাহ ব্যবসার মধ্যে বরকতের দশ ভাগের নয় ভাগ রেখেছেন। এক ঘটনায়, জিনিসপত্রের দাম যখন খুব বেশি ছিল, আল্লাহর রাসূল <u>স্ট</u> তখন দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ আরোপে আপত্তি করলেন। লোকদেরকে সমাজের সকল ধরনের মানুষের প্রতি সুবিচার করার জন্য উৎসাহিত করলেন। ইসলাম আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতাভিত্তিক সামাজিক দায়বন্ধ্বতা সম্বলিত ফ্রি-এন্টার প্রাইজ নীতি অনুসরণ করে এবং আখিরাতে চূড়ান্ত ফলের প্রত্যাশা করে।

এ নীতি মাথায় রেখে আমাদের পরামর্শ হলো, যেকোনো বৈশ্বিক আন্দোলন সফল হতে হলে কেন্দ্রীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি থাকতে হবে। এতে আন্দোলনের মূল আদর্শের সঙ্গো সামঞ্জস্য বজায় রেখে তহবিল সংগ্রহের একটি কাঠামো থাকবে। তববিল আদায়ের পদ্ধতি থাকবে এবং তহবিল আদায় ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো থাকবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য এবং মূল ভাবাদর্শের মধ্যে সন্নিহিত পরিশোধব্যবস্থা উভয়ই বিদ্যমান থাকা জরুরি; যেন বিশ্বাসী অনুসারীগণ সুয়ংক্রিয়ভাবেই আদর্শের প্রতি অর্থনৈতিক সমর্থন প্রদান করতে শুরু করে। এর মাধ্যমে আন্দোলনেও বার্ষিক ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিলের পরিমাণ নিশ্চিত করা যায়, যা নীতিমালা অনুযায়ী আন্দোলনের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে। আমাদের যুক্তি হলো, এ তিন উপকরণের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান ব্যতিরেকে কোনো আন্দোলন বৈশ্বিক রূপ লাভ করতে পারে না বা সময়ের ব্যবধানে টিকে থাকতে পারে না।

সফলতা ও ব্যর্থতার ঐতিহাসিক উদাহরণ

এই মডেল বিভিন্ন বৈশ্বিক আন্দোলনে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—সংক্ষেপে এর কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

ক্যাথলিক চার্চ

ক্যাথলিক চার্চ তার পূর্ণ বিকাশকালীন সময়ে ইউরোপ ও নতুন দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করত। পোপ ছিলেন সর্বেসর্বা। অনুগতদের মাঝে সম্পদ বিতরণ করতেন, অবাধ্যদের বহিম্কার করতেন, রাজাসহ অন্যান্যদের বিরুম্বে তদন্তের নির্দেশ দিতেন। খ্রিস্টবাদ



লিডারশিপ লেসনস

প্রচারের নামে দক্ষিণ আমেরিকার সভ্যতাকে ধ্বংসের ও আফ্রিকার কালো দাস কেনা-বেচার অনুমতি দিতেন। ক্রুসেড শুরু করতেন ও হত্যার বৈধতা দিতেন, মানুষ কীভারে জীবনযাপন করবে—সে ব্যাপারেও সিম্ধান্ত দিতেন। ক্যাথলিক বিশ্বাসীরা তাদের আয়ের এক দশমাংস খাজনার্বুপে চার্চকে দিতেন এবং ভ্যাটিকান ও তার পোপ অবিশ্বাস্যরকম এক দশমাংস খাজনার্বুপে চার্চকে দিতেন এবং ভ্যাটিকান ও তার পোপ অবিশ্বাস্যরকম এক দশমাংস খাজনার্বুপে চার্চকে দিতেন এবং ভ্যাটিকান ও তার পোপ অবিশ্বাস্যরকম এক দশমাংস খাজনার্বুপে চার্চকে দিতেন এবং ভ্যাটিকান ও তার পোপ অবিশ্বাস্যরকম এক দশমাংস খাজনার্বুপে চার্চকে দিতেন এবং ভ্যাটিকান ও তার পোপ অবিশ্বাস্যরকম এক দশমাংস খাজনার্বুপে চার্চকে দিতেন এবং ভ্যাটিকান ও তার পোপ অবিশ্বাস্যরকম এক দশমাংস খাজনার্বুপে চার্চকে দিতেন এবং জ্যাটিকান ও তার পোপ অবিশ্বাস্যরকম ও হিংল্যান্ডের চার্চ, যার প্রটেস্ট্যান্টবাদ (জার্মানিতে শুরু—মার্টিন লুথার), অ্যাংলিকানিজম ভাতৃত্বের বাণী নিয়ে), কমিউনিজম (জার্মানির কার্ল মার্ক্স) এবং বিজ্ঞানের নামে সাধারণ ভাতৃত্বের বাণী নিয়ে), কমিউনিজম (জার্মানির ফার্ল সার্জ্য) প্রাণ।

নাতিবিদ্যালয় বা সংস্কার সম্পর্কে উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে: প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কার রিফর্মেশন বা সংস্কার সম্পর্কে উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে: প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কার হলো ১৭ শতকে পশ্চিম ইউরোপের ক্যাথলিক চার্চসমূহের সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলন প্রটেস্ট্যান্ট বিপ্লব বা প্রটেস্ট্যান্ট বিদ্রোহ নামেও পরিচিত। মার্টিন লুথার কর্তৃক আন্দোলন প্রটেস্ট্যান্ট বিপ্লব বা প্রটেস্ট্যান্ট বিদ্রোহ নামেও পরিচিত। মার্টিন লুথার কর্তৃক অসংযমের ৯৫টি অনুশীলন সংক্রান্ত নিবন্ধের মাধ্যমে শুরু হয়। বলা হয়, ১৫১৭ সালের অসংযমের ৯৫টি অনুশীলন সংক্রান্ত নিবন্ধের মাধ্যমে শুরু হয়। বলা হয়, ১৫১৭ সালের অসংযমের তিনি এই আপত্তিগুলো জার্মানির উইটেনবার্গের ক্যাসল চার্চে পোস্ট ০১ অক্টোবরে তিনি এই আপত্তিগুলো জার্মানির উইটেনবার্গের ক্যাসল চার্চে পোস্ট ০১ অক্টোবরে তিনি এই আপত্তিগুলো জার্মানির উইটেনবার্গের ক্যাসল চার্চে পোস্ট এবিন্ডান হাণিনের হিনিভার্সিটি কমিউনিটিকে নোটিশ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হতো। করেন, যা সাধারণত ইউনিভার্সিটি কমিউনিটিকে নোটিশ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হতো। করেন, যা সাধারণত ইউনিভার্সিটি কমিউনিটিকে নোটিশ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হতো। করেন, যা সাধারণত ইউনিভার্সিটি কমিউনিটিকে নোটিশ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হরো। এ সংস্কার থেকে সরাসরি চারটি থারার উৎপত্তি হয়েছে। এগুলো হলো—লুথারিয়ান ট্রাডিশন, রিফর্মড/ক্যালভিনিস্ট/ থারার উৎপত্তি হয়েছে। এগুলো হলো—লুথারিয়ান ট্রাডিশন, রিফর্মড/ক্যালভিনিস্ট/ প্রেস্বাইটেরিয়ান ট্র্যাডিশন, আনাব্যাশ্টিস্ট ট্রাডিশন এবং অ্যাংলিকান ট্রাডিশন পরবর্তী প্রটেস্ট্যান্ট ধারাগুলোর মূল এই চারটি ধারায় মিশেছে। এ থেকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে ক্যাথলিক বা কাউন্টার রিফর্মেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন রক্ষের নতুন আধ্যাত্মিক আন্দোলন, ধর্মীয় কমিউনিটির সংস্কার, সেমিনারি প্রতিষ্ঠা, ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং চার্চের কাঠামোগত পরিবর্তন ইত্যাদির ইত্যাদির সূত্রপাত ঘটে।

ক্যাথলিক চার্চের আয় ও ক্ষমতা ধর্মীয় ও প্রশাসনিক উভয় ক্ষেত্রেই বহুলাংশে কমে গিয়েছিল। এখন ক্যাথলিক চার্চ ও এর ক্ষমতা ভ্যাটিকানের দেওয়ালের মধ্যে সীমাবন্ধ হয়ে পড়েছে। এর প্রভাব কেবল ক্যাথলিকদের মধ্যে সীমাবন্ধ এবং ইউরোপে তারা নামেমাত্র ধার্মিক। ইউরোপীয় গির্জাগুলোতে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মে বিশ্বাসীদের তুলনায় অনেক বেশি পর্যটক যাতায়াত করে। ইউরোপ আর আমেরিকার চার্চগুলো শূন্য থেকে শূন্যতর হয়ে যাচ্ছে। ক্যাথলিকতাবাদ আর খ্রিস্টবাদের পতনের সর্বশেষ চিহ্ন হলো—তাদের অনেকগুলো চার্চ অন্য ধর্মীয় দলের নিকট উপাসনালয় নির্মাণের জন্য বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের ওপর আক্রমণ আর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুম্বে যুন্দ্ব হলো চার্চ কর্তৃক খ্রিস্টবাদকে জাগিয়ে তোলার সর্বশেষ প্রচেন্টা।

এই মডেলের কার্যকারিতার আরও উদাহরণ ইসমাইলি শিয়ারা। তারা তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। এদের কেন্দ্রীয় নেতারাও ঐশ্বরিক অনুমোদন ও সমর্থনের দাবি করে। তাদের একটি তহবিল ব্যবস্থা আছে (প্রত্যেক ইসমাইলি/ বোহরা তাদের আয়ের ১২.৫% নেতাকে চাঁদা দেয় এবং এই অর্থ থেকে তাদের





চুক্তি

নেতা প্রশ্নাতীতভাবে ব্যয় করতে পারে), যা কঠোরভাবে পালন করা হয়। এর বাইরে ইসমাইলি/বোহরাদেরকে তাদের গোত্রের মধ্যে টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানান রীতিনীতি, উৎসব উদ্যাপন উপলক্ষে আবশ্যিকভাবে সম্পূরক দান করতে হয়। এটা সত্য যে, এ অর্থ এ সকল কমিউনিটির নেতাদেরকে পৃথিবীর বিলিয়নিয়ারদের একজন বানিয়েছে, তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন শিক্ষাগত, সামাজিক ফাউন্ডেশন ও ট্রাস্টের মাধ্যমে তাদের লোকদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়।

ওপরের উদাহরণগুলোতে আমরা যেমন দেখেছি, বৈশ্বিক আন্দোলনের সকল উপাদান যতক্ষণ পর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করবে, আন্দোলনে শক্তি ও অগ্রগতি থাকবে। উপাদানগুলোর কোনোটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেলে বা ঠিকমতো কাজ না করলে আন্দোলন তার নিজস্ব গতি হারায়; এমনকি সম্পূর্ণ বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

ইসলামের বৈশ্বিক আন্দোলনের মডেল

মূল ভাবাদর্শ

ইসলাম এমন একটি আদর্শ উপস্থাপন করেছে—যা ন্যায়বিচার, সামাজিক দায়বন্ধতা ও সকল প্রকার জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াকে সমুচ্চে তুলে ধরে। আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে বাস্তব কর্ম ও জীবনাচারে রূপান্তরিত করায় এটি একটি সামাজিক মডেলে রূপ নিয়েছে। ইসলামে কেবল আল্লাহর একাত্মবাদ ও মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল— এটুকু বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত বিশ্বাসী কিনা তা প্রমাণের জন্য অবশ্য পালনীয় সুনির্দিন্ট কর্মকাণ্ডের সুস্পন্ট নির্দেশনাও রয়েছে। এর প্রথমটি হলো সালাত, দ্বিতীয় যেটি একই সজ্ঞো উচ্চারিত হয়, তা হলো যাকাত। যাকাত শরী আহ নির্দেশিত শর্তানুযায়ী প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমান কর্তৃক কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা করা বাধ্যতামূলক দান। মজার ব্যাপার হলো, ইসলামের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করলে সুপ্পন্টভাবে বোঝা যায়, ইসলামের সকল প্রকার বিরোধিতার শেকড়-এর কেন্দ্রীয় আদর্শ নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের নিয়মনীতি অনুসরণের অনিচ্ছার কারণেই মূলত বিরোধিতা ছিল। এর প্রায় সবগুলোই ছিল সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্র সম্পর্কীয়। এই ধারা আজও চলমান। আধুনিক যুগের মুসলমানগণসহ যারা ইসলাম পালনে অসুবিধা বোধ করছে, তাদের উচিত ব্যক্তিগত বাসনার দিকে দৃষ্টিপাত করে নিজেদের অনাগ্রহ বা বিরোধিতার আসল কারণ চিহ্নিত করা। আধ্যাত্মিক যুক্তি নয়, প্রকৃত সত্য হলো ইসলাম কেবল বুম্ধিবৃত্তিক প্রকৃতির ধর্ম নয়; বরং কাজের মাধ্যমেই এটি সুসংহত হয়। ইসলাম বলতে যদি শুধু আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাস করলেই হতো, তাহলে রাসূল ﷺ-এর কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত।

একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, মাক্কার কাফির নেতৃবৃন্দ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, তারা একদিন আল্লাহর ইবাদাত করতে প্রস্তুত আছে, যদি মুহাম্মাদ ﷺ পরের দিন তাদের দেবদেবীর পূজা করেন। আজকের দুনিয়ায় একে খুবই 'যৌক্তিক প্রস্তাব' মনে হতে পারে। কেউ যদি এরকম যৌক্তিক প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তাকে 'চরমপশ্থি'



লিডারশিপ নেসনস

বা 'গোঁড়াপন্থি' আখ্যা দেওয়া হয়। যাহোক, রাসূল ﷺ এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কারণ, এ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে দীনের পূর্ণ দর্শন যা দাবি করে—এটি সুয়ং আল্লাহ তা আলার কাছ থেকে এসেছে, এ ধর্ম বহু-ঈশ্বরবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং রাসূল ﷺ-এর প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছেন-মর্মে ধর্মের মূল সংযোগ ভিত্তিহীন হয়ে যায়। নেতাকে এ ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, যত কঠিনই হোক না কেন, কোনো যুক্তির পক্ষে নির্লিপ্ত থেকে বিরত থাকতে হয়। অন্যথায় অন্যদের থেকে আলাদা হওয়ার পথ থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ

ইসলাম 'সাংবিধানিক শাসক'—খলীফার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, যিনি আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন করেন। যে বিধানের অধীনে তিনি তার তত্ত্বাবধানে থাকা নাগরিকদের সর্বনিম্ন হিসাবের ব্যাপারেও দায়বন্ধ। খলীফা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি, যিনি ধর্মজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। ইসলামের ইতিহাসে খিলাফাতু রাশিদার খলীফাগণ তাদের সহকর্মীদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। কারণ তারা তাদের প্রতি উঁচু শ্রুম্ধাবোধ থেকে আনুগত্য করতে রাজি ছিলেন। এর দৃষ্টান্ত বিভিন্ন ঘটনা থেকেও দেখা যায়—যেখানে সাধারণ জনগণ তাদের খলীফার সঙ্গো একমত নন এবং নির্দ্বিধায় তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেছেন, সরাসরি খলীফাকে প্রশ্ন করেছেন। সুতরাং তাদের আনুগত্য আদর্শের অধীনে ছিল।

তহবিল

ইসলাম আইন করেছে, সঞ্জয়ের সর্বনিম্ন ২.৫ % অবশ্যই রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সাধারণ তহবিলে জমা করতে হবে; যা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। এর উদ্দেশ্য দুটি: একটি হলো অর্থনীতির মধ্যে অর্থ সঞ্জালন কার্যকর করা। এ কারণেই যাকাত কেবল সঞ্চিত অর্থের ওপরই নয়, স্বর্ণ ও রূপাতেও প্রদেয়; কারণ এগুলো যে কারও কাছেই সঞ্চিত অর্থ সংরক্ষণের সবচেয়ে সাধারণ উপায়। একইভাবে ফসল: ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মজুদকৃত পণ্য, ব্যবসার উদ্দেশ্যে কেনা জমির ওপর জাকাত প্রদেয়। এ সবকিছু নিশ্চিত করে যে, ধনী ব্যক্তিরা অর্থকে সঞ্চালনের বাইরে নিতে পারে না এবং একটি

যাকাতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী সেগুলো কাজে লাগানোর জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিল দেওয়া। যাকাত উন্নয়নের অর্থায়নের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। যদি মুসলমানরা ঠিকঠাকভাবে যাকাত আদায় করে, সম্পূর্ণ পরিমাণ ও সাধারণ তহবিলে প্রদান করে; তবে বিশ্বে কেবল একজন দরিদ্র মুসলমানই থাকবে না তা নয়; বরং মুসলমানরা সারা বিশ্বের অন্যান্য বঞ্চিত মানুষের সামাজিক উন্নয়ন করতেও সক্ষম হবে। এটি দাওয়াহর সবচেয়ে শক্তিশালী পম্বতি হতো—যা যাকাতেরও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ওপরের সমস্ত উদাহরণ থেকে আমরা যেমন দেখেছি—যতক্ষণ পর্যস্ত বিশ্বব্যাপী





আন্দোলনের তিনটি উপাদান একত্রে কাজ করে, আন্দোলনে শক্তি ও অগ্রগতি থাকে। _{যখন এক} বা একাধিক উপাদান ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায় বা কাজ করা বন্ধ করে দেয়, আন্দোলন তার গতি হারায়; এমনকি পুরোপুরি বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

ইসলামিক মডেলে ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহ

ইতিহাস তার গতিপ্রবাহকে নিজেই সংস্কার করে নেয়, এমন কাউকেই রেহাই দেয় না। মুসলমানদেরও দেয়নি। মুসলমানরা যেহেতু বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের মডেলটির বিশুম্বতা পরিবর্তন করেছিল, তাই তাদের ভাগ্যও প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব তার বৈশ্বিক প্রকৃতি হারাতে থাকে এবং প্রকৃত পর্যবেক্ষণযোগ্য সত্যের চেয়ে তাদের উপস্থিতি ইতিহাসের বইগুলোতে বেশি দেখা যেতে শুরু করে। বেদনাদায়ক হলেও ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা পরীক্ষা করে দেখা উচিত, যেগুলো বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করেছিল।

আদর্শ

যেহেতু ইসলাম সময়ের সঞ্জো সঞ্জো আরব উপদ্বীপ থেকে এবং রাসূলুল্লাহর সময় থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছে, মিশর, সিরিয়া, ইরান, ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। ফলে এসব অঞ্চলের নবাগত মুসলিমরা কপটিক খ্রিস্টান, গ্রিক, রোমান দর্শন, পৌরাণিক কাহিনি, জরথুস্ট্রবাদ ও হিন্দুধর্ম থেকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত হয়। তাওহিদি আদর্শের পবিত্রতা—অংশীদার ও মধ্যস্থতাকারী ব্যতিরেকে আল্লাহর একতৃ, স্রন্টা ও বান্দার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক—অংশীদারি বিভিন্ন তত্ত্ব দ্বারা নানানভাবে ঢাকা পড়ে। মানুষের দুর্বলতা, ভয় ও অলসতার সুযোগে নতুন নতুন দার্শনিক তত্ত্ব ভূমিকা পালন করতে থাকে। তারাও মানুষকে পরকালের মুক্তি ও জানাত লাভের কথা বলে। মানুষের এ ব্যাপারে যে জ্ঞান থাকা উচিত ছিল, তা না থাকায় তারা প্রশ্ন করেনি—কোন ক্ষমতাবলে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে? মানুষ এ প্রতিশ্রুতিগুলো বিশ্বাস করেছে এবং এ মিথ্যা সুরক্ষা যারা প্রদান করেছে, তাদেরকে বিনিময়ে অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি দান করেছে।

তাওহিদের অনন্য পরিচয়টি যেমন কলুষিত হয়েছে, তেমনিভাবে ইসলাম তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও হারিয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানরা তাদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিতে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্যদের সজ্জে সাদৃশ্যযুক্ত হতে থাকে। তারা মরুভূমির বায়ুর মতো পরিম্কার ও খাঁটি আদর্শের বাহক হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। অথচ এই মরুর বায়ুই ইসলামের গৌরবের প্রথম সাক্ষী। এ আধুনিককালে নানান চক্রাবর্তের পিন্টনে বনের অন্ধকার জলাভূমির মতো ঘোলা হয়ে উঠেছে, যার নিচের অংশ গাছপালা ও জলকাদায় পরিপূর্ণ এবং পানি এত ধীরে বয় যে, একটি শুকনো পাতাকেও নড়াতে সক্ষম হয় না।

মানুষ যখন ইসলামের স্নাতন্ত্র্য দেখা বন্ধ করে দিয়েছে, তখন এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও কমে গেছে। তারা যা দেখছে, তা তাদের বিকৃত বিশ্বাস ও রেওয়াজ থেকে খুব আলাদা



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft লিডারশিপ লেমন্স

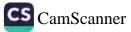
না। ফলে সমস্যা থেকে উত্তরণের কোনো সমাধান তারা পায় না এবং ধর্ম প_{রিবর্তন} করেও নাম বা প্রতিমা বদল ছাড়া আর কিছুই তাদের হয় না।

সর্বোপরি, সত্যিকারের ট্র্যাজেডি ছিল উন্মাহর মধ্যে মতপার্থক্য, দলাদলি ও আত্মঘাতি শত্রুতা। বিভিন্ন ব্যাখ্যা, দর্শন ও সংস্কৃতি শুরু হওয়ার সজ্জো সজ্জো মুসলিম উন্মাহ ভেঞ্জে যেতে শুরু করে। পাশাপাশি শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে সংঘাত বাহ্যিকের চেয়ে আরও অভ্যন্তরীণ বিষয় হয়ে ওঠে। সমগ্র উন্মাহকে ভাঙার বিনিময়ে নিজস্থ সমর্থকদের ছোট দল গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা পারস্পরিক বিদ্বেযের শিখাগুলোকে উসকে দেয়। মুসলমানরা মুসলমানদের হত্যা শুরু করে। মুসলমানরা মুসলমানদের সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। মুসলমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকে। ভৌগলিক জাতি, জাতীয়তা, গোত্র, বর্ণ, সম্প্রদায়, মাযহাব স্বকিছু মুসলমান হওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর এত প্রচেন্টার মাধ্যমে মুছে ফেলা সকল বিভেধরেখাগুলো আবারও উন্মতের মধ্যে ফিরে আসে এবং মুসলিম উন্মাহ খণ্ড খণ্ড হওয়ার পথে নামে। এর ফলাফল হিসেবে প্রভাব, শক্তি ও সম্পদ সবই তারা হারাল।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ

এটি আসলে আক্রমণের শিকার ও দুর্বল হওয়া প্রথম জিনিসগুলোর মধ্যে একটি। কালের বিবর্তনে খলীফারা একেকজন রাজা হয়ে উঠলেন, যদিও তাকে তখনও আমীরুল মু'মিনীন বলা হতো। কাঠামোটি একটি খালি খোলের আকারে রয়ে গেছে, যার ভিতরে ভিন্ন একটি প্রাণী বাস করে। যেহেতু যোগ্যতা নেতৃত্বের কোনো মানদণ্ড হিসেবে গণ্য ছিল না এবং নেতৃত্ব হয়ে উঠেছিল বংশানুক্রমিক; যোগ্যতাকে অযোগ্য নেতৃত্বের প্রতি হুমকিরূপে দেখা হতে থাকে। তারিক বিন যিয়াদ ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো উজ্জ্বল জেনারেলদেরকে তাদের অভিযানের শিখর থেকে ফিরিয়ে এনে কাজি সফল হওয়ার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এই বংশগত ধারা ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে পর্যন্ত রীতি হয়ে ওঠে। পিরের ছেলে পির, ইমামের ছেলে ইমাম আর শিক্ষকের ছেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে পিতার স্থান উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে শুরু করে। নেতৃত্বের জন্য উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য নিজের আত্মীয়দের বেছে না নেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর পরে খুব দ্বুত শেষ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ ইসলামের সামরিক ও প্রশাসনিক আধিপত্যের বিশ্ব অবস্থানটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ধীরে ধীরে পতিত হয়ে যায়।

সময়ের ব্যবধানে সুলতানদের আচরণও বদলে যায়। সাইয়িদুনা আবু বাক্র সিদ্দিক এবং 'উমার ইবনুল খাত্তাব এ ২০এর মতো খলীফাগণ নিজেরা কোষাগার থেকে এক দিরহাম ব্যবহার করার স্বপ্নও দেখতেন না। তাদের এই সততা এমন পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়েছিল, যেখানে কোষাগার শাসক এবং তার পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে পড়ে। তারা এমন প্রাসাদ তৈরি করে এবং এত পরিমাণ সম্পদ জ্বমা করে যে, তা কিংবদন্তি হয়ে ওঠে। কর আদায় করা হতো জনকল্যাণে ব্যয় করার জন্য নয়; বরং রাজা ও



তার আভিজাত্যের জীবনধারা নির্বাহের জন্য। যুদ্ধে লড়াই করা হতো ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য বিশ্বের দরজা খোলার জন্য নয়, রাজ্যের বিস্তৃতি ও সম্পদ অর্জনের জন্য। নতুন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের বলা হয়েছিল মুসলমান হওয়ার পরও জিযিয়া দিতে হবে, কারণ তারা শাসকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ মুসলিমদের জন্য হলো যাকাত, অমুসলিমরা তাদের নিরাপত্তার জন্য দেবে জিযিয়া। এখানে মুসলমান হয়ে যাকাত তো দিতে হবেই, তাদের ওপর অমুসলিমদের মতো জিযিয়াও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুসলিম শাসকরা লোকদের ইসলামে প্রবেশের সহায়তাকারী না হয়ে মানুযকে ইসলাম থেকে দূরে থাকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রশিক্ষিত ধর্মত্যাগী কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক শেষ খলীফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমে খিলাফাতের কবর সূচিত হয়। আসল ট্রাজেডি হলো, ব্রিটিশরা যেভাবে তুর্কি ও আরবদের মধ্যে জাতিগত ও উপজাতির বৈষম্যের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিল, উসমানিয় সাম্রাজ্যকেও ভেঙে দিয়েছিল। মুসলমানদের ভূমি বিজয়ীদের মধ্যে বিভক্ত করা হলো। নিজেদের ছোট্ট রাজত্বে যেসব শাসককে চালকের আসনে বসিয়েছিল তারা ছিল পুতুলমাত্র, যা আসলে ব্রিটিশদের দ্বারাই শাসিত ছিল। এই পুতুলদের কারও খিলাফাতকে হারিয়ে যেতে না দেওয়ার মতো দূরদৃষ্টিও ছিল না। সুতরাং আয়োজন করে খিলাফাতকে হারিয়ে যেতে দেওয়া হয় এবং তার স্থলে ছোট ছোট রাজত্ব এমন লোকদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে, যাদের কোনো দূরদৃষ্টি ছিল না। যারা প্রকারান্তরে শান্তির নামে প্রহসনের ধারাই বজায় রেখেছিল।

তহবিল

বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের তৃতীয় উপাদানটিতে আসা যাক। রাষ্ট্রকৈ বাধ্যতামূলক পরিশোধের উদ্দেশ্যে ইসলাম যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। যাকাতের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য দুটি: দেশের অর্থনীতি চলমান রাখতে প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চালন করা এবং ব্যবস্থাপনামূলক ও কার্যকরভাবে ব্যয় করতে সক্ষম হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা। কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যতীত রাফ্রের পক্ষে কোনো কৌশলগত উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। যাকাতের প্রতিষ্ঠানটি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, একে সালাতের সঙ্গো উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইবাদাতের আরেকটি উপায় ও আর্থিক দিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যে ব্যক্তিরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তারা নিজেরা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে মর্মে ঘোষণা করা হয়েছিল। সাইয়িদুনা আবু বাক্র সিদ্দীক ব্রু-এর সময়ে যখন লোকজন রাফ্রের যাকাত জাদায়কারীদের নিকট যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাল, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে এই যুক্তিতে সেনাবাহিনী পাঠালেন যে, যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে, তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল ﷺ-কে মুমিনদের থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেন এবং একে সম্পদের 'পরিশুম্বতা' হিসেবে বর্ণনা করেন। যাকাত রাষ্ট্র কর্তৃক আদায় করা হয় এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এ সকল ক্ষেত্রগুলোও নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

। তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও

369



লিডারশিপ লেসন্স

পরিশুম্থ করবে। আর তাদের জন্য দু'আ করো, নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা তাওবা, ৯: ১০৩]

নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবা ৯: ৬০]

এই গুরুত্ব কেবল যাকাত আদায়ের ওপরই দেওয়া হয়নি; বরং কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রদানের মাধ্যমে আদায় করতে বলা হয়েছে। যাকাতের এই সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা এখন আর মুসলিম জাতির মাঝে বাস্তবে উপস্থিত নেই। এমন এক সময়ে আমরা পৌঁছেছি, যখন অনেক মুসলমান যাকাত প্রদানই করে না। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও ব্যবস্থাপনার কোনো কর্তৃপক্ষও নেই। কিছু মুসলিম দেশে যাকাত আদায়ের স্থানীয় ব্যবস্থা রয়েছে বটে; কিন্তু যেসব অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান বাস করে, যেমন: ভারত, চীন, রাশিয়া, আমেরিকা—সেখানে যাকাত আদায় ও বিতরণের কেন্দ্রীয় কোনো ব্যবস্থাই নেই। ফলসুরূপ, যাকাতের কোনো কল্যাণকর ছাপ বর্তমান নেই।

ট্র্যাজেডি হলো, এখনও সারা বিশ্বে প্রতিবছর বিলিয়ন পরিমাণ যাকাত আদায় করা হয়; কিন্তু যেহেতু এটা ক্ষুদ্র পরিমাণে ও বিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করা হয়, এর তেমন কোনো সুফল পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট বার্ষিক প্রবাহের নিশ্চয়তা নেই বলে কোনো বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া যায় না। কিছু সংস্থার চাহিদা কখনোই পূর্ণ হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের পরিষেবার মানের উন্নতি করা সম্ভব হয় না। বিপরীতে অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সম্পদ উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে, যা প্রায়শই জনসাধারণের খাওয়ানোর মতো সামান্য কাজে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যয় করে। দীর্ঘমেয়াদে কারও উপকার হয় না, যদিও তারা ক্ষণিকের জন্য সামান্য উপকার লাভ করতে পারে।





উত্তরাধিকার পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব তৈরি

কোনো ব্যক্তিই একাকী লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না, যতই মেধাবী বা ধনী ব্যক্তি হোক না কেন। যেকোনো নেতার পক্ষে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদেরকে তাকে অনুসরণ করতে; তাদের সময়, শক্তি, সম্পদ ও প্রতিভা কাজে লাগাতে অঙ্গীকারাবন্দ্র ২ওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারার সক্ষমতা থাকা। নেতার মিশনের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে এর ওপরই নির্ভর করে। মানুষের মনোযোগ ও প্রতিশ্রুতি অর্জনের বিষয়টি কেবল অর্থ প্রদান, অনুগ্রহ করা বা অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেওয়ার মাধ্যমে হয় না; বরং প্রকৃতপক্ষে তিনি তার অনুসারীদেরকে কতটা ভালোবাসেন ও যত্ন করেন, তা প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রদর্শন বলতে আমি কোনো ভণ্ডামি বুঝাচ্ছি না। কারণ অভিনয় শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে না। প্রদর্শনের অর্থ অনুসরণকারীদের প্রতি ভালোবাসা ও তদের দুঃখ-কন্টে সত্যিকার অর্থে উদ্বিশ্ন হওয়া, যা আপনি সত্যি সত্যিই অনুভব করেন এবং তারাও বিষয়টা উপলম্বি করতে পারে। বলা হয়ে থাকে, তারা থোড়াই কেয়ার করে আপনি কী বলছেন! যতক্ষণ তারা জানতে না পারছে যে আপনি সত্যিই কেয়ার করছেন।

রাসূলুল্লাহর উদ্বেগ কেবল তাঁর অনুসারীদের জন্য ছিল না। যারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল, তাঁর ক্ষতি করার চেম্টা করেছিল, তাদের জন্যও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ তিনি তাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিতে ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। শুনতে অদ্ভুত লাগে, কারণ দুনিয়াবি সকল বিষয়ে মানুষ তাকেই ভালোবাসে, যে বিনামূল্যে কিছু দিতে রাজি থাকে; কিন্ডু যখন কেউ একজনকে চিরন্ডন সাফল্যের দিকে আমন্ত্রণ জানায়, তখন কিছু লোক এটিকে আপত্তিকর বলে মনে করে এবং সেই ব্যক্তির বিরোধিতা করে তার বিরুম্থে লড়াই পর্যন্ত করে। এই রকম ঘটনা রাসূলুল্লাহর সঙ্গে বহুবার বিভিন্ন উপায়ে ঘটেছে। সর্বোপরি তাঁর হতাশা ও দুঃখ এটাই ছিল যে, সর্বোন্তম প্রচেন্টা সত্ত্বেও তাঁর নিজের অনেক লোক তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করেছিল। তাদের প্রতি তাঁর উদ্বেগের মাত্রার প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

। তারা মুমিন হবে না বলে হয়তো তুমি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। [সূরা আশ-| শু'আরা, ২৬: ৩]

। হয়তো তুমি তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে দুঃখে নিজকে শেষ করে দেবে, যদি

. 6

CS CamScanner

। তারা এই কথার প্রতি ঈমান না আনে। [সূরা কাহ্ফ ১৮:৬]

এই উদ্বেগের কারণেই তারা অনেকে আবার সাড়া দিয়েছেন এবং নবিজিকে কেবল বিশ্বাসই করেননি; সহযোগিতা করেছেন, সুরক্ষা দিয়েছেন। দীনের বাণী প্রচারে যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত হয়েছেন। এমনকি যদি জীবন হারানোর প্রয়োজনও হয়।

অনুসারীদের জন্য রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার কথা সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

নিশ্চয় তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু। [সূরা তাওবা, ৯: ১২৮]

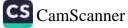
নেতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে যদি একটি বিষয় প্পন্ট থাকে, তবে তা হলো তাঁর ধৈর্য এবং নম্রতা। তাঁর জীবনের অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে অন্যরা তাঁর সঞ্জো এমন নির্বোধসুলভ ও কঠোর আচরণ করেছিল যে, তাঁর সাহাবিরা তাকে শায়েস্তা করার জন্য তলোয়ার হাতে তুলে নিয়েছিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কখনো সে পথ অবলম্বন করতে দেননি। তিনি এ ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে সবচেয়ে কঠোর ব্যবহারের মোকাবিলা করতেন শীতলতা, নম্রতা এবং মৃদু হাসির মাধ্যমে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা বলেন,

অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রাহমাতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর কাজে-কর্মে তাদের সঞ্জো পরার্মশ করো। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন। [আলে ইমরান ৩: ১৫৯]

মার্কার এক মহিলার বিখ্যাত কাহিনি আছে। যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি নিছক ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য তার বাড়ির ওপরের তলায় অপেক্ষা করত এবং যখন নবিজি নিচের রাস্তা দিয়ে যেতেন, তখন সে তাঁর ওপর আবর্জনা ফেলে দিত। তিনি কিছুই বলতেন না, কেবল নিজের কাপড় পরিম্কার করে আপন পথে চলতেন। দীর্ঘদিন একই ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। একদিন তিনি সেই বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু অন্যদিনের মতো কিছুই ঘটল না। তাই ফিরে আসার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দরজায় কড়া নেড়ে মহিলাটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। যে দরজা খুলেছিল, সে জানাল মহিলাটি অসুস্থ। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে দেখার অনুমতি চাইলেন এবং ভেতরে গিয়ে তার খোঁজখবর নিলেন। মহিলা যে ব্যক্তিকে কেবল কন্টই দিয়েছে, সেই মহাপুরুষ তার খবর নেওয়ার জন্য ঘরে এসেছেন—এই সত্য বুঝতে পেরে মহিলা এত অবাক হলো এবং নিজের আচরণের জন্য লজ্জা পেল, শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আরেকটি গল্প আছে, মাক্বা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ 🏂 দেখলেন, এক প্রবীণ মহিলা



CO.



উত্তরাধিকার পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব তৈরি

কিছু বস্তা নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নবিজি তাকে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে বৃদ্ধা বললেন, কারও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছেন—যে কিনা তার বস্তা মার্কাগামী কোনো ক্যারাভান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে; কারণ তিনি নগর ছেড়ে যাওয়ার সিম্বান্ত নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ বস্তাটি নিজের মাথায় নিয়ে বৃদ্ধার প্রদর্শিত পথের দিকে চললেন। পথে মহিলা নবিজিকে বললেন, তিনি নগর ছেড়ে যাওয়ার সিম্বান্ত নেওয়ার কারণ হলো মুহান্মাদ মার্কা দখল করেছে। এই বলে তিনি রাসূল 卷-কেও মুহান্মাদ নামের লোকটি থেকে সতর্ক করে দিলেন। তিনি বললেন, তুমি খুবই চমৎকার একজন যুবক, খুবই সাহায্যকারী ও দয়ালু। ওই লোক থেকে দূরে থেকো, না হয় সে তোমাকেও বিপথগামী করবে। গন্তব্যে পৌঁছে মহিলা তার প্রয়োজনের সময়ে সদয় হওয়ার জন্য রাসূল ﷺ-কে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, তোমার নাম কী বাছা? রাসূল ﷺ বললেন—মা, আমার নাম মুহান্মাদ।

বৃদ্ধা এতক্ষণ যার সমালোচনা করেছেন, যার ভয়ে বাড়ি ছাড়ছেন, তিনি কেবল তাকে সহায়তাই করেননি; বরং মহিলার অযাচিত নিন্দামন্দে একটি শব্দও বলেননি। নিজের সমালোচনা শুনে গিয়েছেন। এখন জানতে পেরে মহিলা এতটাই হতবাক হলেন, বললেন—তুমিই যদি মুহাম্মাদ হও, তবে আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহর রাসূল হওয়া সম্পর্কে তুমি যা দাবি করছ, তা সত্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই এবং তুমিই তাঁর রাসূল 紫।

মাদীনার একটি ঘটনা আনাস বিন মালিক 🚓 বর্ণনা করেন, 'আমরা রাস্লুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গো মাসজিদে ছিলাম, এমন সময় একজন অন্ধ বেদুইন এসে মসজিদে প্রদ্রাব করা শুরু করল। সাহাবিরা তাকে থামাতে ছুটে গেলেন। রাসূল ﷺ বললেন, ওর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাধা দিয়ো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার সম্ভাব্য ক্ষতির কথা ভাবছিলেন। সে হয়তো সাহাবিদের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে মাসজিদের আরও বেশি জায়গা অপবিত্র করে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন, সে যা করছে, তা শেষ না করতে দিয়ে থামিয়ে দেওয়ার চাইতে বরং করতে দেওয়া অপেক্ষাকৃত কম মন্দ ছিল। তার প্রদ্রাব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে রাসূল ﷺ তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে সে যা করেছে, সে সম্পর্কে তাকে কিছু বললেন। তারপর জায়গাটি ধুয়ে ফেলতে বললেন।

আগেই উল্লেখ করেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো সিম্বান্ত নেওয়ার আগে তাঁর সাহাবিদের সঞ্জো পরামর্শ করতেন। এটি আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কারণ তিনি ওয়াহি (প্রত্যাদেশ) প্রাপ্তির কারণে তাদের তুলনায় বেশি এবং ভালো জানেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সবচেয়ে অভিজ্ঞ। তবুও আমরা এর প্রজ্ঞা উপলম্বি করতে পারি, যখন দেখতে পাই রাসূল ﷺ-এর এই পরামর্শগুলো সাহাবিদের মধ্যে কী প্রভাব রেখেছিল।

 এটি তাদের নিজেদেরকে নবিজির পরামর্শে অন্তর্ভুক্তি, মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অনুভব করতে সাহায্য করেছে। সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও উত্তম ফলাফলের জন্য দায়বন্ধ করেছে।



. . I

নিডারশিপ নেসনৃস

২. উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছে, কারণ তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছিল।

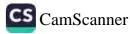
৩. কখনো কখনো তাদের কাছে স্থানীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে খুবই সংবেদনশীল তথ্য ছিল, যা তাদের সজ্ঞো পরামর্শ করার মাধ্যমে জানা যেত এবং এর ফলে তালো সিম্ধান্ত গ্রহণ করা সক্ষম হতো।

 ভবিষ্যতে যখন রাসূলুল্লাহ তাদের মধ্যে থাকবেন না, সেই সময়ে সিম্ধান্ত গ্রহণের জন্য এটি তাদের প্রশিক্ষণ ছিল।

৫. পরামর্শসভা তাদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করেছিল। তাদের উপজাতি ও স্থানীয় গণ্ডি পেরিয়ে সমস্ত সংশ্লিষ্টদের কল্যাণ এবং ইসলাম প্রচারের মিশনের সাফল্যের জন্য চিন্তা করতে সহায়তা করেছিল।

সঠিক ব্যক্তিদের বাছাই, উঁচু স্তরের ব্যক্তিগত উদাহরণ স্থাপন এবং নিবিড় প্রশিক্ষণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন নন; বরং এমন একদল নেতা তৈরি করেছিলেন, যারা তাঁর মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন তাঁর মিশন এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এটা সত্য যে, তাঁর মৃত্যুর তিন দশক পরে বিভিন্ন রকম দ্বন্দ্ব হয়েছিল, যা অনাকাজ্জিত পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছে; তবে এই বাস্তবতা কেবল সেই প্রকৃত সত্যকেই তুলে ধরে যে, কোনো মহান প্রচেন্টাই সর্বকালের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এর ফলাফল অবিরত রাখতে হলে এটি অবশ্যই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জারি রাখতে হবে।

ইতিহাসে যাই ঘটুক, মুহাম্মাদ ﷺ বিশ্বের জন্য যে উদাহরণ ও মডেল রেখে গেছেন, যে কেউ এর থেকে উপকৃত হতে আগ্রহী হবে। সকলের জন্য এটি সব সময় স্পষ্ট, প্রাণবন্ত ও কার্যকরী। এটা সত্য যে, নবিজির সময় থেকে বিশ্ব অনেক বদলেছে; কিন্তু তিনি যে নীতিগুলো রেখে গেছেন, তা এখনও প্রকৃতির অন্যান্য নিয়মের মতোই সত্য যে, সব নিয়ম সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো পরিবর্তিত হয় না। মহাকর্ষ বা বায়ুবিদ্যুতের সূত্রের মতোই এই পৃথিবীতে এবং পরবর্তী সময়ে সাফল্যের সূত্র একই থাকে। বিশ্বকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। আমরা এর সাক্ষ্য দিই এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করি যেন তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুসারী হওয়ার যোগ্যতা দান করেন।



শেষ কথা

শাইখ ইয়াওয়ার বেইগের অসাধারণ প্রতিভাকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার দুবার হয়েছে। প্রথমবার, ইউকেতে লিডারশিপের ওপর একটি কোর্স করতে গিয়ে। আর দ্বিতীয়বার এই বই পড়তে গিয়ে। দুবারের এই অভিজ্ঞতা আমার ভেতরের কর্মস্পহা শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার শেকল থেকে আমাকে মুক্ত করেছে। কীভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে, তা নিয়ে শাইখ ইয়াওয়ার বেশ খোলাখুলি ও প্রাসঞ্জিক আলোচনা করেন। যার কারণে শাইখের আলোচনা পাঠকের ভেতরটা আলোকিত করে দেয়। তাকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়।

লিডারশিপ লেসন্স ফ্রম দ্য লাইফ অব রাসূলুল্লাহ—এমন একটা বই যা আজ থেকে আরও পঁচিশ বছর আগে লেখা উচিত ছিল। কারণ, তখন পশ্চিমে মুসলিমদের মধ্য থেকে দাওয়াহ দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকজন মানুষ অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিলেন। এ বইটা একটু আলাদাভাবে রাসূল ﷺ—এর জীবনে দৃষ্টিপাত করেছে। এমন কিছু শিক্ষা তাঁর জীবন থেকে তুলে এনেছে, যা আমাদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের ও দাঈ'দের আজীবন প্রেরণা জোগাবে। শাইখ ইয়াওয়ার, রাসূল ﷺ—এর জীবন থেকে এমনকিছু শিক্ষা সামনে এনেছেন, যেগুলোর প্রত্যেকটাই আমাদের বেডরুমে ফ্রেম করে সাজিয়ে রাখা উচিত। যেন প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই সেগুলো আমাদের চোখে পড়ে। যেন এখন আমরা মানসিক ও ধর্মীয় দিক থেকে যে নাজুক অবস্থায় আছি, তা থেকে বের হতে পারি। এমন একটা জীবনযাপন করতে পারি, যা রাস্লে ﷺ—এর পথ অনুসরণ করে চলে, তাঁর গুণগুলো অন্তরে ধারণ করার চেন্টা করে।

শাইখ ইয়াওয়ার বেগ দেখিয়েছেন কেন রাসূল ﷺ এতটা সফল নেতা ছিলেন। তিনি সফল ছিলেন কারণ, তিনি তাঁর মিশনের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর মাঝে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। নেতৃত্বের মতো গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন—এমন সব মুসলিমের মাঝেই এই গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে। কারও জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে, তার পক্ষে তখন এমন অনেক কিছুই করা সম্ভব, যা অন্যদের কাছে একেবারেই অসম্ভব মনে হয় (এমনকি তার নিজের কাছেও তা অসম্ভব মনে হয়)। এই গুণ নিজেদের মাঝে থাকলে আমাদের চোখের সামনে থেকে একটি পর্দা সরে যাবে। তখন আমরা আমাদের নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা অনেক প্রতিভা, অনেক সামর্থাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারব। শুনতে হয়তো তেমন বিশাল

190

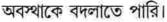


লিডারশিপ লেমনস

কিছু মনে হচ্ছে না; কিন্তু যদি সত্যিই আমরা ইসলামের সত্যটাকে নিজের মাঝে ধারণ করতে পারি, তবে আমাদের জীবনটা একেবারেই বদলে যাবে। যদি আমরা এ বিশ্বাসগুলো মনের মাঝে ধারণ করতে পারি যে, আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পুরণ করবেন, মুমিনদের জন্য জান্নাত অপেক্ষা করছে, আল্লাহই আমাদের সাহায্যজারী, কেউই আমাদের উপকার বা ক্ষতি কোনোটাই করতে পারবে না যদি আল্লাহ তা না চান; তবে এ বিশ্বাসগুলো আমাদের মাঝে অনেক বড় প্রভাব ফেলবে। আমরা হয়তো ইংল্যান্ডের ছোট্ট এক গ্রাম কেন্ট থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করব; কিন্তু একসময় পুরো ইউরোপ আমাদের অধীনে থাকবে। সাহাবাদের রাজ্রা শুরু করব; কিন্তু একসময় পুরো ইউরোপ আমাদের অধীনে থাকবে। সাহাবাদের ক্লা জীবনে আমরা এমনটাই দেখেছি। আমাদের সময়ে গ্রাম বলতে যা বোঝায়, তাঁরা সেরকম জায়গাতেই থাকতেন। মাক্লা ও মাদীনাতে কোনো শক্তিশালী প্রযুক্তি ছিল না, তাদের কাছে ছিল না পাহাড়সম সম্পদণ্ড; কিন্তু তবুও আল্লাহ তা আলা যে উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সে উদ্দেশ্য তাঁরা সফল করতে পেরেছিলেন। ইসলামের শান্তি ও ইনসাফের বাণী সারা পৃথিবীতে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। আমরা তাঁদেরই নিরন্তর পরিশ্রমের ফসল, নিজেদের মিশন সম্পর্কে তাদের মধ্যে অবিচলতা ছিল, আমরা তারই ফবেন।

যদি আমাকে বলা হয় লিডারশিপ লেসন্স ফ্রম দ্য লাইফ অব রাসুলুল্লাহ বইটি থেকে আমি কী শিখেছি, তা একদম অল্পকথায় বলতে, আমি বলব এ বই আমাকে শিখিয়েছে— কীভাবে প্রচন্ড বিপদের সময় আতঙ্কিত না হয়ে নিজেকে স্বাভাবিক রাখা যায়। কারণ, যে জানে আল্লাহ কে এবং তিনি আমাদের কী ওয়াদা দিয়েছেন, সে কখনো বিপদে দিশেহারা হয় না। আমার এখনো মনে আছে শাইখের লিডারশিপ কোর্সে তিনি একদিন বলেছিলেন—আল্লাহ কোনো ধারণার নাম নন, তিনি বাস্তব—কথাটা আমার মনে খুব প্রভাব ফেলেছিল। এভাবে যেন সরাসরি প্রভাব ফেলে, এমন করেই বইটা লেখা হয়েছে। এ বইয়ের শিক্ষাগুলো আমাদেরকে নিজেদের পরিস্থিতির শিকার দেখানো কিংবা নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানোর মানসিকতা থেকে বের করে আনবে। আমার কাছে এটাই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক মনে হয়েছে যে, বইটি আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, আমাদের আসল অবস্থা। আর কী করে আমরা আমাদের বর্তমান

প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের অধীনে থাকা আমেরিকার সেক্রেটারি অব হেলথ, জন ডব্রিউ গার্ডনার, একবার দুঃখবিলাস বা আত্মকরুণার মানসিকতাকে এভাবে বর্ণনা করেছিলেন, এটা এমন এক পথ্য যেটা কোনো ফার্মেসিতে পাওয়া যাবে না; কিন্তু এই পথ্য আপনার জীবনটাকে ধ্বংস করে দেবে। এই মানসিকতাটা অনেকটা নেশার মতো। নেশাগ্র্যুন্ত ব্যক্তিকে তা সাময়িক আনন্দ তো দেয়; কিন্তু বাস্তবতা থেকে একদম আলাদা করে ফেলে। গার্ডনারের মতে আত্মকরুণা বা নিজের দুঃখ নিয়ে পড়ে থাকা অনেকের জন্য পথ্য হিসেবে কাজ করে। উনার কথা যদি সত্যি হয়, তবে যে রোগের জন্য এ পথ্য মানুষ সেবন করে, সে রোগ হচ্ছে মানুষের সামনে নিজেকে পরিস্থিতির শিকার হিসেবে দেখানোর রোগ। এটা এমন এক মানসিকতা যার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করে। তার কাছে মনে হয় তার সঞ্চো খারাপ কিংবা অন্যায় যা কিছুই







শেষ কথা

হচ্ছে, তা বদলানোর কোনো সামথ্যই তার নেই। পরিস্থিতির শিকার হয়ে নিজেকে নিরুপায় ভাবা এবং সত্যিই পরিস্থিতির শিকার হয়ে নিরুপায় হওয়ার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নিজেকে পরিস্থিতির শিকার ভাবার আগে অবশ্যই আপনার সঙ্গে খারাপ বা অন্যায় কিছু ঘটতে হবে; কিন্তু এমন কিছু ঘটলেই যে আপনাকে সেগুলো নিয়ে পড়ে থাকতে হবে—ব্যাপারটা আসলে এমন নয়।

নিজেকে পরিস্থিতির শিকার ভাবার মানসিকতা কিংবা শাইখের ভাষায়—নিজেকে পরিম্থিতির কাছে বন্দি মনে করা—আর সত্যিই অন্যায়ের শিকার হওয়ার মাঝে পার্থক্য কী? নিজেকে পরিস্থিতির শিকার ভেবে বসে থাকার অর্থ আমার সঙ্গে অন্যায়, জুলুম, জ্ববরদস্তি—এসব যা-ই হয়েছে তা বন্ধ করার কিংবা তা মোকাবিলা করার কোনো উপায় আমার কাছে ছিল না। এমন মানসিকতার কারণে মানুষ কোনো বিপদ এলে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে কিংবা সে পরিস্থিতি বদলানোর চেম্টা যদি করেও, সে চেম্টা খুব একটা জোরালো হয় না। আদর্শিকভাবে চিন্তা করলে, এ ধরনের মানসিকতা কোনো না কোনো মিথ্যে ধারণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে ধারণার কারণে মানুষ নিজের সাময়িক সমস্যাগুলো দূর করার কোনো চেম্টা করে না। একসময় সে সমস্যাগুলো তার জীবনের অংশ হয়ে যায়। ফলে, যা সাময়িক ছিল, তা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। এ ধরনের মানসিকতার কারণে মানুষ ক্ষমতাকে হয় পজিটিভলি নতুবা নেগেটিভলি দেখতে শুরু করে। তাদের কাছে মনে হয়, অন্যায়কারীদের কাছে ক্ষমতা খুব পছন্দের একটা জিনিস। আর যারা অন্যায়ের শিকার হয়, তাদের কাছে ক্ষমতা খুব খারাপ একটা জিনিস। এ মানসিকতার কারণে আমরা একসময় নিজেদের ক্ষমতাহীন কিংবা দুর্বল ভাবা শুরু করি। সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক সি আর রোনাইয়ের মতে, নিজেকে পরিস্থিতির শিকার ভাবার মানসিকতা যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের একটাই ভাষা আছে। সে ভাষা হচ্ছে নিজেকে ক্ষমতাহীন ভাবার ভাষা।

এ অবস্থা বদলানোর জন্য আমাদেরকে নিজেদের পরিস্থিতির শিকার ভাবার মানসিকতাটাকে বদলে নিজেকে আল্লাহর দাস ভাবার মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। আমরা যদি সত্যিই বুঝতে পারি আল্লাহ তা 'আলা আসলে কে; আর যদি সত্যিই হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তাঁর দেখানো পথে চললে আমরা সফল হবই; তবে আমাদের জীবনটাই বদলে যাবে। শাইখ ইয়াওয়ার জার্মানির নাৎসিদের ক্যাম্পে শত অত্যাচারের পরও যারা বেঁচে ছিল, তাদের মানসিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এসব বন্দিদের যারা বন্দি করেছে, তাদেরকে অহেতুক দোষারোপ করে সময় নন্ট করেননি। নিজেকে পরিস্থিতির শিকার মনে করে নিজের ভাগ্যকেও গালিগালাজ করেননি। তারা খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে পুরো পরিস্থিতিটাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের সামনে যে ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করছে, তার জন্য নিজেদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তৃত করেছিলেন। এত অন্যায়-অবিচারের পরও তারা আশা হারাননি। তারা ঠিকই বিশ্বাস করতেন, তারা একদিন এ ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফিরবেন। বিশ্বাস করতেন, যারা তাদের বন্দি করে এত অত্যাচার করছে, তাদেরকে তারা একদিন ঠিকই প্রতিহত করবেন। তারা বিশ্বাস করতেন, যে শাস্তিই তাদের দেওয়া হোক না কেন, যে অত্যাচারই তাদের ওপর



লিডারশিপ লেসনস

করা হোক না কেন; তারা সেগুলো সইতে পারবেন, মোকাবিলা করতে পারবেন। তাদের অবস্থা ছিল অনেকটা সেই আরবি প্রবাদের মতো—যে আঘাত তোমার কোমর ভেঙে ফেলতে পারে না, সে আঘাত তোমায় আরও শক্তিশালী করে দেয়।

এখন কথা হচ্ছে, আমরা মুসলিমরা কীভাবে এমন প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে তুলতে পারব? শাইখ ইয়াওয়ারের বই থেকে আমি শিখেছি, এ গুণ রপ্ত করতে হলে সবার আগে আমাদের জানতে হবে আমাদের আসল পরিচয়। আমরা আসলে কে? আমরা মুসলিমরা আমাদের জানতে হবে আমাদের আসল পরিচয়। আমরা আসলে কে? আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জীবনের একটি উদ্দেশ্যও তিনি দিয়েছেন। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর ইবাদাত করা। তাঁর কাছে নিজের ইচ্ছেকে সমর্পণ করা। এভাবে এ পৃথিবীর সকল প্রকার দাসতৃ থেকে নিজেকে মুক্ত করা। পৃথিবীকে ইসলামিক পরিভাষায় 'দুনিয়া' বলা হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আরবিতে দুনিয়া (دنيا) একটি স্ত্রীবাচক শব্দ, যার পুরুষবাচক রূপ হচ্ছে আদনা (أدنى)। আদনা মানে কাছে, নিকটে, নিচে। দুনিয়া শব্দটার সঞ্জো আরবিতে এমন এক শব্দের সম্পর্ক রয়েছে, যা দ্বারা বোঝায়, গাছ থেকে এমন আঙুর খাওয়ার চেম্টা করা, যা আমাদের নাগালের বাইরে। দুনিয়া শব্দটাই আমাদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই বলে এটা ভুলে গেলেও চলবে না, এ দুনিয়া আল্লাহরই সৃষ্টি। দুনিয়াতে আমাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে, যেন আমরা সত্যিই আল্লাহর মহত্ত্ব বুঝতে পারি। তাঁকে ঠিকভাবে প্রশংসা করতে পারি। দুনিয়াকে যখন সৃষ্টি অর্থে ব্যবহার করা হয়, তখন আমরা দুনিয়ার পরিবর্তে ব্যবহার করি 'আলাম (عَالَـــم) শব্দটা। এই 'আলাম শব্দ আর 'আলিম (عَالَـــم) শব্দের শব্দমূল অভিন। 'আলিম মানে যিনি জানেন, আর 'ইলম (عِلْه) মানে জ্ঞান। তাই দুনিয়া হচ্ছে এমন এক জায়গা, যেখানে আমরা আল্লাহকে জানতে পারব। আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে ইসলামে অনেক উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ ا (يَتَفَكّرون) তা আলা জ্ঞানীদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ইয়াতাফাক্বারুন অর্থাৎ, যারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে। ইয়াতাফার্কারুন এসেছে ফাকারা (فَكَرَرَ) থেকে, যার অর্থ সৃষ্টিকে নিয়ে, জীবনের বাস্তবতাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বললে আমাদের অনেকের মনে হয়, আমাদের বুঝি এখন মরুভূমিতে গিয়ে রাতের বেলা বালু হাতে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। না, ব্যাপারটা মোটেও এমন না; বরং আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার অর্থ নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা, নিজের চারপাশটা নিয়ে চিন্তা করে, জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা।

যখন আমরা বুঝতে পারব, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আল্লাহ তা 'আলার ইবাদাত করা, কেবল তখনই আমরা বুঝতে পারব শুধু আল্লাহই হচ্ছেন সকল ক্ষমতার উৎস। হাদীসে এসেছে, যখন আমরা বাসা থেকে বাইরে বের হব তখন যেন আমরা বলি 'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্বালতু আলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অর্থাৎ, 'আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমার সকল ভরসা তাঁর ওপর রাখছি। তিনি ছাড়া কোনো প্রকৃত শক্তি ও সামথ্য নেই।'





শেষ কথা

কিন্তু আমরা যখন এ কথাগুলো বলি, তখন কি আমরা সতিই চিন্তা করি, আমরা কী বলছি? এই কথাগুলো দ্বারা বোঝানো হয়, শক্তি বা ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে আসে না, অন্য কোনো কিছু থেকে আসে না। আসল শক্তি বা ক্ষমতার মালিক কেবল আল্লাহ। আমাদের জীবনে দুঃখ-কন্ট যা-ই আসুক, তা কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই আসে।

ঠিকভাবে এই কথাগুলো বুঝতে পারলে আমাদের গোটা জীবনটাই বদলে যাবে। তখন আমরা বুঝতে পারব, যে ক্ষমতার বলে যারা আমাদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার করছে, সে ক্ষমতা আসলে তাদের নয়। তারা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতাবলে আমাদের ওপর অত্যাচার করতে পারছে আল্লাহর ইচ্ছাতেই। এভাবে ভাবতে পারলে আমরা নতুন এক সম্ভাবনার জগতে প্রবেশ করতে পারব। কারণ, আমরা জানি না আল্লাহর ইচ্ছা আসলে কী, আর কীভাবে তিনি তাঁর ইচ্ছাকে এ পৃথিবীতে আমাদের দ্বারা বাস্তবে রূপ দেবেন। কারণ, অসীম সংখ্যক উপায়ে তিনি তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন।

এভাবে পৃথিবীটাকে দেখতে শিখলে নিজেকে পরিস্থিতির শিকার ভাবার মানসিকতা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। আমরা তখন বুঝতে শিখব—আমার পক্ষে যে কোনো কিছুই অর্জন করা সম্ভব, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা চান। এই বাক্যের 'যতক্ষণ পর্যন্ত' অংশটির জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহর কাছেই। কীভাবে, কতক্ষণ, কখন—তিনি তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেবেন, সে জ্ঞান রয়েছে কেবল তাঁর কাছেই। আর কীভাবে তিনি তা করবেন, তা আমাদের জানা নেই, জানার উপায়ও নেই। অসীম সংখ্যক উপায়ে তিনি তা করতে পারবেন।

তাই যদি সর্বোচ্চ চেম্টার পরও আমরা ব্যর্থ হই কিংবা সফল হতে না পারি, তবে সেটা অন্য কারও ক্ষমতার কারণে নয়; বরং আল্লাহর ইচ্ছার কারণেই। আর যদি আল্লাহর ইচ্ছাতে কোনো কিছু ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে আমার এই ব্যর্থতাতেও সফলতা রয়েছে। যেমনটা রাসূল ﷺ তাঁর হাদীসে বলেছেন, মুমিনের ব্যাপারটা কতই না আশ্চর্যজনক। তার সঙ্গে যা-ই ঘটুক না কেন, সে কল্যাণ লাভ করে। আর এটা কেবল মুমিনের জন্যই সম্ভব। যদি তার সঙ্গো ভালো কিছু ঘটে, তবে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, আর এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তার সঙ্গো খারাপ কিছু ঘটে, তবে সে ধৈর্য ধারণ করে, আর এটার কারণেও তার জন্য রয়েছে পুরস্কার।

এ হাদীস কেবল মুমিনের জন্য খাটে, কারণ একমাত্র একজন মুমিনই বিশ্বাস করে সকল ক্ষমতা রয়েছে কেবল আল্লাহর কাছেই। এটা তাকে নিজেকে পরিস্থিতির কাছে বন্দি ভাবার শেকল থেকে মুক্ত করে দেয়। তাকে এ ধারণা থেকে মুক্ত করতে শেখায় যে, পৃথিবীতে কেবল দু ধরনের মানুষ আছে। শোষক ও শোষিত (বুর্জোযা ও প্রলেতারিযেত)। এক শ্রেণির মানুষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর অন্য শ্রেণি সে অপব্যবহারের শিকার হয়।



জীবনের দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করার যে মানসিকতা ইসলাম আমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দেয়, তা খুবই আধুনিক ও বাস্তবসন্মত। ইসলাম আমাদেরকে বলে সমস্যা সমাধানের সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে। কেবল সমস্যা যে সৃষ্টি



লিডারশিপ লেমনস

করছে, তার কাঁধে সকল দোষ চাপিয়ে চুপ করে বসে না থাকতে। আর এ শিক্ষা কুরআন আমাদেরকে হাজার বছর আগেই শিখিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে। [সূরা রাদ ১৩: ১১]

যদি আমরা আমাদের চারপাশটা বদলে দিতে চাই, তাহলে সবার আগে আমাদের নিজেদেরকে বদলানোর দায়িত্ব নিতে হবে। আর নিজেকে বদলানোর এরচেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে যে, আমরা সকল ক্ষমতার সঠিক উৎস সম্পর্কে সঠিকভাবে চিন্তা করতে শিখব। আমরা বুঝতে শিখব, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতার প্রকৃত ধারক-বাহক নয়। এভাবে বিবেক দিয়ে ও আবেগ দিয়ে নিজের চিন্তাধারা বদলানোর কথা কুরআনে এভাবে একদম সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে,

আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা অন্য কেউ দূর করতে পারবে না। আর যদি কোনো কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

আর তিনিই তাঁর বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান। তিনি প্রজ্ঞাবান। সবকিছু জানেন।

[সূরা আরাফ ৬: ১৭-১৮]

আমরা শাইখ ইয়াওয়ারের বইতে এমনকিছু বিষয় পড়ব, যা তাওহীদ (আল্লাহর একতৃবাদ)—এর সঞ্জো সম্পর্কিত। আমার কাছে মনে হয়েছে, শাইখ এখানে তাওহীদের আলোটাকে নিয়েছেন আর সে আলোটাকে রাসূল ﷺ—এর জীবনের প্রিজমে প্রবেশ করিয়েছেন। তাওহীদের সে আলো রাসূল ﷺ—এর জীবনের প্রিজমে নানা রঙে প্রতিসারিত হয়ে আমার সামনে ধরা দিয়েছে। এ বই আমাকে শিখিয়েছে, যে আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস করে, তার কাছে কোনো কিছুকেই অস্বাভাবিক কিংবা সুদূরপরাহত মনে হবে না। তার কাছে মনে হবে, এ দুনিয়ার সবকিছুই তো আল্লাহর সৃষ্টি, ঠিক যেমন সে নিজে আল্লাহর সৃষ্টি। যার কারণে তার অন্তরের সহানুভূতি, মায়া, ভালোবাসা কোনো নির্দিন্ট সম্প্রদায়ের প্রতিই কেবল আবন্ধ থাকবে না। তার হৃদয়টা আরও প্রসারিত হবে। তার চিন্তা-ভাবনা কেবল নির্দিন্ট কিছু মানুষকে ঘিরেই আবর্তিত হবে না। কারণ, যে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাকে, তার চিন্তাকে বন্দি করতে পারবে না।

একজন নাস্তিক কিংবা একজন মুশরিক, যে ক্ষমতার উৎস আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে মনে করে, সে কখনোই এভাবে চিন্তা করতে পারবে না। যদি কেউ কেবল এই বাস্তুববাদী দুনিয়াতেই বিশ্বাস করে, তখন সে সবকিছুকে বস্তুর ক্ষমতার সজ্ঞো সম্পৃক্ত করে। যদি কেউ এমন কোনো সত্তায় বিশ্বাস করে, যার ক্ষমতা মানুষের মতোই কিংবা কোনো পাথরের মতো, সেও সব ক্ষমতাকে এসব ক্ষণস্থায়ী জিনিসের সজ্যে সম্পৃক্ত করে। তারা কী করে এই বাস্তুববাদী দুনিয়ার সর্বগ্রাসী ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করবে? সে তো বিশ্বাসই করে যে, এই বাস্তুববাদী দুনিয়ার হাতেই রয়েছে তার ভাগ্যের চাবিকাঠি।

এক্ষেত্রে ইসলাম আমাদেরকে সর্বোচ্চ আত্মসম্মানবোধ অর্জন করতে শিক্ষা দেয়। যখন



t -

শেষ কথা

আমরা বুঝতে পারি এ দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর আমরা নির্ভরশীল নই, তখন স্বাভাবিকভাবেই এটি আমাদের মাঝে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে দেবে। একজন সামসময়িক ইসলামি চিন্তাবিদ যেমনটা লিখেছেন,

একজন মুমিন জানেন, কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে সকল ক্ষমতা। তিনি ছাড়া আর কেউ অন্য কারও ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারবে না। পারবে না কোনো অভাব পূরণ করতে। তিনি ছাড়া আর কেউ জীবন কিংবা মৃত্যু দান করতে পারে না। এই বিশ্বাস একজন মুমিনের মন থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর ভয় ঝেড়ে ফেলে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে সে তখন আর মাথানত করতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সে আর হাতও পাতে না। কারও প্রভাব-প্রতিপত্তি তাকে আর ভয় পাইয়ে দেয় না। এমন মানসিকতা তাওহীদ ছাড়া অন্য কোনো বিশ্বাস তৈরি করতে পারবে না। কারণ, যারা আল্লাহের সক্ষো কোনো কিছুকে শরীক করে কিংবা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাদেরকে অবশ্যই কোনো না কোনো সৃষ্টির সামনে মাথানত করতে হয়। তাদেরকে বিশ্বাস করতে হয়, সে সৃষ্টি তার উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে। তাই তারা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকে ভয় করা শুরু করে। তার ওপর ভরসা করতে শুরু করে।

আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আপনাকে এ বই দ্বারা সেভাবে উপকৃত হওয়ার তাউফিক দান করেন, যেভাবে আমি নিজে উপকৃত হয়েছি। আমি আশা করি, আমরা যখন ভবিষ্যতে পৃথিবীটাকে বদলে দিতে পারব, তখন এ বইটা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের শাইখকে বারাকাহ দান করুন। তাকে হেফাজত করুন। তাকে এবং তার পরিবারকে সজান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

হামজা আন্দ্রেস জর্জিস

(সমাপ্ত)



লেখক পরিচিতি

লেখক পরিচিতি

ইয়াওয়ার বেইগ এন্ড এসোসিয়েটস-এর প্রতিষ্ঠাতা। আন্তর্জাতিক বক্তা, লেখক, লাইফ কোচ, কর্পোরেট কনসালটেন্ট, কারিগরি বিশেষজ্ঞদের ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। তার লেখা দ্য বিজনেস অব ফ্যামিলি বিজনেস বইটি পারিবারিক ব্যবসাগুলোকে 'ব্যক্তি-নির্ভর' থেকে 'প্রক্রিয়া-নির্ভর' হয়ে উঠতে সাহায্য করে এবং স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে সাহায্য করে। ফলে ব্যবসাগুলো এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে সহজেই হস্তান্তরযোগ্য হয়ে ওঠে। তার বই অ্যান এন্ট্রেপ্রেনিউরস ডায়েরি উদ্যোক্তা হিসাবে তার যাত্রার বর্ণনা দেয়। ইয়াওয়ার শূন্য থেকে শুরু হওয়া ব্যবসাগুলোকে বড় করে তোলা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ সিম্ধান্ত নিতে পরামর্শ দানে বিশেষজ্ঞ। তার সর্বশেষ লিডারশিপ ইজ এ পার্সোনাল চয়েস শীর্ষক বইটিতে তিনি তার দর্শন বর্ণনা করেছেন। তার মতে প্রতিজন ব্যক্তিরই তার নিজ জীবনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া উচিত এবং একজন 'অসহায় শিকারের' পরিবর্তে একজন 'কর্তাব্যক্তির' মতো জীবনযাপন করা উচিত। তিনি মনে করেন আমাদের প্রত্যেকের নিজের গন্তব্যের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া উচিত এবং আমরা কীভাবে জীবনযাপন করব, তার জন্য অন্য কারও সিম্বান্তের অপেক্ষা পরিহার করা উচিত। তিনি তার ২৮ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলেন। তিনি ৩টি মহাদেশের বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী এবং সরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন। এ সময় তিনি প্রায় ২০০,০০০ পরিচালক, ব্যবস্থাপক, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি প্রাচ্যের মূল্যবোধের সঙ্গো পাশ্চাত্যের ব্যবস্থার মেলবন্ধন ঘটিয়ে সাংস্কৃতিক সীমানাগুলোকে পেরিয়ে গিয়েছেন। ইয়াওয়ারের কর্মপম্থায় সরলতা, গুণগত মানের প্রতি দায়বন্ধতা এবং মূল্যবোধ-নির্ভর পেশাদারিত্বের প্রতিফলন ঘটে। ইয়াওয়ার পাঁচটি ভাষায় কথা বলতে পারেন। তিনি ব্লগ, প্রবন্ধ এবং বই লিখেন। তার লেখার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে উঁচু মানের আদর্শ তৈরি বিষয়ক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ।

